যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশ করেছেন—
ঊর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রশান্তকুমার রায়চৌধুরী
সরস্বতী সাহিত্য মন্দির
১২, সর্বখী রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন—১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী—বিনয় ঘোষ
প্রচ্ছদ ছেপেছেন—মোহন প্রেস

পুস্তকাকারে বেঁধেছেন—
সত্যনারায়ণ বাইন্ডিং ওয়ার্কস্
১৫/এ, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৬

ছেপেছেন—
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

যুগবতার—

এই পৃথিবীতে ভগবান যুগে যুগে মানুষেরই রূপে জন্ম নিয়েছেন। তখন কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই মহাপুরুষকে চিনতে পারেনি। তাই তারা প্রথমে তাঁকে নিজেদের মত সাধারণ ভেবে, তাঁর বিষয়ে নানা কথা বলেছে, নানা বিচার আরম্ভ করেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "যুগে যুগে যখন ধর্মের ভেতর গ্লানি প্রবেশ করে ও সাধুদের পরিত্রাণের প্রয়োজন হয়, আমি তখনই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি।"

ভগবান মানুষের ভেতর জন্ম নিয়ে সত্যই ধর্ম ও সাধুদের রক্ষা করেন। তিনি তাই ধর্ম প্রতিষ্ঠায় অধার্মিকদের কখনও অস্ত্র ধরে বিনাশ করেছেন, আবার কখনও নিজে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে নিজের জ্ঞানের আলোয় অধর্ম ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, চারিধার আলো হয়েছে—প্রেমের বন্যায় সমস্ত মলিনতা, সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে গেছে।

মানুষ তখন বুঝেছে এ সাধারণ মানুষ নয়—তাই তখনই তারা আফ্‌শোষ করেছে তাদের কু-কর্মের জন্যে। তারপর সেই অসাধারণ মনুষ্যরূপী ভগবানের পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে অবতার বলে স্বীকার করেছে, রক্ষা কর বলে আকুল হয়ে কেঁদেছে, মুক্তির উপায় জানতে চেয়ে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে।

যারা তাঁকে মানেনি, তাঁর করুণা লাভ না করে ঘোর অধর্ম ও অনাচার শেষ পর্যন্ত চালাতে চেষ্টা করেছে, তারা নিজেরাই একেবারে ধ্বংস হয়েছে। তাদের কবল থেকে মনুষ্যরূপী ভগবান সাধুদের তখন পরিত্রাণ করেছেন—দেখতে দেখতে চারিধারে ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠেছে শান্তির আলো।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বিনাশ করে দেবতা ও মানুষের ভেতর শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংস, দুর্যোধন ও আরো অনেককে দমন করে তবে সাধুদের পরিত্রাণ করেছিলেন।

আবার বুদ্ধ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে পাপীকে প্রেম দিয়ে তাদের পাপ ধুয়ে দিয়েছিলেন। তাই ভারতবর্ষে তথা বাংলায় ইংরাজ শাসনে খৃষ্টধর্ম বিশেষভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ যখন করে—তখন সোনার বাংলার হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় ছায়ায় ঢাকা একটি গ্রাম—নাম তার কামারপুকুর—এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন যুগবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

মানুষের ঘরে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব—

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বাংলা ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। এই স্মরণীয় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে একটি অন্ধকার চালা-ঘরে এক শিশু জন্মগ্রহণ করলেন—রাত্রি তখনও শেষ হয়নি—তখন জগতের অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে একটু একটু করে প্রকাশ হচ্ছে আলো। অসংখ্য পাখী যেন কার শুভাগমনে শুরু করেছে আনন্দের আগমনী গান!

রাত্রি শেষ হয়ে প্রভাত হতে তখনও অর্ধদণ্ড বাকী। ঠিক এই সময় যে শিশু জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁকে দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল! শিশুর যেমন রূপ, তেমনি স্বাস্থ্য আর তেমনি দেহের রং, দেখতে যেন ছ' মাসের ছেলে।

পাড়ার প্রতিবেশিনীরা দিনের আলো ফুটতেই এক এক করে সকলেই ছেলেকে দেখতে এলো। তারপর শাঁখের শব্দে সমস্ত পাড়া মুখরিত হয়ে উঠল।

সকলের মনে এক অবর্ণনীয় আনন্দ। কেন এই আনন্দ—কে এই শিশু? নবাগত এই শিশু হলেন—যুগবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। রামকৃষ্ণের পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় আর মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। পিতামহ মাণিকরাম একজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, তাঁরই উপাস্য গৃহদেবতার নাম রঘুবীর।

ক্ষুদিরামের কয়েক ঘর যজমান ছিল। তাঁদের বাড়ী পূজাপাঠ করেই কোন রকমে তাঁর দিন চলে যেত।

ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণি স্বামী-স্ত্রী, এঁরা দুজনেই শ্রীরামের

উপাসনা করতেন। ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রকে সুখে দুঃখে সকল সময়েই এঁরা স্মরণ করে যা কিছু সামান্য উপার্জ্জন করতেন, তাতেই তাঁদের ছোট সংসারটি কোন মতে চালাতেন। সত্যই যেন শ্রীরাম এঁদের সহায়—যেন এঁদের সাথী ছিলেন।

সত্যবাদী ক্ষুদিরামের পূর্ব বাসস্থান—

কামারপুকুরে বসবাসের পুর্বে ক্ষুদিরাম যে গ্রামে বাস করতেন, সেই গ্রামের নাম দেরে বা দেবগ্রম। গ্রামের সকলেই তাঁকে শুধু ভালবাসতেন, তাই নয় খুব ভক্তি-শ্রদ্ধাও করতেন। কারণ ক্ষুদিরাম কখনও ভুলে মিথ্যা কথা বলতেন না। কোন প্রলোভনে প্রলোভিত, ভয়ে ভীত বা কখনও নিজে সংকল্পচ্যুত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতেন না। সত্য বলবেন, মিথ্যা কিছুতেই বলবেন না, তাতে বরাতে যে কোন কষ্ট আসে আসুক, ক্ষতি নেই—তা তিনি সহ্য করবেনই তাই জানতেন।

ক্রুদ্ধ জমিদার ও সত্যবাদী ক্ষুদিরাম—

গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় একদিন ক্ষুদিরামকে ডেকে বললেন, কোন এক প্রজার বিপক্ষে তাঁর হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হবে। যদি জমিদারের কথামত কাজ হয় তবে ভাল আর না হয় তবে বরাতে আরো অনেক দুঃখ আরো অনেক কষ্ট। এই জেনেও ক্ষুদিরাম তাঁর কথা মত কাজ করলেন না।

জমিদারের কথায় ক্ষুদিরাম কিছুতেই মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী হলেন না। ক্রুদ্ধ জমিদার একে একে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করলেন।

ঠাকুর জমিদারকে সমস্ত কিছু পর পর ছেড়ে দিয়ে, শেষে ''হহারা হয়ে একটু আশ্রয়—কোথায় একটু আশ্রয় পাবেন, এই চিন্তা রতে করতে ছুটলেন, এধার ওধার অনেক স্থানে একের পর এক রে। কিন্তু কোথায় আশ্রয়—কে দেবে আশ্রয়। এইভাবে ঘারার পর, আশ্রয় তিনি পেলেন তাঁরই এক খুব আপনজনের াছে।

ক্ষুদিরামের আশ্রয়দাতা বন্ধু সুখলাল গোঁসাই—

সুখলাল গোঁসাই কামারপুকুর গ্রামের একজন নামকরা লোক। তিনি জমিদারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে—একবার একটুও কোনকিছু চিন্তা না করে—ঠাকুর ও ঠাকৃরুণকে সেই দুঃসময়ে আশ্রয় দিলেন।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে দেশ ধন্য হল—

সুখলাল গোঁসাইয়ের আশ্রয়ে ক্ষুদিরাম তাঁর দুঃখের সংসার পেতে বাস করতে লাগলেন। এইখানেই আমাদের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হওয়ায় বাঙ্গলা দেশ ধন্য হল! কামারপুকুরের ছোট গ্রামটির মধ্যে জন্মালেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু কেউ তখন তাঁকে বুঝতে পারে নি, চিনতেও পারে নি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ—

ঠাকুরের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ করার সময় হল। ক্রমে কোথা দিয়ে আট মাস কেটে গেল। নিষ্ঠাবান ধার্মিক ক্ষুদিরাম আর দয়া ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি চন্দ্রমণি রামকৃষ্ণের নামকরণ এবং অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করলেন। বাড়ীর সকলেই গয়া-তীর্থে, ক্ষুদিরামের স্বপ্নে দেখা শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারী গদাধরের নামে এই শিশুর নাম রাখলেন গদাধর। সত্যই বেশ ভাল নাম। কিন্তু প্রথম রামকুমার, দ্বিতীয় রামেশ্বর আর এর নাম হবে গদাধর! এ নাম ঠিক নয়। তাই দুই ভাইয়ের সঙ্গে মিল রেখে অন্নপ্রাশনের দিন শিশু গদাধরের নাম রাখা হল রামকৃষ্ণ।

দেবশিশু জ্যোতির্ময় গদাধরই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—

কি সুন্দর চেহারা! এমন সুন্দর মানুষের দেহে স্বর্গীয় রূপ কেমন করে সম্ভব। এই জ্যোতির্ময় রূপ মানুষের হতে পারে না। এ রূপ দেবতারই—এ মানুষ নয়—এ ছেলে নিশ্চই দেবতা!

দেখতে দেখতে দেবশিশু গদাধরের যখন পাঁচ বছর বয়স হল, তখন তাঁর হাতে-খড়ি ও বিদ্যারম্ভের সময় হয়েছে বুঝে, ক্ষুদিরাম খুব ধুম্‌ধাম্ করে হাতে-খড়ি দিলেন।

তারপর তাঁকে গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে পাঠালেন। সমস্ত ছেলেদের সঙ্গে গুরুমশাইয়ের কাছে খড়ি নিয়ে লিখবে, বই নিয়ে পড়া শিখবে। বই পড়ে আর গুরুর কাছে নানা উপদেশ পেয়ে তবেই তো জ্ঞান হবে। জগতে জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান্ হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবেই তো সে গুরুর আসনে বসবে।

অজানার সন্ধানে—

গদাধর লেখাপড়া শিখতে গেল। পাঠশালায় কিন্তু তার লেখা-পড়া ভাল লাগল না। বর্ণ পরিচয় করতে গিয়ে তার চোখ দুটো বারবারই কোন এক অজানার সন্ধান করে, পরিচয় করতে চায় তারই সাথে। অ, আ, ক, খ মন থেকে মুছে যায়—মন তার ভেসে বেড়ায় সারা জগতে।

চোখ দুটোও তখন ভাল করে চেয়ে দেখে সে কোথায়—কোথায় সে?

দুনিয়া গোলকধাঁধা—এখন শুভঙ্করীর অঙ্কগুলো যেন তাঁর কি রকম ধাঁধা বলে মনে হতে লাগল। অঙ্ক শেখাও তাঁর তেমন না ভাল লাগায়, পুঁথিগত বিদ্যার এইখানেই প্রায় শেষ হয়ে গেল।

গদাধরের উপনয়ন ও গৃহদেবতার পূজার অধিকার—

বালক গদাধরের বা শ্রীরামকৃষ্ণের যখন নয় বছর বয়স তখন ক্ষুদিরাম জাঁকজমক্ করেই তাঁর পৈতা দিলেন। উপনয়নের পর গদাধর ৺রঘুবীর বিগ্রহের পূজার অধিকার পেয়ে খুব খুসি হলেন। তিনি গৃহদেবতার পূজার জন্যে নিজে ফুল তুলে এনে, পূজা করে অনেক সময় কাটাতে লাগলেন।

ঠাকুরকে পূজায় সন্তুষ্ট করে তাদের অভাব অভিযোগ দূর হবে কি করে, আর কি করে তিনি প্রচুর শান্তি পাবেন, তাই ভাবতেন। মানুষ গঙ্গাজলেই গঙ্গার পূজা করে শান্তি পায়। গদাধরেরও তাই সাধারণের মত উপনয়নের পর যেন তিনি ভগবানকে ডাকতে অধিকার পেলেন।

গদাধরের পিতৃবিয়োগ—

ক্ষুদিরাম আটষট্টি বৎসর বয়সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ায়, সেলামপুরে তাঁর ভাগ্‌নে রামচাঁদের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন, তাঁর বড় ছেলে রামকুমারকে। তখন শরৎকাল।

দুর্গাপূজার সময় ক্ষুদিরামের অসুখ বেড়ে গেল। তিনি বিজয়ার পরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে, সংসারের মায়া কাটিয়ে পরলোক গমন করলেন। গদাধর পিতৃহারা হলেন।

অদ্ভুত মেধাবী বালক গদাধরের পুঁথিগত বিদ্যায় অশ্রদ্ধা—

গদাধরের লেখাপড়া তেমন ভাল লাগল না বটে, কিন্তু কথকতা, গান, যাত্রাগান, পুরাণপাঠ যখন যা শুনতেন, তা তাঁর খুব ভাল লাগত আর তা তিনি ভুলতেন না। স্মরণশক্তি তাঁর এত প্রখর ছিল যে, তিনি যা যা শুনতেন তাই ঠিক সেই ভাবেই আবার একটু বেশী ভাবে বিভোর হয়ে আবৃত্তি করতে পারতেন। আর সহজেই তিনি সমস্ত কথকতার ভাব, যা পণ্ডিতদের বুঝতে বেশ সময় লাগতো, তাও তিনি বুঝে নিতে পারতেন কেবল মাত্র একবার শুনেই। তারপর তিনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত এই সমস্ত কাহিনী আর তার ভেতরের অর্থ সহজ করে বলতে পারতেন। তাই শুনে পণ্ডিতরা আশ্চর্য হয়ে যেতেন।

গদাধরের অভিনয় ও শিবময় ভাব—

ভাবের ভাবুক গদাধর বাল্যকাল থেকেই সদানন্দ। তিনি সুকণ্ঠে সকলকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিতেন আর নিজে আনন্দ পেয়ে ভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন। তাই পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন।

তিনি একদিন শিবরাত্রিতে শিবের অভিনয় করতে করতে শিবময় হয়ে পড়লেন। বাহ্যজ্ঞান তাঁর তখন আর রইল না একটুও।

গদাধরের সাধুসেবা ও সাধুসঙ্গে অপরূপের ধ্যান—

গদাধরের বসতবাটী, জমিদার লাহাবাবুদের অধীনে ছিল। গ্রামের একপাশে জমিদারবাবুরা সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্তে একটা

ধর্ম্মশালা তৈরী করে দিয়েছিলেন। তাই সাধু-সন্ন্যাসীরা যখন তীর্থদর্শন করতে যেতেন, তখন তাঁরা এই ধর্মশালায় বিশ্রাম করে তারপর যেতেন।

এই পান্থশালায় গদাধর গিয়ে সাধুদের মুখে নানা জ্ঞানের কথা শুনতেন। ভক্তিরসে তাঁর মন ডুবে যেত। সাধুভক্ত গদাধর চিন্তাকুল চিত্তে বাড়ী ফিরতেন। আবার কোন কোন দিন সাধুর মত ছাই মেখে তিলক কেটেও বাড়ী ফিরতেন।

ধর্মশীলা গদাধর-জননী পুত্রের সাধুপ্রীতি দেখে, প্রচুর খাদ্য গদাধরের হাত দিয়ে সাধুদের পাঠিয়ে দিতেন।

বালক গদাধর সাধুসঙ্গ করে আরো সাধুর মত হয়ে উঠলেন। এই সময় থেকেই তিনি ভগবানের রূপ চিন্তা করতে লাগলেন। যে অজানাকে জানতে, যে অপরূপকে দেখতে, কত জ্ঞানী-গুণী, কত যোগী-ঋষি কঠোর সাধনা করেছেন—সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরকে জানতে বাসনা হওয়ায়, তাঁর চিন্তাই তিনি করতে লাগলেন, প্রায় সমস্ত সময়।

গদাধরের দ্বিতীয় ভাব-সমাধি—

একদিন গদাধরঠাকুর মাঠ পার হয়ে, বাড়ীর কাছেই আনুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধা দেবী ৺বিশালক্ষীকে দেখতে যান। ঠাকুর গদাধর নিজে বলেছেন, মন্দিরে যেতে যেতে হঠাৎ এক জ্যোতি দর্শন করে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন।

তখন ঠাকুর গদাধরের বয়স মাত্র ১১ বৎসর। লোকেরা বললে, মূর্চ্ছা; কিন্তু পথের মাঝে বালক গদাধরের এই দ্বিতীয় বারের ভাব-সমাধি।

গদাধরের বন্ধুপ্রীতি ও যাত্রাদল গঠন—

ক্ষুদিরামের বন্ধু ধর্ম্মদাস সাহার ছেলে গয়াবিষ্ণু ছিলেন গদাধরের পরম বন্ধু। গদাধব বন্ধুবান্ধব আর সঙ্গীদের খুব ভালবাসতেন। তাই গয়াবিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। খেলা করতেন আবার যখন যা খাবার পেতেন তাই দু'জনে ভাগ

করে খেতেন। মধুর কণ্ঠে তিনি বেশ গান গাইতে পারতেন। তাই পাড়ার ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি এক যাত্রাদল গড়লেন। যেখানে তিনি যাত্রা করতেন, সেখানে সকলেই তাঁর অভিনয় দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত।

গদাধরের জন্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের দুঃখ প্রকাশ—

রামকুমার ছোট ভাই গদাধরের জন্য বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ তাঁর চোদ্দ বছর বয়স হল কিন্তু লেখাপড়া কিছুই তেমন বিশেষ হল না। তাই তাঁকে কামারপুকুর থেকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। কলকাতায় তিনি একটা টোল খুলে গদাধরকে নিজেই ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। গদাধর দাদাকে ভয় করতেন। তাই টোলে নিয়মিত পড়ে, একটু লেখাপড়া আর জ্ঞান বুদ্ধি হল। কিন্তু এইভাবে তাঁর লেখাপড়া হল না শেষ পর্যন্ত।

একদিন তাই গদাধর তাঁর বড় ভাই রামকুমারকে ডেকে বললেন, 'দাদা আমার এইভাবে আর লেখাপড়া হবে না।' দাদা তাঁর কথায় বললেন, 'তবে কি তুই মূর্খ হয়ে থাকবি।'

রামকুমারের সহিত গদাধরের কলিকাতায় অবস্থান ও রাণী রাসমণির কালীবাড়ী স্থাপন—

গদাধরের বড়দা রামকুমারঠাকুর কলকাতায় ছেলেদের সংস্কৃত পড়াতেন, আর পূজাপাঠ করতেন। গদাধর কিছুদিন নাথের বাগানে, কিছুদিন ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুয্যের বাড়ীতে থেকে পূজাপাঠ করে বেড়াতেন। এই সূত্রে কিছুদিন তিনি ঝামাপুকুরে মিত্রদের বাড়ীতে পূজা করেছিলেন।

দুই ভাই রামকুমার আর গদাধরের যখন এইভাবে কলকাতায় চলছিল, তখন কলকাতায় জানবাজারে প্রসিদ্ধ জমিদার রামচন্দ্র দাসের পত্নী ভক্তিমতী রাণী রাসমণি কলকাতা থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে, দক্ষিণেশ্বরে নয় লক্ষ টাকা খরচ করে ১২৬২ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কালীবাড়ী স্থাপন করলেন।

পণ্ডিত রামকুমারকে রাসমণির প্রথম পূজারীরূপে নির্ব্বাচন—

রামকুমারের পূজা-পদ্ধতির খ্যাতি ছিল। এই সংবাদ রাণী রাসমণির কানে পৌঁছতে তিনি এমনি ধারা একজন ভাল পূজারী খুঁজছিলেন তাই প্রথম পূজারীরূপে তাঁকেই নির্ব্বাচন করে নিযুক্ত করলেন। ছোট ভাই গদাধরও এক শুভ মুহূর্ত্তে তাঁর বড়দা রামকুমারের সঙ্গে এখানে এলেন। মাঝে মাঝে মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরও কালীবাড়ীর পূজা করতেন। তাঁরই দুই পুত্র, নাম তাদের রামলাল ও শিবরাম আর একটি কন্যার নাম শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী।

প্রথম স্থায়া পূজারীরূপে গদাধর—

কিছুদিন রামকুমারের সঙ্গে থাকার পরে গদাধর যখন স্থায়ীভাবে পূজার কাজে নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর বয়স একুশ বাইশ বছর হবে।

শিল্পী গদাধর—

এখানে গদাধর শুধু পূজাই করতেন না, ভালবাসতেন দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠন করতে।

পাকা শিল্পীর হাতের চেয়েও তাঁর হাতের দেবদেবীর মূর্ত্তি হতো অতি চমৎকার। মূর্ত্তি গঠনের সময় মাঝে মাঝে তিনি গান গাইতেন। গানের সঙ্গে প্রাণের ভাব এক হয়ে দেবী প্রতিমার রূপ হতো অপরূপ। গদাধর—শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হয়ে রাম-প্রসাদের রচিত গান মধুর কণ্ঠে গাইতেন।

"কোন্ হিসাবে হরহৃদে,
দাঁড়িয়েছিস মা পদ দিয়ে।
আবার সাধ করে জিভ বাড়ায়েছিস,
যেন কত ন্যাকা মেয়ে।"

এইভাবে পূজা করে রামকৃষ্ণের মনের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল। সর্ব্বদাই তিনি বিমনা। এর পর কত ছোটখাট ঘটনা ঘটে গেল। বয়সও প্রায় ২৪ হল। তাই উদাসী গদাধর—

শ্রীরামকৃষ্ণকে সংসারী করার চেষ্টা তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা করতে লাগলেন। বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। প্রথমে ঘটক তাঁর জন্মে জয়রাম মুখুজ্যের বাড়ীতে বিয়ের ঠিক করলেন ; কিন্তু শেষে জয়রাম মুখুজ্যে গদাধরকে কন্যাদানে অসম্মত হওয়ায় গদাধর নিজেই এক অদ্ভুত ইঙ্গিত করলেন।

ঘটক ভাল মেয়ের জন্মে এধার ওধার যখন বিয়ের কথা নিয়ে খোঁজ করছিল—তখন গদাধর তাকে বললেন, জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়ে সারদামণির সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হবে, সেই তাঁর কনে।

গদাধরের বিবাহ—

গদাধর—শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নিজেই তাঁর কনের কথা বললেন, তখন তাঁর কথায় সকলেই একটু যেন অবাক হয়ে গেল। তারপর খোঁজ নিতে লোক গেল আর রামেশ্বর কন্যাপণের যোগাড় করলেন। পূর্বে বরের পক্ষ থেকে কনের পক্ষকে টাকা দেওয়ার প্রথা ছিল।

এখন রামেশ্বর পণের টাকা যোগাড় করলেন। কারণ গদাধর জোর দিয়েই বলেছেন, এত ভাবনার কিছু নেই, হয়রাণিরও কিছু নেই। আমার বিয়ের পাত্রী জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্যের বাড়ী কুট বাঁধা হয়ে আছে। ভাল ফল, যেমন চাষীরা কুট বেঁধে রেখে দেয়, তেমনি তাঁর কনেও কুট বাঁধা হয়ে আছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল পাত্রীর বয়স তখন মোটে পাঁচ বছর। তাই কিছুদিন পরে, যখন গদাধরের বয়স ২৪ বছর আর সারদা ৬ বছরে পা দিয়েছে তখন ১২৬৩ সালে বৈশাখ মাসে, খুব আনন্দ করেই গদাধর সাজ করে, পোষাক পরে, সারদামণিকে বিয়ে করে আনলেন। সংসারে ঘর আলো করা বউ এল। সারদামণি যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী।

চলছিছুদিন ঘর করে সারদা এখন বাপের বাড়ী আছেন। তাই দাসের বউ নিয়ে জোড়ে ফিরতে হবে। চন্দ্রমণির এই কথায় দুরে, দাঁড়ই করলেন। তিনি শ্বশুরবাড়ী গেলেন। সাত বছরের তারিখে ়া তাঁর ছোট হাতখানি দিয়ে পা ধুইয়ে দিলেন, পাখা

দিয়ে হাওয়া করলেন স্বামীকে। সেবায়, ভক্তকে ভগবান দয়া করেন। তবে এই বালিকা সারদা কি তার স্বামীকে চিনতে পেরেছেন যে, তিনি কে আজ তাঁর স্বামীরূপে সেবা নিচ্ছেন ?

লক্ষ্মীস্বরূপিণী সারদামণির বিষ্ণুরূপী গদাধরের পদসেবা—

লক্ষ্মী যেমন প্রেম, ভক্তি আর ভালবাসার পূর্ণমূর্ত্তি নিয়ে বিষ্ণুর পদসেবা করেছিলেন, সারদামণিও ঠিক তেমনি করে, যত্নে আর ভক্তিতে তাঁর ছোট ছোট কচি হাত দিয়ে, ফুটন্ত ফুলের মত পবিত্র মনেই গদাধর—শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করলেন।

গদাধর সেবা নিলেন আর সারদামণি সেবা করে ধন্য হলেন।

গদাধরের দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাবর্ত্তন—

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ হবার পরই তিনি জেদ ধরলেন দক্ষিণেশ্বর ফিরে যাব। গদাধরের এই জেদ ধরায়, তখন তাঁর মা সেখানে থাকার জন্যে আর বিশেষ অনুরোধ বা কিছু পীড়াপীড়ি করলেন না।

বিনিদ্র গদাধরের ক্রন্দন ও মা-মা-বুলি—

মায়ের কাছ থেকে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। তারপর তাঁর বুক লাল হয়ে উঠল। রাত্রের ঘুম চোখ থেকে চলে গেল। তিনি ছেলেমানুষের মত কেঁদে মাকে বললেন—"আমার কেউ নেই —তুই ছাড়া আমার কেউ নেই—তুই আমাকে দেখা দে—তুই আমাকে একটু কৃপা কর—আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই তুই ছাড়া।" আকুল হয়ে বারবার গদাধর এই রকম মা-মা করে কেঁদে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগলেন।

গদাধরের যোগজ ব্যাধি বা দিব্যোন্মাদ ভাব বলিয়া চিকিৎসকের নির্দ্দেশ—

সকলে তাঁর এই অবস্থা দেখে বলতো যে, গদাধরের বোধ হয় শূলব্যথার যন্ত্রণা হয়েছে। তাই বোধ হয় ও ঐভাবে মাটিতে পড়ে মা-মা করছে।

একদিন মথুরবাবু বিখ্যাত বৈদ্য গঙ্গাপ্রসাদের কাছে তাঁকে

নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, দেখুন আবার কি হয়েছে? চিকিৎসক তখন গদাধরকে মথুরবাবুর কথায় দেখে ও সমস্ত শুনে ভাবতে লাগলেন। পাশেই তাঁর ভাই ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ইনি পূর্ববঙ্গের এক নামী বৈদ্য তাঁর নাম দুর্গাপ্রসাদ। তিনি এই সমস্ত শুনে বললেন, এ রোগ ওষুধে বা মালিশে সারবার নয়। এ হচ্ছে দিব্যোন্মাদের অবস্থা, এ যোগজ ব্যাধি।

দিব্যদ্রষ্টা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বুঝতে পারলেন, এর মূল কোথায়! কিন্তু তাঁর কথা বিশেষ কারো ভাল লাগল না। সকলে ভাবলে, তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। গায়েতে গদাধরের ভীষণ জ্বালা, চোখে ঘুম নেই। চোখের পল্লব তাঁর একবারও পড়ে না, একটি পলকের জন্যেও। মনে গদাধরের শান্তি নেই, চোখ দিয়ে দীর্ঘ ধারায় জল পড়ে। তাই মায়ের ওপর অভিমান করে তিনি বললেন, "মা—মা গো—তুই চোখ আমার নিশ্চল করে দিয়েছিস চোখের সামনে চিরন্তনী হয়ে থাকবি বলে!" তাই জগন্মাতার কাছে এই প্রার্থনা গদাধরের মাতা চন্দ্রমণির প্রাণে বেজে উঠল।

শিবমন্দিরে গদাধরের জন্য মাতা চন্দ্রমণির ধর্না ও দেবাদিদেবের অভয় দান—

গদাধরের এই অবস্থার কথা চন্দ্রমণির কানে পৌঁছতে তিনি শিবের মন্দিরে ধর্না দিয়ে স্বপ্নে মহাদেবের দেখা পেলেন। পরণে বাঘছাল, মাথায় জটাজূট, হাতে ত্রিশূল। আহা! কি সুন্দর— কি অপূর্ব্ব শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রশেখর!

দেবাদিদেব বললেন, "তোর কোন ভয় নেই। তোর ছেলে পাগল হয়নি। তাঁর মাঝে ঈশ্বরের সঞ্চার হয়েছে। তাই তার ঐ রকম বৈলক্ষণ। বাড়ী যা—মন ঠাণ্ডা করে থাক!" দেবাদিদেবের এই আদেশ পাওয়ার পর, চন্দ্রমণি শিবের পূজা দিয়ে, মন ঠাণ্ডা করে বাড়ী ফিরলেন। বাড়ীতে তিনি কুলদেবতা রঘুবীরকে জানালেন, আমার গদাধরকে দেখো, তাকে ভাল রেখো।

একই ভাবে গদাধরের ছয় বছর অতিবাহিত—

গদাধরের কিন্তু এমনি করেই ছয় বছর কেটে গেল। এমনি করেই চোখের পলক না পড়ে, না ঘুমিয়ে। গদাধর কাঁদে আর মাকে বলে, এই তোর বিচার, এই তোর বিবেচনা! ছেলের এই রোগের যন্ত্রণা দেখে মা কি ঘুমোয়? না তার ঘুম আসে? যদি দেখা না দিস তো রাতদিন চোখ চেয়ে থাকব।

কি অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয়—

ঈশ্বর দর্শনের অবস্থায় চাই এইরূপ—ঠিক এই ধরণের একগুঁয়ে ব্যাকুলতা—অবাধ্য উন্মাদনা। ডাকার মত ডাকলে কি মা না এসে থাকতে পারেন। তখন তিনি নিশ্চয় এসেই বলেন—ওরে কাঁদিসনি, এই তো আমি এসেছি!

এক শিষ্য তার গুরুকে জিজ্ঞাসা করে, কেমন করে আর কি অবস্থায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

গুরু তাঁর শিষ্যকে বলেন, আয় দেখিয়ে দিই। তারপর তিনি তাকে পুকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে, জলে নেমে বেশ কিছুক্ষণ জলের মধ্যে চেপে রেখে দিলেন। তারপর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছিল? শিষ্য হাঁফ নিয়ে বললে, প্রাণ আটুপাটু করছিল। যেন প্রাণ যায় যায় এই অবস্থা তার হয়েছিল। গুরু বললেন, হ্যা যখন ঠিক এই—ঠিক এই রকম ঈশ্বরকে দেখার জন্যে প্রাণ আটুপাটু করবে, তখনই জানবি তাঁর দর্শনের আর দেরি নেই। তোমার ব্যাকুলতা আর তাঁর কৃপা চাই—কিন্তু ব্যাকুলতা হয় কি করে? পরম প্রেমভাব। সে প্রেমভাবই বা কোত্থেকে আসবে? তা আসবে শুধু নামে—শুধু নামানন্দে।

তাই গদাধরের এমনি অবস্থায় মা কি তাকে দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন।

গদাধর প্রায়ই রামপ্রসাদী গান মাকে শোনাতো আর কেঁদে বলতো, মা রামপ্রসাদকে তুই দেখা দিলি আর আমায় তুই তো দেখা দিলি নি মা!

রামকুমারের পরে, মথুরবাবুর অনুরোধে গদাধর মায়ের পূজারী—

মথুরনাথের বিশেষ অনুরোধে রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধর পূজার ভার নিলেন। রাসমণির জামাতা মথুরনাথ নিশ্চিন্ত হলেন।

তবে গদাধর তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামের ওপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে, দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর পূজা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে করেন। তিনি মাকে গানে বলেন, "তোর রাঙ্গা চরণ আমি দেখেছি—তুই আর ভোলাস নি—আমি কিছুতেই—আমি আর কিছুতেই ভুলব না।" গদাধরের এই গান সার্থক হল কি? মা কি তাঁর কথা রাখলেন?

গদাধরের মায়ের দর্শন লাভ—

সামান্য পূজারী গদাধর নয়, সে মায়ের ছেলে। তাই মাকে ফুল দিয়ে সাজান। তাঁর সঙ্গে তিনি কত কথা বলেন, কিন্তু পাষাণী মা চুপ করে শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন।

মায়ের এই অবহেলা যেন তাঁর সহ্য হয় না। বারবার বললেও কিছুতেই মা কথা বলেন না। গদাধরের দুঃখে কষ্টে বুক ফেটে যেতে লাগল। রাগে আর অভিমানে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। তাই লাফ্ দিয়ে তিনি মায়ের হাতের খাঁড়া নিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলে জীবনের শেষ করে দেবেন মনে করলেন। যে সংকল্প সেই মত কাজ। তাই লাফ্ দিয়ে খাঁড়া নিতে গেলেন—মা তাঁকে দেখা দিলেন—মা তাঁর ভক্ত সন্তানের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

মায়ের দর্শনে মায়ের আদুরে ছেলের সমস্ত রাগ, অভিমান সরে যায়। মায়ের পায়ে তাঁর মন, তাঁর সমস্ত কিছু মিশে যায়। তাই তিনি মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করতে করতে, কখন কখন নিজের মাথায় ফুল দেন। মায়ের ভোগ নিজ হাতে নিয়ে মাকে খাইয়ে দিতে দিতে, কখন কখন নিজের মুখে দেন।

রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর নিকট গদাধরের বিরুদ্ধে কর্ম্মচারীদের অভিযোগ—

এইভাবে পূজার নামে এই সমস্ত অনাচার দক্ষিণেশ্বরের কর্ম্মচারীরা সহ্য করতে পারলেন না। রাসমণির জামাতা মথুরমোহন ঠাকুরকে কিছু বলেন না, তাই রাণীর কাছে এই অভিযোগ তারা করলেন আর তাই স্বচক্ষে তাঁকে দেখিয়ে দেবেন বলে ডেকে আনলেন।

পূজা করে গদাধর যখন ভোগের থালা হাতে নিয়ে, মাকে এক গাল খাইয়ে দিচ্ছেন আর নিজে এক গাল খাচ্ছেন, তখন তারা রাসমণিকে ডেকে এনে, সেই অনাচারের দৃশ্য দেখিয়ে, ব্যবস্থা করতে বললেন। হঠাৎ তাদের গোলমাল আর রাণী রাসমণিকে দেখে, গদাধরের হাত থেকে থালা পড়ে গেল। তিনি ভয়ে প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ছোট শিশুর মত মা ভবতারিণীর পাশে গিয়ে তাঁর আঁচল ধরে এক একবার উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন। রাণী রাসমণি এই দৃশ্য দেখে কিছুই বললেন না। শুধু তাঁর দু' চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগল। তিনি মনে মনে বললেন, ধন্য আমি! ধন্য আমার মা গো দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা! আজ আমি কি দেখলুম! এ পূজারী তো সামান্য পূজারী নন। ও যে মায়ের আদুরে ছেলে—ও যে তাই মা ছাড়া আর কিছুই জানে না।

রাণী রাসমণির এই অবস্থা দেখে, সকলে প্রথমে যেন একটু অবাক হয়ে গেলেও, গদাধরের এই অনাচারের একটা কিছু ব্যবস্থা হবে ভেবেছিল। কিন্তু কিছুই হলো না, রাণী তাদের গদাধরের কাজে বাধা দিতে বারণ করলেন।

রাসমণি মথুরের কাছে শুনলেন কর্ম্মচারীরা এই রকম কথা তাঁকেও বলেছিল। কিন্তু তিনি গিয়ে যা দেখলেন, তাতে তাঁরও চক্ষু সার্থক হয়েছিল।

গদাধরকে জনসাধারণের বিদ্রূপ—

পূজায় বসে মাকে গদাধর নিয়মিত ডাকতে পারে না। ফুল

দিয়ে মাকে সাজাচ্ছে তো সাজাচ্ছেই, আরতি করছে তো আরতি করছেই। তার এই ধরণের পূজা দেখে লোকে বিদ্রূপ করে বলছে আহা-মরি! কি পূজাই হচ্ছে!

গদাধরের তাদের কথায় কান নেই। তিনি মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। তিনি শিশুর মত কেঁদে মাকে বলেন, আমার কথা তুই শুনছিস না কেন মা? আমি বেদ-বেদান্ত জানি না বলে কি তোর স্নেহও জানব না? এই রকম করে কেঁদে কেঁদে কখন কখন তিনি মাটিতে মুখ ঘষেছেন, মাটী কাদা হয়ে গেছে চোখের জলে।

গদাধরের এই অবস্থায় জনসাধারণের কৌতুহল—

মায়ের কাছে গদাধর প্রার্থনা করে, তারপর বাইরে এসে, মাটিতে লুটিপুটি খেয়ে যখন কাঁদতেন তখন পথ চলতি লোক কৌতূহলে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করত, ছোক্‌রার মা মরেছে বুঝি? আহা! মাকে ও বোধ হয় খুব ভালবাসত, তাই না?

গদাধরের শেষে আত্মহত্যার সংকল্প—

চারিধারে লোকের ভিড় হয়ে যেত তবু গদাধরের এই একই ভাবে কান্নার বিরাম নেই। তিনি আকুল হয়ে বলেন, এক এক করে দিন চলে যাচ্ছে মা আর এক এক করে এগুচ্ছি মৃত্যুর দিকে। আর সহ্য হচ্ছে না—দেখা দে মা!

মায়ের কাছে এসে, তাঁর কাছে আবার কেঁদে কেঁদেও যখন কিছু হয় না—মা তাঁকে দেখা দেন না—যখন গদাধর খাঁড়া নিয়ে নিজের মাথা কাটতে যাবেন—ঠিক তখন তিনি মা তুই এতদিনে দেখা দিলি বলে, মাটিতে পড়ে মূর্চ্ছা গেলেন।

গদাধরের শুদ্ধ চৈতন্যময়ী জ্যোতির মাঝে মাকে দর্শন—

কী দেখলুম—যেন ঘর, বাড়ী, ছাদ, দেয়াল সমস্ত কোথায় মিশে গেল। কোথাও কিছু নেই, শুধু সীমাহীন উজ্জ্বল সমুদ্র। যেদিকে তাকাই, দেখি তার অনন্ত ঢেউ আমাকে গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছে। চারিদিক থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটে আসছে। তারপর চোখের পলকে আমাকে আচ্ছাদন করে ফেললে, ভেঙে

গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিলে, একাকার করে কোথায় কি করে দিলে—কোথায়—কোথায় তলিয়ে গেলুম। কিন্তু মা ঐ কি তোমার শুদ্ধ চৈতন্যময়ী জ্যোতি ?

কি জানি ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমাকে ডুবিয়ে নিয়ে গেল অতলে। আমি আনন্দে মা—মা বলে কেঁদে উঠলুম। মনে হল, ও যে মা—ও তো কেউ নয়, তাই মা-ই আমাকে যেন টেনে নিলেন কোলের মধ্যে।

গদাধরের কিন্তু একবার দেখে তৃপ্তি নেই। বার বার তাঁকে দেখতে চায়।

মাকে গদাধরের অনুরোধ—

গদাধর মাকে বলেন, একবার একটু হেসে, একটু হাত বাড়িয়ে দিয়ে, কাছে একটু দাঁড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেলি চুল এলিয়ে, তাতে হবে না। সর্ব্ব-সম্পুর্ণ আর শান্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।

মহামায়াকে গদাধরের স্বচক্ষে দর্শন—

ঝম্‌ঝম্ করে যেন কে উঠছে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে, কে যেন গভীর রাতে মন্দিরের চাতালে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। ক্ষিপ্র গতিতে গদাধর দেখেন, মা মহামায়া মন্দিরের দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। গদাধর মন্দিরে ঢুকে দেখেন, মায়ের মূর্ত্তি নেই মা সশরীরে বসে আছেন। গদাধর তাঁর নাকের নীচে হাত রেখে অনুভব করেন, স্পষ্ট নিঃশ্বাসের স্পর্শ। মা ঘর আলো করে ভোগ খেতে বসেছেন। কোন কোন দিন মন্ত্র বলবার অবসর দেন না। হাত বাড়িয়ে নৈবেদ্য নিতে চান।

মাকে গদাধরের আত্মবৎ সেবা ও ওলট-পালট পূজা—

ফুল পাতা দিয়ে পূজা না করে গদাধর মাকে নৈবেদ্য দিচ্ছেন—তাই তাঁর ভাগ্নে হৃদয় ছুটে এসে বলেন, মামা কি করছ ?

উত্তর নেই। হৃদয়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে, গদাধর ওলট-পালট পূজা করে, মন্ত্র না বলেই মাকে ভোগ দিচ্ছেন। নিজে খাচ্ছেন, মাকে খাওয়াচ্ছেন।

ভাবুক গদাধরের সর্ব্বজীবে মাতৃদর্শন ও দক্ষিণেশ্বরের কর্ম্মচারীদের নানা অভিযোগ—

গদাধর কখন কখন, মায়ের কথায় যেন ছোট ছেলের মত রূপার সিংহাসনে শুয়ে পড়েন। ঘরের মধ্যে বেড়ালকে দেখে বলেন, ওমা তুই এসেছিস? খাবি মা? এই খা বলে ভোগ তাকে খাওয়ান, কখন মাকে গান শোনান ভাবে বিভোর হয়ে। ভূ-কৈলাসের নামজাদা বৈদ্য এসে, তাঁকে দেখে ওষুধ দিলেন। কিন্তু এ রোগের ওষুধ নেই। এ রোগের ওষুধ মাতৃদর্শন ও মাতৃস্পর্শন। তাই হৃদয় বলে, কামারপুকুরে খবর পাঠাই, মায়ের ছেলে ফিরে যাক মায়ের কাছে।

মন্দিরের কর্ম্মচারীরাও এই সুযোগ বুঝে গদাধরের নামে মথুরবাবু ও রাণী রাসমণির কাছে অভিযোগ করেন। মথুরবাবু, রাণী রাসমণি, তাঁদের কথায় এসে, ঠাকুর গদাধরকে শাসন না করে আরো তাঁর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠেন। কর্ম্মচারীদের অভিযোগ বৃথা হয়।

শিব-গুণ-গানে বিহ্বল গদাধর ও আম্‌লা-ফয়লার ব্যঙ্গোক্তি—

আর একদিন গদাধর শিবের মন্দিরে ঢুকে মহিম্নঃ স্তোত্র পড়তে পড়তে, শিবের মহিমার কথায় খুব বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা কেমন করে বলব বলে, মুক্তকণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন।

আম্‌লা ফয়লারা চারদিক থেকে ছুটে এলো। সকলে বলতে লাগল, ছোট ভট্‌চাজ আবার পাগ্‌লামি সুরু করেছে—সেই পেটেণ্ট পাগলামি। শিবের ঘাড়ে না বসে—ওকে টেনে রাখ! আজকে খুবই বাড়াবাড়ি দেখছি—ওর হাত ধরে টেনে রাখ!

কর্ম্মচারীদের প্রতি মুগ্ধ মথুরের সতর্ক বাণী—

সেদিন মথুরবাবু দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। গোলমাল শুনে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে মোহিত হয়ে গেলেন। তারপর আম্‌লা-ফয়লার মন্তব্য শুনে, গর্জ্জন করে বললেন, খবরদার! কেউ ছোট ভট্‌চাজের গায়ে

হাত দিও না। মথুরবাবুর কথায় তারা খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, তারপর চুপ করে চলে গেল।

এই দুস্তর্ ভবসমুদ্রে গুরুই একমাত্র কর্ণধার, তাই তাঁর গুরু গদাধরকে তিনি মুগ্ধ নেত্রে দেখতে লাগলেন। এমন সময় গদাধরের জ্ঞান ফিরে আসায় তিনি দেখলেন, চারিধারে ভিড় জমে আছে আর তার মধ্যে সেজবাবু অর্থাৎ মথুরবাবু দাঁড়িয়ে। তাই গদাধর শিশুর মত ভয়ে ভয়ে বললেন, এখন কিছু অন্যায় করলুম?

মথুরবাবু বললেন, না বাবা আপনার স্তবপাঠ এখানে আমরা সকলে শুনছি।

অন্তর্যামী গদাধরের রাসমণির প্রতি সতর্ক-বাণী—

একদিন রাণী রাসমণি নিজে ঠাকুরের পূজা দেখতে এলেন। ঠাকুরের পূজা দেখে ভক্তিমতী রাসমণির চোখের জল ঝর্ঝর্ করে ঝরে পড়ল। তিনি ঠাকুরের কাছে বসে মায়ের পূজা দেখছেন বটে কিন্তু তাঁর মনে তখন সংসারের চিন্তা জেগেছে। এই সময় একটা মামলার কথা তিনি বসে বসে চিন্তা করছিলেন। এই মনোভাব ঠাকুর জানতে পেরে, রেগে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে রাসমণির পিঠে এক চাপড় বসিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে বললেন, এখানে বসেও বিষয়ের ভাবনা ভাবছ?

ঠাকুর কি করে রাসমণির মনোভাব বুঝতে পারলেন, কি করে জানলেন তাঁর হৃদয়ের মধ্যে কি কথা হয়েছে! এখন তাই রাসমণির চোখ দিয়ে আবার জল ঝরে পড়ল। তিনি গদাধর ঠাকুরের ওপর আরো ভক্তিমতী হয়ে উঠলেন।

মথুরমোহনের গদাধরের মাঝে অপরূপ রূপদর্শন—

একদিন মথুরবাবু কাছারি ঘরের ভেতর কাজ করছেন আর সেখান থেকে তাঁর গুরুর দিকে মাঝে মাঝে চাইছেন।

ওদিকে গদাধর পুব থেকে পশ্চিম আর পশ্চিম থেকে পূবে বার বার টহল দিচ্ছেন।

একি হল! হঠাৎ মথুরবাবু এক কাণ্ড করে বসলেন। তিনি

গদাধরের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার মধ্যে এক অপরূপ রূপদর্শন হোল। তিনি এই কথা বলেন আর কাঁদতে থাকেন।

গদাধর তখন তাঁকে বললেন, তুমি গন্নি-মান্নি লোক—রাণীর জামাই—লোকে দেখলে কী বলবে? মথুরবাবু বললেন—আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন পূব থেকে পশ্চিমে আসছ তখন তুমি নও—মন্দিরের মা আসছেন। আবার যখন পশ্চিম থেকে পূবে যাচ্ছ, তখন দেখছি সাক্ষাৎ মহাদেব যাচ্ছেন।

গদাধর এই কথা শুনে বললেন, কই বাপু আমি তো কিছু বুঝতে পারলুম না। ওসব ধোঁকা বলে তিনি উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

মথুরবাবু কিন্তু তাঁর পা কিছুতেই ছাড়বেন না কারণ তিনি জগৎ-গুরুকে পেয়ে গেছেন।

গদাধরের কাছে মথুরের পরাজয় স্বীকার, মার ইচ্ছায় প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্ত্তন—

একদিন মথুরবাবুর সঙ্গে গদাধরের কথা হচ্ছিল। তিনি মথুরবাবুকে বলছিলেন, ঈশ্বরের কাছে ভাঙ্গাগড়া একটা খেলা। তিনি নিয়ম করেছেন আবার তিনিই নিয়ম ভাঙছেন। তিনি সকল নিয়মের বাইরে।

মথুরবাবু তাঁর কথা মানতে চাইলেন না। তিনি বললেন, ঈশ্বরের নিয়মে লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই ফোটে—কই ফুটুক দেখি সেখানে সাদা ফুল! পরদিন গদাধর এ কী দেখছে! তিনি দেখলেন, মন্দিরের বাগানে একটি জবা ফুলের গাছের একই ডালে একটি টকটকে লাল আর একটি ধবধবে সাদা ফুল ফুটে আছে।

গদাধরের বড়ই আনন্দ! ঈশ্বর অল্প নয়—অক্ষম নয়—তিনি আবদ্ধ নন—তিনি কৃপানিধি। তাই তিনি ডালটি ভেঙ্গে নিয়ে মথুরবাবুকে দেখালেন। মথুরবাবু তাই দেখে মনে মনে অবাক্ হয়ে গেলেন—তিনি হার স্বীকার করলেন।

গদাধরকে সন্দিগ্ধ মথুরের পরীক্ষা—

গদাধরের প্রতি মথুরমোহনের ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হতে লাগল।

তিনি ভাবলেন, গুরুই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেন—তিনিই আলোর সন্ধান দেন। কিন্তু এখনও—এখনও নয় আরো একটু পরীক্ষা চাই।

মথুরবাবু ভাবলেন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ফলেই গদাধরের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। নিবৃত্তির কাঠিন্য থেকে যদি ক্ষণিক মুক্তি পান হয়তো তা হলে তিনি একটু সুস্থ হতে পারেন। কিন্তু একথা মুখে বললে, তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করবেন। তাই তিনি ফাঁদ পেতে সহজে তাঁকে ধরতে চাইলেন।

শহর থেকে দুটি পতিতা মেয়েকে এনে, চুপিচুপি তিনি দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। তারা ঘরে যেতেই, গদাধর মুগ্ধের মত তাদের দিকে চেয়ে, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, মা—মা এসেছিস? এই কথা বলেই, তিনি তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

এখন মেয়ে দুটি পালাতে পারলেই যেন বেঁচে যায়, এমনি অবস্থায় দাঁড়াল।

গদাধরকে মথুরের আরো একবার রীতিমত পরীক্ষা—

মথুরবাবু আরো একবার চেষ্টা করলেন। মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে কতকগুলি মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে তিনি গদাধরকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন—পালিয়ে ঠিক নয়, বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গদাধর সকল স্ত্রীলোকের ভেতরেই সেই জগজ্জননী বর্ত্তমান, স্মরণ করে মাতৃস্তব আরম্ভ করলেন। শিশুর মত হয়ে গেলেন। কোন কিছুই তিনি তাদের বললেন না। তাঁর বাহ্য সাড়া লোপ হতেই, মেয়েগুলো কান্নায় কোলাহল করতে লাগল। তারা গদাধরের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললে, ক্ষমা করুন অভাজনদের!

মথুরবাবু সেখানে আসতে মেয়েগুলো তাঁকে ভর্ৎসনা করল। কিন্তু তিনি শম, দম, শৌচ, সৌম্যের প্রতিমূর্তি গদাধরকে পেয়ে, গুরুপ্রাপ্তির গরিমায় গর্বিত হয়ে উঠলেন। আনন্দে গুরুই যে জ্ঞানদাতা, তা ভাল করেই তাঁর বারবার মনে হতে লাগল। তাঁর

দ্বিতীয়বারের এই পরীক্ষায়, আজ কত বড় শিক্ষা হল, যা কেবল তিনিই নিজের অন্তরে ও বাহিরে উপলব্ধি করলেন।

গদাধরের সখীভাব—

গদাধর স্ত্রীলোককে মাতৃরূপে দর্শন করতেন এবং নিজেকেও মাঝে মাঝে সখীরূপে ভাবতেন। তাই এখন তাঁর সখ হল, তিনি মাকে পাঁয়জোর পরাবেন।

মথুরবাবু পাঁয়জোর গড়িয়ে দিলেন। বেনারসী শাড়ী, ওড়না, ডায়মণ্ড-কাটা গহনা এক সুট দিলেন, স্ত্রী-বেশ ধরবে গদাধর।

পূর্বে গদাধর যখন বালক, তখন বাড়ীর মেয়েরাও তাঁকে ডেকে এনে তাঁর মধুর কণ্ঠের কীর্ত্তন গান শুনতেন।

দুর্গাদাসের দর্পচূর্ণ—

সীতানাথের বাড়ীর মেয়েরা পর্দ্দানশিন অথচ গদাধরের কাছে তাদের সঙ্কোচতা নেই। গদাধর যেন তাদের আপনার লোক। দুর্গাদাস পাইন কিন্তু বলতেন, গদাধর হীরের টুকরো ভাল ছেলে, ভগবানের নামকীর্ত্তন করে—কিন্তু মেয়েদের বেচাল চলবে না একটুও। উটকো লোক আমার বাড়ীতে ঢুকতে পারবে না। কাক পক্ষী গিয়ে বাড়ীর খবর নিয়ে আসুক আর মেয়েদের মুখ দেখে আসুক দেখি। আটঘাট বাঁধতে জানা চাই।

সন্ধ্যাবেলায় দুর্গাদাস বৈঠকখানায় বসে আছে। এমন সময় এক অল্পবয়সী তাঁতির মেয়ে এসে বললে, আমি হাটে এসেছিলুম। কিন্তু সঙ্গিনীরা আমায় ফেলে চলে গেছে। সন্ধ্যাবেলায় পথ চলতে ভয় করছে। একটু আশ্রয় পাই তো ভাল হয়, বেঁচে যাই। দুর্গাদাস তাকে বললে, বেশ তো মেয়েদের বলি, যদি তারা মত করে তা হলে থাকতে পার।

মেয়েটি থাকবার অনুমতি পেয়েছে। কি জানি, তার মধ্যে একটা বিশেষ আকর্ষণ যেন আছে। তাকে দেখলে সকলেরই একটা মায়া হয়। সে যেন জাদু জানে। তাই মুড়িমুড়কি দিয়ে জলযোগ করে, এঘর ওঘর তন্ন তন্ন করে দেখে, সকলের সুখ দুঃখের ইতিহাস

জেনে, একেবারে আপনার মত হয়ে গেল। গদাধরকে খোঁজ করে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই তার ভাই রামেশ্বর গদাই—গদাই আছিস বলে, এধার ওধার খুঁজে বেড়াচ্ছে। উঁচু গলায় রামেশ্বরের ডাক্ শুনে, মেয়েটি কান খাড়া করে লাফিয়ে উঠে বললে, 'যাচ্ছি গো দাদা—এই যে আমি এখানে।' এই বলে সে এক ছুটে বাইরে চলে গেল। বাড়ীর মেয়েদের কাছে সমস্ত শুনে শুধু দুর্গাদাস বললেন, "প্রভু আমার অহংকার চূর্ণ করেছেন।"

কেন সখীভাব ধরি—

উত্তরকালে ঠাকুর তাই বলেছেন, "আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে, কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে ঠিক মেয়েদের মত ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেকদিন মেয়েদের মত কাপড়-গয়না পরে ওড়না গায়ে দিয়ে সখীভাবে ছিলুম। আবার ঐ ভাবেই আরতি করতুম। তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রাখতে পারতুম? দু'জনেই মার সখী। আমি আপনাকে শুধু পুরুষ বলতে পারি কই। একদিন আমার ভাবাবস্থায় পরিবার জিজ্ঞেস করলে, আমি তোমার কে?

আমি বললুম, তুমি আনন্দময়ী।"

বাৎসল্যরসের সাধনায় গদাধরের স্ত্রী-ভাব—

বাৎসল্যরসের সাধনায়, গদাধর নিজেকে অনুভব করতেন তিনি এখন কৃষ্ণকামিনী গোপাঙ্গনা।

মথুরবাবু তাই তাঁকে শাড়ী, ঘাঘ্‌রা, ওড়না, কাঁচুলি, এমন কি মাথার পরচুলা পর্যন্ত কিনে দিয়েছেন।

গদাধরকে দেখে কেউ চিনতে পারে না। অন্তরে বাহিরে এক হয়ে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মার আরতির সময় চামর দোলায়। সে সখী, সে দাসী—সে সেবিকা—রাধারাণীর ভজনায়, তাঁর দেহে রাধারাণীর আবির্ভাব হয়। তখন সে কেঁদে আকুল হয়ে, অনবরত বলে, আমার কৃষ্ণকে এনে দাও!

প্রথম কৈশোরে গদাধর মনে মনে আক্ষেপ করেছে। সে কেন

মেয়ে হয়ে জন্মাল না, মেয়ে হলে গোপিনীদের মত দিব্যি কৃষ্ণকে ভজনা করতে পারত। সে একদিন পেয়েও যেত শেষে। তার পুরুষ-দেহটাই কিন্তু সেই সাধনার শুধু বাধা।

গদাধরের জ্যোতির্ম্ময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন এবং ভগবৎ ও ভগবানে এক উপলব্ধি—

প্রত্যেক বছর পাণিহাটিতে মহোৎসব হয়। গদাধরের যখন বাইশ বছর বয়স তখন সেখানে গেলেন। প্রথম দেখা হল বৈষ্ণবাচরণ গোস্বামীর সঙ্গে। সেখানে গদাধরঠাকুর বাটিতে বসে আছেন, সাধক ও পণ্ডিত বৈষ্ণবাচরণ তাঁকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন! এক নিমিষে চিনে নিলেন সুন্দর দিব্যপুরুষকে। বৈষ্ণবাচরণ পাঁচটা টাকা দিয়ে বললেন, আম কিনে খেও।

তিনি বললেন, না-না টাকা কি হবে? কিন্তু বৈষ্ণবাচরণ ছাড়লেন না, হৃদয়কে দিয়ে আম কেনালেন, ভোগ হবে। গদাধরকে নিয়ে কীর্ত্তন সুরু হোল। দেখতে দেখতে গদাধরের সমাধি হয়ে গেল।

সমাধি ভঙ্গের পর ভোগের দ্রব্য তাঁকে খেতে দেওয়া হোল। কিন্তু গলা দিয়ে তা নামল না।

টাকা ও মাটি—

গদাধর পরে গঙ্গাতীরে এক হাতে মাটি আর অন্য হাতে টাকা নিয়ে ওজন বুঝছেন। মনের মধ্যে বিচার করে তিনি বললেন, মাটি আর টাকা দুই-ই সমান। তিনি তখুনি টাকা আর মাটি গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি বললেন, তাঁকে পেলে সমস্ত কিছুই পেয়ে যাব।

গদাধরের পঞ্চবটী তলায় সাধনা—

রাতে গদাধর ঘুময় না। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী বা আমলকী আর অশোকবৃক্ষের সমাহ বা সমাহারের নাম পঞ্চবটী—এইখানে গদাধর ধ্যান করতে আসেন। এর চারপাশে ঘন জঙ্গল, ঢুকতে ভয় করলেও হৃদয় একদিন মামার পিছু নিয়ে সেখানে গেল। গিয়ে যা

দেখল, তাতে অবাক্ হয়ে গেল। সে দেখল, তার মামা গদাধর গলার পৈতা, কাপড় সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। হৃদয় ঢিল ছুঁড়ে তাই মামাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে সাবধান করে দিলে; কিন্তু তিনি বললেন, আমি ভূতের ঢিল ছোঁড়া আর তার দাপাদাপি কিছুই টের পাই না।

হৃদয় রাগ করে বলে, পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে তুমি উলঙ্গ হয়েছ যে?

গদাধরের বক্তব্য ও দাস্যভাব—

হৃদয়ের এই কথায় গদাধর তাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে শেষে বলেছিলেন, পরিধেয় আর পৈতা উপাধি ছাড়া আর কিছু নয়। অভিমানের চিহ্ন। তাই সমস্ত ত্যাগ করতে হবে। অহঙ্কার থাকবে না। এই ত্যাগ না করলে দীনতা আসে না। দীনতা না এলে সরলতা আসে না। সরলতাই যে আমার মায়ের নাম।

গদাধর তাই সময় সময় হনুমানের মত লেজ করে লাফ্ দিয়ে বেড়িয়েছেন। আস্ত ফল-মূল খেয়ে নিজেকে রামের ভক্ত হনুমান ভেবেছেন। এ তাঁর দাস্যভাব।

স্বর্ণকার ও কষ্টিপাথর—

গদাধর কখন উলঙ্গ হয়ে, আবার কখন বেনারসী ওড়না, পরচুল এবং মথুরবাবুর দেওয়া ভাল ভাল গহনা পরে স্ত্রী-বেশে তাঁকে ডেকেছেন। কখন কখন লেজ করে হনুমান হয়ে রঘুবীর রঘুবীর বলেছেন, আবার কখন শিশুর মত মা মা বলে নানা ভাবের ভাবুক হয়ে তাঁকে ডেকেছেন বারবার। পাকা সেক্‌রা খাঁটী সোনা দেখলেই চিনতে পারে। কিন্তু তবুও সে কষ্টিপাথরে বারবার সেই খাঁটী সোনাকেও ঘষে দেখে ভাল করে যেমন বুঝে নেয়—তেমনি মথুরবাবু পাকা ভক্ত হয়েও গদাধরকে বারবার পরীক্ষা করে দেখেছেন।

দক্ষিণেশ্বরে ভৈরবীর আবির্ভাব ও সকল সমস্যার সমাধান—

একদিন সকাল বেলায় গদাধর মন্দিরের বাগানে ফুল তুলছেন সঙ্গে তাঁর ভাগ্‌নে হৃদয়রাম।

এমন সময় গঙ্গার ঘাটে একখানা নৌকা এসে ভিড়লো। নৌকা থেকে এক ভৈরবী নামলেন। গেরুয়া পরা, এলোচুল, লাল ধক্ ধক্ করে সিঁদূর জ্বলছে কপালে। হাতে ত্রিশূল। যেন সত্যি তিনি দেবীমূর্তি।

গদাধরঠাকুর হৃদয়কে বললেন, ভৈরবীকে ডেকে আনতে। হৃদয় ভৈরবীকে ঠাকুরের কাছে ডেকে আনলেন। গদাধর তাঁকে চিনতে পারলেন আর ভৈরবীও তাঁকে চিনতে পারলেন।

ভৈরবী আনন্দে আর বিস্ময়ে কেঁদে গদাধরকে বললেন, বাবা তুমি এখানে? গঙ্গাতীরে আছ জেনেছি। সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে। এতদিন পরে দেখা পেলাম তোমার।

গদাধর বললে, আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছ মা? কিন্তু আমায় জানলে কেমন করে?

এ প্রশ্নের উত্তরে ভৈরবী বললেন, মহামায়ার আদেশ হল, যেন আমি তিনজনের সঙ্গে দেখা করি। দুজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, বাকী ছিলে তুমি।

গদাধর তাঁর গায়ের জ্বালা এবং অনিদ্রার কথা বললেন। ভগবানকে ডেকে শেষে পাগল হলাম। লোকে আমায় পাগল বলে তাই কি সত্যি?

ভৈরবী বললেন না না, এ হচ্ছে মহাভাব। রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্যের এই ভাব হয়েছিল। বইয়ে লেখা আছে; মিলিয়ে দেব।

গদাধর আবার ভৈরবীকে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তুমি কে মা?

ভৈরবী বললেন, শুধু এইটুকু জেনে রাখ আমার জন্ম ব্রাহ্মণের ঘরে। কিছু নাম দিতে চাও তো আমার নাম বলো যোগেশ্বরী।

এইবার এখানে কেন তাঁর আবির্ভাব, সেই কথাই তিনি বললেন।

ভৈরবীর প্রথম দুই শিষ্য, সিদ্ধাই চন্দ্র ও গিরিজা—

গদাধরকে ভৈরবী বললেন, আমার প্রথম দুই শিষ্য চন্দ্র আর গিরিজা। এবার হলে তুমি। বরিশালে ওদের দুজনেরই বাড়ী। এইবার তোমার পালা; কারণ ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে তবে এসেছি।

ওরা কি শিখলে এই প্রশ্ন গদাধর করায়, তার উত্তরে ভৈরবী বললেন, দক্ষিণেশ্বরে ওদের নিয়ে এসে তিন শিষ্যকে একত্র করব। ক'দিনের মধ্যেই তা দেখবে।

ধ্যানমগ্না ভৈরবীর অন্ন নিবেদন ও ভগবান রঘুবীরের সেই অন্ন গ্রহণ—

ভৈরবীর গলায় রঘুবীর-শিলা ঝুলছে। চারধার তিনি ঘুরে দেখে তারপর পঞ্চবটীতে রাঁধতে গেলেন। রান্না শেষ করে পরে বঘুবীরের সামনে ভোগ রেখে ভৈরবী ধ্যানমগ্না। তাঁর তখন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রু। আনন্দে আত্মহারা ভৈরবী দেখছে রঘুবীর যেন তাঁর নিবেদন করা অন্ন খাচ্ছেন।

ভৈরবীর জ্ঞান হতে তিনি চোখ মেলে দেখেন, সত্যই তো খাচ্ছে ; কিন্তু যে খাচ্ছে সে গদাধর।

ভৈরবী এই দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল।

গদাধরের যেন এইবার জ্ঞান হল। সে অপ্রস্তুত হয়ে বললে, কি জানি যত সব আজব কাণ্ড করে বসি।

ভৈরবী বললেন, বেশ করেছ! আমি পেয়ে গেছি রঘুবীরকে। এইবার গদাধরের উচ্ছিষ্ট অন্ন রঘুবীরের প্রসাদ বলে খেয়ে, গঙ্গার তীরে এলেন। তারপর এতদিন যে শিলা গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন তা নিমিষে গঙ্গায় ফেলে দিলেন। তিনি বললেন, পেয়ে গেছি প্রাণস্বরূপকে। শিলামূর্ত্তিতে কি হবে।

ভৈরবীকে গদাধরের সতর্কবাণী—

দিনকতক এইভাবে কেটে যাবার পর গদাধর ভৈরবীকে বললেন, গ্রামের লোক হয়ত অন্যায় কিছু রটনা করবে, তাই তুমি দূরে সরে থাকো।

দক্ষিণেশ্বরের উত্তরে দেবমণ্ডলের ঘাটে ভৈরবী আশ্রয় পেলেন। তারপর গাঁয়ে ঘুরে সকলেরই মন টেনে নিলেন। এ বলে সিধে নাও, ও বলে থাক না আমার বাড়ীতে। ভৈরবীর মধুর কথায় সকলেই মুগ্ধ। দুর্নাম করার সাহস কার আছে।

ভৈরবীর করুণ কান্নায় গদাধর—

কিন্তু সত্যি কি আশ্চর্য। দু'মাইল দূরের কান্না গদাধর শুনতে পান। তারপর এক নিঃশ্বাসে ছুটে গিয়ে বামনির হাতের ননী তুলে খেতে থাকেন।

যশোদাবেশী অপরূপা ভৈরবী ও গোপাল গদাধর—

প্রায় চল্লিশ বছর বয়স ভৈরবীর। দেখতে সে অপরূপা সুন্দরী। গেরুয়া পোষাক কোন কোন দিন বদল করেন। গাঁয়ের মেয়েদের শাড়ী, গহনা চেয়ে পরেন। তারপর ওদের সাহায্যে নানা ভক্ষ ভোগ্য নিয়ে গান গাইতে গাইতে, তাঁর গোপাল গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী খাওয়াতে আসেন। ভৈরবীকে দেখে, গদাধরের মনে হয়, বুঝি সেই নন্দরাণী মা যশোদা—বাৎসল্যরসের সুরধুনী।

মাতৃস্বরূপিণী নারীই গদাধরের ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম গুরু—

ভৈরবী বললেন, মায়ের আশীর্ব্বাদে ও আদেশে তোকে চৌষট্টি-খানা তন্ত্র শেখাব।

তাই শুনে গদাধরের চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল আনন্দের আলো। মঙ্গলময়ী মাতৃস্বরূপিণী নারীই হলেন ঠাকুরের প্রথম ধর্ম্ম-জীবনের গুরু।

এ পর্যন্ত গদাধর নিজের চেষ্টায় অর্থাৎ অন্তরের ব্যাকুলতায় ঈশ্বরকে ধরতে চেষ্টা করেছে। এখন দেখা যাক্ গুরুর সাহায্যে—গুরু যোগেশ্বরীর নির্দ্দেশে—কতদূর যেতে পারেন, এই কথাই গদাধর ভাবলেন।

ঠাকুর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করেছেন অথচ একজন স্ত্রীলোক হলেন তাঁর গুরু ?

তবে এই প্রশ্নের উত্তরে একটা কথা আছে, নারীর মধ্যে যে ভৈরবীর গ্রামসী তাকে ত্যাগ করবে। কিন্তু যে মাতৃস্বরূপিণী গদাধরযোগিনী তাকে অভিনন্দন করবে। তাকে সাদরে সর্ব্বাগ্রে গিরিজা। .ব। তাই তো সাধক রামপ্রসাদ ভাবে বিভোর হয়ে এইবার ৫—

যতনে হৃদয়ে রেখো,
　　আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দেখ আর আমি দেখি,
　　আর যেন কেউ না দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি,
　　আয় মন বিরলে দেখি।
বাসনারে সঙ্গে রাখি,
　　সে যেন মা মা বলে ডাকে।

গদাধর যেন পাঁচ বছরের ছেলে—

রাজা জনকের সভায় একদিন এক ভৈরবী এসেছিলেন। স্ত্রীলোক দেখে জনকরাজা মুখ হেঁট করায়, তখন ভৈরবী তাঁকে বলেছিলেন, তোমার এখনও পূর্ণজ্ঞান হয় নি। তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়! পূর্ণজ্ঞান হলে তাঁর তখন স্বভাব হয় পাঁচ বছরের ছেলের মত। স্ত্রী আর পুরুষ তখন অভেদ। তাই স্ত্রী-পুরুষ সমজ্ঞানী আমাদের গদাধরও যেন সেই পাঁচ বছরের ছেলে।

ভৈরবীর নির্দ্দেশ—রাধিকা ও শ্রীচৈতন্যের মত অবস্থা প্রাপ্ত গদাধর অবতার—

গদাধর ভৈরবীকে বললে, মা অসহ্য গায়ের জ্বালা কিসে যাবে বলতে পার?

প্রসন্নমুখে ভৈরবী বললেন, পারি। শাস্ত্রে আছে এমনি ধারা শ্রীরাধিকার আর চৈতন্যদেবের হয়েছিল। এ চর্ম্মদাহ নয়—মর্ম্মদাহ।

ভৈরবী শুনেছিলেন, শিওড়ে যাবার সময় দুটি ছেলে গদাধরের দেহ থেকে বেরিয়ে, মাঠে খেলা করে আবার তাঁর দেহেই ফিরে এসে মিলিয়ে গেল। ভৈরবী তাই এখন বললেন, নিত্যানন্দ খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব। ওষুধে এ জ্বালা কমে না।

শ্রীরাধিকা আর চৈতন্যের আবির্ভাব যে দেহে হয়, সে কি মানুষ?

ভৈরবী বললেন, তুমি অবতার! তোমার মাঝেই অনন্ত ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন।

ভৈরবীর চিকিৎসায় গদাধর—

এখন তাই ভৈরবী তাঁকে সুগন্ধি মালা পরিয়ে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপে দিতে বললেন। গদাধর ভৈরবীর কথামত তাই করলেন।

মথুরবাবু বললেন, দেখাই যাক্ চিকিৎসাটা কেমন! আশ্চর্য্যের কথা, সত্যি তিনদিনের মধ্যে গদাধর ভাল হয়ে গেলেন।

রসিক মথুরমোহনের প্রশ্নে দৃঢ়চেতা ভৈরবীর উত্তর—

মথুরবাবু পরীক্ষার জন্য ভৈরবীকে কালীমন্দিরের বারান্দায় পাকড়াও করে বললেন, বেড়ে ভৈরবী তো সেজেছ কিন্তু তোমার ভৈরব কোথায়?

মন্দিরে মা কালীর পায়ের তলায় যে মহাকাল শুয়ে আছেন তাঁর দিকে আঙ্গুল দেখালে ভৈরবী।

মথুরবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, ও তো অচল—বলি সচল ভৈরবটি কোথায়?

ভৈরবী মাথা তুলে দৃঢ় স্বরে বললেন, যদি ঐ অচলকে সচল করতে না পারি তবে কি মিছামিছিই ভৈরবী হয়েছি!

মথুরবাবু ভৈরবীকে উর্দ্ধ ফণিনীর মতো মাথা তুলে, খুব দৃঢ় স্বরে এই কথা বলতে শুনে, একটু ধাক্কা খেয়ে চুপ করলেন। কিন্তু তবু—তবুও তাঁর মন থেকে সন্দেহ একেবারে গেল না।

ভৈরবীর নির্দ্দেশ পালনে গদাধরের ভীষণ অস্বাভাবিক ক্ষুধার শান্তি—

ভৈরবীর চিকিৎসায় গদাধরের গাত্রদাহ সারার পর আর এক অসুখ দেখা গেল। গদাধরের ভীষণ ক্ষুধা—কিছুতেই সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তাই ভৈরবীকে তিনি তখন বললেন, মা—এ আবার কি হল মা!

ভৈরবী তাঁকে অভয় দিয়ে, মথুরবাবুকে রাজ্যের বিচিত্র খাবার গদাধরের ঘরে জড় করে দিতে বললেন।

মথুরবাবু ভৈরবীর ওপর আর কোন সন্দেহ না করে বিনা দ্বিধায় গদাধরের ঘরে খাবার জড় করে দিলেন।

ঘরে নানা রকম খাবার দেওয়ায় গদাধর ইচ্ছেমত এটা ওটা অনবরত খেতে লাগলেন। তারপর তিনদিনের দিন সেই চণ্ডাল ক্ষিদে আর একেবারে নেই। গদাধর বেশ সাধারণ মানুষ।

ভৈরবীর অনুরোধে পণ্ডিত সভা—

এর পর ভৈরবী মথুরবাবুকে এক মস্তবড় সভা করতে বললেন। মথুরবাবু ভৈরবীর কথায় কোন প্রতিবাদ না করে, সভার আয়োজন করলেন। সেই সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে, দেশের বড় বড় পণ্ডিতরা এসে যোগদান করলেন।

সভা করার উদ্দেশ্য ভৈরবী তর্ক করে প্রমাণ করবেন যে, গদাধরের দেহে অবতারের চিহ্ন আছে—সে অবতার।

একথা মথুববাবু মানেন না। তিনি দশ অবতারের কথা বলেন।

ভৈরবী তখন তাঁকে বলেন, ভাগবতে বাইশ অবতারের অবতীর্ণ হবার কথা। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে গৌরাঙ্গ আবার রূপ ধরবেন। এ সেই গৌরাঙ্গ। তিনি বলেছেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে" ব্যাসদেবও বলেছেন, অসংখ্যবার তাঁর এইভাবেই আবির্ভাব হবে।
প্রয়োজনে সেই ঈশ্বরই মানুষের মাঝে অবতার রূপে অবতীর্ণ হন।

গদাধরের তান্ত্রিক সাধনা ও তার শেষ—

ভৈরবীর কথামত গদাধর সাধনা করতে লাগলেন—এ সাধনা তান্ত্রিক সাধনা। এই সাধনা তিন বছর ধরে চললো। তারপর শেষ হয়ে গেল।

গদাধরঠাকুরের সেই সাধনা শেষ হয়ে যেতে তিনি মহাসাধক হয়ে দাঁড়ালেন।

মথুরের সভায় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচরণ এবং পণ্ডিত ও তন্ত্রসাধক গৌরীকান্ত—

এই তান্ত্রিক সাধনার পূর্ব্বেই মথুরবাবু ভৈরবীর কথায় সভা করলেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচরণ অনেক পণ্ডিত নিয়ে এসে সভায় ভৈরবীর সঙ্গে তর্ক করলেন বটে কিন্তু ভৈরবী প্রমাণ করলেন

গদাধর অবতার। বৈষ্ণবাচরণ নিজে স্বীকার করেও তবু গদাধরকে অনেক প্রশ্ন করলেন।

গদাধর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, তাই সহজ সরলভাবে বৈষ্ণবাচরণের উত্তর দিলেন। তখন বৈষ্ণবাচরণও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করলেন, গদাধর মনুষ্যরূপে ভগবান!

গদাধর অবতার এই বলায় মথুরবাবু ও আমলা-ফয়লারা একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন।

এরপর মহাপণ্ডিত ও তান্ত্রিক গৌরীকান্ত এসে ভীষণ এক হুঙ্কার ছাড়লেন। গদাধর এবং অন্যান্য সকলে চমকে উঠলেন। কিন্তু গদাধরকে ভেতর থেকে, যেন কে কি নির্দ্দেশ দিলেন। তাই তিনিও এর উত্তরে এক ভীষণ হুঙ্কার দিলেন।

এই হুঙ্কার শুনে সকলে অবাক্ হয়ে গেল। গৌরীকান্ত আত্ম-সমর্পণ করলেন। সভায় বৈষ্ণবাচরণ, গৌরীকান্ত আরো অনেক পণ্ডিত যাঁরা এসেছিলেন, শেষে তাঁরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করলেন—গদাধর অবতার!

গদাধর অবতার—

এইবার গদাধর যে অবতার তা তাঁর আচার-ব্যবহার আর দেহের নানা লক্ষণ দেখে, বুঝতে পারা গেল। ভৈরবী প্রমাণ করলেন, গদাধর অবতার আর পণ্ডিতমণ্ডলীও এক বাক্যে এই কথা সমর্থন করলেন। কিন্তু এ ছাড়াও গদাধর আর তাঁর সহধর্ম্মিণী সারদা-মণির জন্মের পূর্ব্বের ও পরের বিষয় নিয়ে খুব সহজ ও সাধারণ ভাবে আলোচনা করলেই দেখা যায়, তাঁরা মানুষের রূপে ঈশ্বরের অংশ—এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

ক্ষুদিরামের স্বপ্ন—

মানুষ স্বপ্ন দেখে কিন্তু সেই স্বপ্ন অনেক সময় সত্য হয়। গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম গয়ায় তীর্থ করতে গিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন।

তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, গদাধর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন,

তোমার পুত্র হয়ে, তোমার বাড়ীতে জন্মাব তোমার সেবা নেব

ক্ষুদিরাম কাঁদতে লাগলেন। গদাধর তাঁর কান্না দেখে বললেন, ভয় নেই, যা জুটবে তাই খাইও আমায়! আমি একটুও উপকার চাই না—আমি চাই ভক্তি। একমাস পরে ক্ষুদিরাম বাড়ী ফিরে এলেন। সন্তানের কথা তাঁর মনের মধ্যেই রইল।

চন্দ্রমণি কি দেখলেন—এ স্বপ্ন না সত্যি—

চন্দ্রমণি এদিকে রাতে তাঁর বিছানায় শুয়ে দেখলেন যে, তাঁর পাশে কে এমন সুন্দর? মানুষ তো এমন সুন্দর হয় না!

কেউ কোথাও নেই—তবে কি তিনি স্বপ্ন দেখলেন? তাই উঠে বসে, চন্দ্রমণি প্রদীপ জ্বালালেন—ঘরের খিল বন্ধ—কেউ কোথাও নেই।

চন্দ্রমণি ও ঘূর্ণায়মান জ্যোতি—

আর একদিন চন্দ্রমণি শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, মহাদেবের গা থেকে হঠাৎ এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বেরিয়ে এসে ঘুরতে লাগল। তারপর সেই জ্যোতির্ম্ময় আলো প্রবল বেগে তাঁর শরীরে ঢুকতে লাগল। চন্দ্রমণি টলে পড়ে যাচ্ছিলেন। ধনী নামে এক নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক তখনি তাঁকে ধরে ফেললেন।

ধনী চন্দ্রমণির কাছে সমস্ত শুনে বললে, তোর বায়ুরোগ হয়েছে।

ক্ষুদিরামের গদাধরের আগমনবার্ত্তা-ঘোষণা ও চন্দ্রমণির নানা ভাবান্তর—

এই ঘটনার পর ক্ষুদিরাম গয়া থেকে এসে, সমস্ত শুনে বললেন, গদাধর আসছেন।

বুড়ো বয়সে চন্দ্রমণির ছেলে হবে—চেহারা খুব ভাল হয়েছে। তাই তাঁকে দেখে অনেকে বললে, বোধহয় কোন অপদেবতা চন্দ্রমণির পেটে ঢুকেছে।

চন্দ্রমণির নানা ভাবের উদয় হয়। কখন ত্রাস, কখন উল্লাস

আবার কখন উদাস। তিনি কখন কখন বলেন, আমার পতি স্পর্শে এ গর্ভ ঘটেনি। কখন তিনি বলেন, আমার মধ্যে পুরুষোত্তম এসেছেন।

চন্দ্রমণির পুত্র লাভ—অলৌকিক রহস্যপূর্ণ এই শিশুই পরে গদাই বা গদাধর—

চন্দ্রমণির ছেলে হল। কিন্তু শিবমন্দিরের যখন সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিল, তখন পাশে ছিল ধনী আর এখন ভূমিষ্ঠ হবার সময়ও কাছে রয়েছে ধনী—তাই ধনী এই শিশুর হ'ল ধাত্রী-মা। আশ্চর্য্য! ছেলেকে দেখতে যেন ছ'মাসের ছেলে। তারপর একদিন চন্দ্রমণি ছেলেকে নিয়ে রোদে বসে আছেন, হঠাৎ তাঁর মনে হচ্ছে, কোলেতে যেন ভারী পাথর পড়ে আছে। এত ভারী যে তিনি তা সইতে পারছেন না। বিশ্বম্ভরের ভর হয়েছে। তাই কুলোর ওপর ছেলেকে শুইয়ে দিতে, কুলো চড়্ চড়্ করে ভেঙ্গে যাবার মত শব্দ হতেই, তিনি আবার কোলে তুলে নিতে গেলেন। ছেলে নিশ্চল যেন পাষাণ। ছেলেকে তাই তুলতে না পারায়, তখন চন্দ্রমণি কেঁদে বললেন, কি হল! ছেলেকে তুলতে পারছি না।

ধনী কামারণী মন্ত্র পড়ে ঝেড়ে দিতেই, ছেলে হাল্‌কা সহজ যেমনকে তেমন হয়ে গেল।

শিশু যখন পাঁচ মাসের তখন মশারির ভেতর চন্দ্রমণি দেখলেন, শিশুর বদলে দীর্ঘকায় মানুষ শুয়ে আছেন সেখানে। চন্দ্রমণি হঠাৎ তাই দেখে, তাঁর স্বামী ক্ষুদিরামকে ডেকে দেখাতে গিয়ে দেখলেন, ছেলে আপন মনে হাত পা নেড়ে খেলা করছে। ঘটনাটা দেখে, ক্ষুদিরাম গম্ভীর হয়ে বললেন, এ কথা কাউকে বোল না! গয়াধামে গিয়ে ক্ষুদিরাম সত্যি সত্যিই এখন গদাধরকে পেয়েছেন। তাই মুখে ভাত দেবার সময় নাম রাখলেন গদাধর—আদরের নাম গদাই। গদাধর বা গদাই এই নামেই শিশু সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করলেন, এই সময় থেকেই। এই রহস্যপূর্ণ অলৌকিক তাঁদের ছোট ছেলেটি যে সাধারণ নয়—তা তাঁরা বেশ বুঝতেও পারলেন কিন্তু এ কথা আর কেউ জানলেন না।

শিশু গদাধরের বস্ত্রের পরিবর্তে ডোর-কৌপীন গ্রহণ—

চন্দ্রমণি মাঝে মাঝে ছোট ছেলেটিকে ধুতি কাপড় পরিয়ে দিতেন। একদিন তাঁকে একটি নতুন ধুতি পরিয়ে দেবার কিছু পরেই তিনি কিন্তু কাপড়খানি ফালি ফালি ছিঁড়ে তার এক ফালি নিয়ে ডোর-কৌপীন করে পরেছেন। গদাধরকে তাঁর মা চন্দ্রমণি জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কি করেছিস ?" শিশু গদাধর তাঁর মাকে উত্তরে বললেন, "অতিথি সেজেছি।" লাহাবাবুদের অতিথিশালায় যে সমস্ত অতিথি আসেন, তিনি এখন তাঁদের মত অতিথি সেজেছেন।

এই কথায় চন্দ্রমণি বিস্মিত হয়ে বললেন, "তাঁরা তো সন্ন্যাসী।" নতুন কাপড় ছিঁড়ে তার এক ফালি নিয়েই সন্তুষ্ট—মায়ের মন দুঃখে হুহু করে,তাই তিনি বললেন, "এই সন্ন্যাসীর বেশই তুই পছন্দ করলি ?"

মায়ের এই কথা শুনে, গদাধর কিছু না বলে, শুধু হাসতে থাকেন।

শিশুজীবনেই গদাধরের প্রথম ভাবাবেশ—

গদাধরের শিশুজীবনেই প্রথম ভাবাবেশ হয়। এই ভাবাবেশের কথা, তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিজের মনে, ঠিক যেমন আর যে ভাষায় বলেছিলেন, এখানে তাই উদ্ধৃত হল—"সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে। আমার তখন ছয় কি সাত বৎসর বয়স। একদিন সকাল বেলায় টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আল-পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও মুড়ি খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেল্‌লে, এমন সময় এক ঝাঁক্ দুধের মত সাদা বক ঐ কালমেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে এক রকম বাহার হল। দেখতে দেখতে অপূর্ব্ব ভাবে তন্ময় হয়ে, এমন অবস্থা হল, যে আর হুঁশ রইল না—পড়ে গেলাম। মুড়িগুলি ছড়িয়ে গেল আলের ধারে। কতক্ষণ যে ঐভাবে পড়েছিলাম বলতে পারিনে। লোক দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম বেহুঁশ হয়ে যাই।"

ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণি ছেলের এই রকম ভাব দেখে, খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন আর ভেবেছিলেন, গদাইয়ের উপর কোন উপদেবতা ভর করেছেন কি মূর্চ্ছাযোগে ?

গদাধর কিন্তু তাঁর পিতামাতাকে বারবার বলেছিলেন—যে সে সংজ্ঞাহীন হয়নি ; ঐ সময় তার মন প্রাণ অপূর্ব্ব আনন্দে আপ্লুত হয়ে, এক অভিনব ভাবে লীন হবার ফলেই এরূপ অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তবু তাঁরা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ওষুধপত্র যথেষ্ট করেছিলেন।

গদাধরের পিতৃবিয়োগ, বৈরাগ্য ও দ্বিতীয় ভাবাবেশ—

প্রথম ভাবাবেশের প্রায় দেড় বছর পরে, গদাধর হারালেন তাঁর প্রেমময় পিতা ও জ্ঞানময় গুরুকে। কামারপুকুরের দরিদ্র সুখী আনন্দময় চাটুজ্যে-পরিবারে ক্ষুদিরামের অকালমৃত্যুতে এক ভীষণ শোকের ঝড়ে সকলকে হতবুদ্ধি করে দিলে। গদাধরের মনের মাঝে বুদ্ধের মত তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হল। তাঁর রঙ্গ-রস, নাচ-গান ডুবে গেল কোন এক সীমাহীন ভাব-সমুদ্রের অতল তলে। তিনি ঐ বয়সে সাধারণের অগম্য, নির্জ্জন আর অনির্দ্দিষ্ট এখানে সেখানে, ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু পাছে তাঁর মনের এই অবস্থা অন্য কেউ বুঝতে পারে তাই বাইরে খুব সতর্ক হলেন। মায়ের কাছে কাছে থেকে, ঘরের নানা কাজকর্ম্মে নিত্যই সাহায্য করতে লাগলেন।

এই সময় থেকেই তাঁর সাধুসঙ্গ আরো বেড়ে গেল। আর এই সময়েই কামারপুকুর গ্রামের প্রসন্নময়ী ও আরো কয়েকজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে গদাধর ৺বিশালক্ষীর মন্দিরে যাবার সময় সকলের অনুরোধে দেবী-মহিমা গান করতে করতে, ভাবাবেশে জ্ঞানহারা হলেন। কিন্তু জনহীন প্রান্তে কোন উপায় খুঁজে না পাওয়ায়, স্ত্রীলোকেরা দেবীর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে, সকলে দেবীর গান গাইতেই, গদাধরের মুখে দিব্যহাস্যচ্ছটা ফুটে উঠল। তিনি সুস্থ হলেন।

গদাধরের উপনয়ন—

চন্দ্রমণি ও রামকুমার গদাধরের নয় বছর উত্তীর্ণ হতে চলেছে দেখে, তাঁরা দরিদ্র হলেও, যাতে সাত্ত্বিকভাবে গদাধরের উপনয়ন হয়, সেই রকম ব্যবস্থা চালাচ্ছেন—উপনয়নের দিনস্থিরও হয়ে গেছে। একে একে সমস্ত রকমেরই আয়োজন তাঁরা করছেন।

উপনয়নে মহা সমস্যা ও শেষে গদাধরেরই জয়লাভ—

ধনী কামারণী বালবিধবা ও নিঃসন্তান—গদাধর ঢেঁকিশালায় ভূমিষ্ঠ হলে, ধনী প্রসূতিকে সময়োচিত সাহায্য করে পরে আর শিশুকে না দেখতে পেয়ে, সে তাড়াতাড়ি এধার ওধার খুঁজে, হঠাৎ ধানসিদ্ধ করা উনানের ছাইয়ের মধ্য থেকে, চুপচাপ শান্ত ও মহাদেবের মত ভস্মমাখা গদাধরকে সকলের প্রথমে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তাই পরে, এই গদাধর বা গদাইয়ের মুখে মা-মা বলে ডাক না শুনলে, আর গদাইকে কিছু লুকিয়ে না খাওয়াতে পারলে, যেন ধনীর দিন চলে না। একদিন তাই ধনী গদাধরকে জলভরা চোখে বলেছিল, উপনয়নের সময় যেন সে তার কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা নেয় ও মা বলে ডাকে। তার এই কথায় গদাধর সম্মতি দিয়েছিলেন। ধনী তাই গদাধরের ভিক্ষা-মা হবার আশায় একটি একটি করে পয়সাও জমিয়েছে। উপনয়নের সময় এই প্রতিশ্রুতির কথা, গদাধর রামকুমারকে জানাতে, তিনি বললেন, ধনীর জন্ম নীচকুলে, তাই তার ভিক্ষা-মা হওয়া কোনমতেই চলে না।

পিতা ক্ষুদিরাম সদাচারী, অশূদ্রযাজী, ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর সমস্ত কথা জেনেও, গদাধর জেদ করতে লাগলেন আর বললেন, তিনি কথা দিয়ে যদি কথা না রাখেন, তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী হতে হবে। “সত্যভ্রষ্ট মিথ্যাচারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞসূত্র ধারণের কখনো অধিকারী হতে পারে না।” সামান্য ন' বছরের বালকের কাছে এই কথা শুনে, ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির পণ্ডিত রামকুমার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শেষে পিতৃসুহৃদ ধর্মদাস লাহার মধ্যস্থতায়, ‘সত্যই’ জয়লাভ করল—গদাধর জয়ী হলেন।

যেমন পিতা তেমনি পুত্র—

পিতা ক্ষুদিরাম যেমন সত্যবাদী ছিলেন, তাঁর পুত্র গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণও ঠিক তেমনি সত্যবাদী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি দিক, এই সত্যের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। তিনি বলতেন, "সত্য কথাই কলির তপস্যা।"

তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য এই চারিটির মধ্যে কলিকালের জন্য 'সত্যই' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই সত্য পালনে মহা তাপস ক্ষুদিরাম অদ্ভুত শক্তির অধিকারী ছিলেন। আর তাই তিনি সাক্ষাতে ও স্বপ্নে অলৌকিক ঘটনা ও দেব-দেবীর দর্শন ও তাঁদের আদেশ শ্রবণ করেছেন। যেমন তিনি একদিন একটা বিশেষ কাজ থেকে ফেরার সময়, বিশ্রামের জন্যে এক গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে, গা-হেলিয়ে দিতে, যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন তা জানেন না। তাই তিনি ঘুমিয়েই দেখছেন, তাঁর আরাধ্য নবলকিশোর শ্যাম এসে, কাছেই ক্ষেতের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে খুব মিষ্টি করে বললেন, "ওখানে বড় অযত্নে পড়ে আছি। তুমি আমায় বাড়ী নিয়ে চল। তোমার সেবা, যত্ন পেতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে।" তাড়াতাড়ি উঠে তিনি স্বপ্নে দেখা স্থানে গিয়ে দেখেন, সুন্দর শালগ্রাম শিলার মাথার ওপর এক বিষধর সাপ ফণা বিস্তার করে আছে। আরো কাছে যেতেই সাপটি অদৃশ্য হয়ে গেল। ভক্তিতে গদগদ হয়ে ক্ষুদিরাম "জয় রাম" বলে শিলাটি তুলে নিয়ে লক্ষণ দেখে বুঝলেন, ইনি রঘুবীর শিলা। মহা আনন্দে তিনি ঘরে তাঁকে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা ও পূজা করলেন।

ভোরে সাজি নিয়ে ক্ষুদিরাম যখন পূজার ফুল তুলতেন, তখন সেই সময় তাঁকে রক্তবস্ত্র পরে বালিকার বেশে তাঁর আরাধ্যা দেবী শীতলা এসে, ফুল তুলে দিয়ে, প্রায় রোজই সাহায্য করতেন। এই রকম দিব্য-দর্শন তাঁর সহজলভ্য ছিল।

ক্ষুদিরামের কন্যা কাত্যায়নী তার শ্বশুরবাড়ীতে অসুস্থ। তাই সেখানে ক্ষুদিরাম গিয়ে কন্যার হাবভাব দেখে বুঝলেন ভূতাবেশ। ধ্যানস্থ হয়ে সমস্ত বুঝে নিলেন। তারপর বললেন, তুমি ভূত-প্রেত-

দানব যেই হও, আমার মেয়েকে অকারণ কষ্ট দিচ্ছ কেন? অবিলম্বে এ শরীর ছেড়ে চলে যাও। তখন কাত্যায়ণীর মুখেই প্রেত আত্মা বললে, "আমি বড় কষ্টে আছি। আপনি যদি গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করেন, তা হলে আমি আপনার কন্যাকে ছেড়ে দেব।" ক্ষুদিরাম তার উত্তরে বললেন, "তার প্রমাণ কি?" তখন প্রেত কেঁদে বললে—"তার প্রমাণ নিশ্চয় পাবেন। এই সামনের নিমগাছটির বড় ডালটি ভেঙ্গে দিয়ে যাব।"

ক্ষুদিরাম গয়ায় পিণ্ডদান করলে, একদিন হঠাৎ দুপুরে এখানের সেই নিমগাছের বড় ডালটি মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ল আর কাত্যায়ণীও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। অবশ্য জীব-দুঃখ-মোচনের জন্যে গয়াধামে ক্ষুদিরাম গিয়েছিলেন। কিন্তু এর পেছনে দৈব-ইঙ্গিত ছিল—তখন তা কেউ জানত না আর বুঝতেও পারেনি।

ক্ষুদিরাম সেখানে একমাস থেকে পিতৃকার্যাদি সমাপন করে পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, পূর্বপুরুষদের ঋণ সমস্ত শোধ করে পরম তৃপ্তি পেলেন। একটা গুরুভার যেন নেমে গেল। রাতে তিনি শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন, দেব-স্বপ্নে তিনি দেখলেন—শ্রীমন্দিরে বিষ্ণুপাদপদ্মে তিনি পিণ্ড দিচ্ছেন। আর জ্যোতির্ম্ময় দেহে পিতৃপুরুষগণ আনন্দে সেই পিণ্ড গ্রহণ করছেন। ক্ষুদিরাম এই স্বপ্ন দেখে, আনন্দে আত্মহারা হলেন।

পরেই আবার তিনি দেখছেন, স্নিগ্ধ জ্যোতিতে মন্দিরের চারিধার আলোয় আলো। সোনার সিংহাসনে দিব্যকান্তি দেবতার জ্যোতির্ম্ময় আনন্দঘন মূর্ত্তিকে সূক্ষ্মদেহীগণ করজোড়ে স্তব করছেন। সেই পরমপুরুষ স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখে, ইঙ্গিতে ক্ষুদিরামকে ডাক্‌লেন।

আনন্দে ক্ষুদিরামকে কাঁদতে দেখে, সেই দিব্যপুরুষ খুব মধুর স্বরে বললেন, "তোমার পুত্র হয়ে জন্মাব।" এই সমস্ত যে ঘটনা তা কোন্ শক্তির অধিকারে ক্ষুদিরামের ঘটেছিল, তা বিচার করে দেখলে মনে হয়, তিনি দেবতার পরম ভক্ত ও সত্যবাদী

ছিলেন আর কখন এই সত্যভ্রষ্ট হয়ে তার অবমাননা এক দিনও করেন নি।

ক্ষুদিরামের সহধর্ম্মিণী চন্দ্রমণি অত্যন্ত সরলা ছিলেন এবং তাঁর স্বামীর মত সত্য কথা বলতেন। তাই যুগীদের শিবমন্দিরের শিবঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ থেকে চন্দ্রমণির শরীরে জ্যোতি প্রবেশ করার পর থেকে নানা দেবদেবী দর্শন, স্বপ্নে-জাগরণে যেন নিত্য ঘটনা, অশরীরিগণ তাঁর সঙ্গে ফিরতেন, তিনি শুনতেন দৈববাণী, নূপুরের মধুর ধ্বনি। আঘ্রাণে পেতেন অতি মধুর গন্ধ যা চারিদিক ভরে যেত। একদিন চন্দ্রমণি এক অলৌকিক ঘটনা দর্শন করলেন—তিনি দেখলেন, এক হংসারূঢ় দেবতা, সূর্যতাপে মুখখানি তাঁর রাঙ্গা হয়ে গেছে। তাই সকলের প্রতি যেমন তাঁর মায়া বাৎসল্য ভাব ছিল, এখন তা আরো বেড়েছে আর তেমনি বেড়েছে হঠাৎ অলৌকিক দর্শন। তাই চন্দ্রমণির মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠায়, স্নেহভরে দেবতাকে বললেন, "ওরে বাছা হাঁসে চড়া ঠাকুর, রোদে তোর মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে। ঘরে আমানি পান্তাভাত আছে তাই দুটি খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'।" তাঁর এই স্নেহপূর্ণ কথা শুনে ঠাকুরটি মিষ্টি হেসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা, চন্দ্রমণি সর্ব্বদাই চোখে সহজ অবস্থায় দেখতেন। আর তিনি সমস্ত কথা তাঁর স্বামীকে একটুও গোপন না করে যা সত্য তা বলতেন। ক্ষুদিরাম স্ত্রীকে গয়ার স্বপ্নের কথা বলে বলতেন, শ্রীভগবান পুত্ররূপে আসছেন। তাই তাঁরা দুজনেই মনে মনে অবাক্ হলেও, সেই শুভদিনের অপেক্ষায় আনন্দে অধীর হয়ে উঠতেন।

পঞ্চবটীতলায় ধ্যানমগ্ন গদাধরের দেহভূত দুই মূর্ত্তির যুদ্ধ—

গদাধর দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছেন, ঠিক এই সময় তাঁর দেহ থেকে জটাজুটধারী কাল নেশাখোরের মত চোখ দুটি লাল, যেন দেখলেই ভয় হয়, এমনই বিশ্রী তার ভয় পাওয়ার মত কদাকার চেহারা নিয়ে, যেই টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে এল, অমনি তারপরই তার পিছু পিছু বেরিয়ে এল আর একজন, হাতে তাঁর

ত্রিশূল, গেরুয়া-পরা প্রশান্ত মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি আগের ঘোর দর্শনকে নিপাত করলেন।

পঞ্চবটীতলায় হনুমান ও এক অপরূপা সুন্দরীর আবির্ভাব—

আর একদিন পঞ্চবটীতলায় গদাধর হনুমান সেজে নিজেকে রামের দাস মনে করে চুপচাপ বসে আছেন। তখন এই ভাবাবেশ অবস্থায় তিনি দেখলেন, চারিধার আলো করে এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী সুন্দরী, বেদনা, করুণা আর ক্ষমায় ভরা মুখখানি নিয়ে আস্তে আস্তে উত্তর হতে দক্ষিণে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। গদাধর তাড়াতাড়ি এই সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে মা তুমি?

সুন্দরী কোন উত্তর না করে চুপ করে রইলেন। একটা হনুমান উপ্ করে এই অপূর্ব্ব সুন্দরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। গদাধর তাঁর প্রশ্নের উত্তর না পেয়েই যেই সুন্দরীকে প্রণাম করতে গেলেন, তখন কী আশ্চর্য্য! সেই সুন্দরী গদাধরের দেহেই মিলিয়ে গেলেন। তখন একটু আগে সেইখানে একটা হনুমান কোথা থেকে এসে, হঠাৎ কেন লাফিয়ে পড়েছিল, তা ধরা পড়ল। গদাধর বুঝলেন, সুন্দরী আর কেউ নয়, জনক-নন্দিনী শ্রীরামের অর্দ্ধাঙ্গিনী। সুন্দর বস্ত্রে সু-সজ্জিতা হয়ে হাতে ডায়মণ্ড কাটা বালা পরে সীতাদেবী।

দক্ষিণেশ্বরে বাক্-সিদ্ধ হলধারী ও গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ—

দক্ষিণেশ্বরে এলেন রামতারক চাটুজ্যে। ইনি গদাধরের আপন খুড়তুত দাদা—পরম বৈষ্ণব। ভাগবত, গীতা, বেদান্ত আর আধ্যাত্ম রামায়ণ তাঁর মুখস্থ। তিনি এখানে এসেছেন—একটা চাকরী চান।

মথুরবাবু হলধারীকে চাকরী দিলেন। গদাধর মন্দিরে কালীপূজা করেন না, তাই তাঁকে কালীপূজা করতে বললেন। তিনি এই কথায় প্রথমে একটু দ্বিধা বোধ করে, শেষে সমস্তই এক, এই জ্ঞানে মায়ের পূজা করতে রাজী হলেন। রামতারককে গদাধর বলতেন, হলধারী। এই হলধারী ছিলেন বাক্সিদ্ধ। তাই তিনি যাকে যা বলেন, তাই ফলে যায়। মায়ের পূজারী বৈষ্ণব হলধারী বলি বন্ধ করার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু বহুকালের প্রথা বলে সেই প্রস্তাব গ্রাহ্য

হল না। হলধারী ক্ষুণ্ণ হল। মায়ের পূজায় আর প্রাণঢালা আনন্দ যেন খুঁজে পেলেন না।

হলধারী একদিন সন্ধ্যা করছেন, এমন সময় তিনি দেখলেন, মা ভবতারিণী ক্রুদ্ধ প্রচণ্ডিকা মূর্ত্তি ধরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি বললেন, "তোকে আর আমার পূজা করতে হবে না। এমনি আধা-খেঁচ্ড়া পূজা যদি করিস, তো ছেলের মরা মুখ দেখবি।" হলধারী এ তাঁর চোখের ভুল মনে করে তা গ্রাহ্য করলেন না। কিছুদিন পরই তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেলেন।

হলধারী গদাধরের শরণাপন্ন হলেন ও গদাধরের কথামত রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে এলেন। হৃদয় যেমন মায়ের পূজা করত, তেমনি পূজা করতে লাগলেন।

হলধারীর পরকীয়া প্রেম-সাধনা—

রাধাগোবিন্দজীর পূজা করতে করতে, হলধারী গোপনে পরকীয়া-প্রেম সাধনে প্রবৃত্ত হলেন। বৈষ্ণবমতে এও একটা সাধন পথ, কিন্তু এই সাধনার পথ অপকৃষ্ট—তাই অনেকে ঘরে বাইরে অনেক কথা বলতে লাগলেন। অথচ তাঁকে মুখের ওপর কেউ কিছু বলতে সাহস করলেন না।

সকলেই তাঁকে ভয় করতেন, কারণ মুখ তাঁর বড় খারাপ। কথায় কথায় রেগে গিয়ে শাপ দেন আর তাই ভীষণ ফলে। গদাধর এ বরদাস্ত করতে না পেরে, হলধারীকে কড়্কে দিলেন। এই কথা শুনে হলধারী রেগে গিয়ে বললেন, "তুই আমার ছোট ভাই হয়ে আমায় শাসন করতে এসেছিস। মুখ দিয়ে তোর রক্ত উঠবে।"

গদাধর বললেন, "আপনার ভালর জন্যে বলছি। পাঁচজনে কানাকানি করছে তাই। আপনি আমার ওপর মিছামিছি চটেছেন।"

হলধারী চুপ করে রইলেন, কথা ফিরিয়ে নিলেন না। যা বলেছেন তা বলেছেন। তাই কিছুদিন পরে সত্যি গদাধরের মুখে রক্ত উঠল। শিম্পাতার রসের মত মিশ-কাল রক্ত। কিছুতেই এই রক্ত ঠাকুর মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে দিয়েও চাপতে পারছেন না।

এই খবর পেয়ে সকলে এসেছে। শশব্যস্ত হয়ে হলধারীও এলেন। গদাধর হলধারীকে দেখে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বললেন, "দেখ দাদা শাপ দিয়ে তুমি আমার কি করেছ।"

হলধারীও তখন কাঁদতে লাগলেন, তাঁর অব্যর্থ কথার জন্যে। প্রাচীন এক সাধু এসেছিলেন, তিনি গদাধরকে বললেন, "তুমি হঠযোগ কর?"

গদাধর তাঁর কথার উত্তরে বললেন "হাঁ করি।"

সাধু বললেন, "তবে ভয় নেই! সাধনায় সুষুম্নার দ্বার খুলে গেছে। মার ইচ্ছায় তুমি বেঁচে গেলে।"

হলধারী পরে হৃদয়কে বললেন, কাপড় ফেলে, পৈতা ফেলে সাধনা করা এটা কি ঠিক হচ্ছে?

হৃদয় তাঁকে ভয় করত, তাই বললে, কখন না।

হলধারী বললেন, বাধা দিবি, যেন ওসব অনাচার না করে। গদাধর হলধারীর চেয়ে ছোট আর তাঁর মতে ও ভাষায় একেবারে 'আকাট মূর্খ।' তবুও গদাধরের দিব্য ভাবাবেশ ও পূজা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এইভাবেই চলছিল, কিন্তু এর একদিন শেষ হল। কে বড়, কে ছোট, কার মত ঠিক, কার পথ বে-ঠিক, এরও মীমাংসা হয়ে গেল। হলধারীর হঠাৎ ছেলে মারা যাবার পর থেকে কালীকে তমোময়ী বলে মনে করতেন।

একদিন তিনি গদাধরকে বললেন, "তুই তমোময়ীর পূজা করিস কেন? ওতে আধ্যাত্মিক উন্নতি না হয়ে, অধোগামী হবে।"

গদাধর সোজাসুজি মাকে জিজ্ঞাসা করে, "মা তুই কি? তুই না বুঝিয়ে দিলে, তুই যে কে, তা আমি মূর্খ হয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হলধরকে তর্ক করে কি বোঝাব?" মা বললেন, "আমি ত্রিগুণাতীত আবার সর্বগুণাশ্রয়ী। আমি সমস্ত গুণের অতীত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি শূন্য।"

হলধর পূজা করছিল, গদাধর ছুটে গিয়ে তার ঘাড়ে চেপে বসল। মুখে সে বললে, "মা আমার শুদ্ধসত্ত্বময়ী—সর্ববর্ণময়ী আবার তিনি ত্রিগুণাতীতা। মাকে তামসী বলিস, শাস্ত্র তুই এতটুকুও জানিস না।"

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল, তার মনে হল এ গদাধর নয় সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব। পূজার ফুল, বেলপাতা তাই হলধর হঠাৎ গদাধরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বসল।

হৃদয় হলধারীকে বললে, "কি মামা—গদাধর পাগল হয়েছে, এই কথাই তো তুমি বলতে—এখন ?"

হলধর হৃদয়ের কথায় বিহ্বলের মত বললে, "কি জানি হৃদু, বুঝি আমিই পাগল হয়ে গেলাম! আমি তার মাঝে স্পষ্ট ঈশ্বর দর্শন করলুম।"

হলধরের স্বীকারোক্তি, গদাধর অবতার—

গদাধর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখলেন, আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। কর্ম্ম গদাধরের ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। গদাধর এই দেখে ছুটে গিয়ে হলধারীকে সমস্ত বলায়, তিনি বললেন, "একে গলিত হস্ত বলে।" ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণ থাকে না।

হলধর স্বীকার করলেন, গদাধরের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে আর সে নিজে গদাধরের মাঝে ঈশ্বরকে দেখেছে। গদাধর মানুষ নয়—মানুষরূপে তাঁরই অংশ মহাপুরুষ—অবতার। গদাধর নিশ্চয়ই জানতেন, যে তাঁর জ্যেষ্ঠ রামতারক, স্বভাবে ও কাজে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের মত। মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ বা গদাধর তাই রামতারককে বলতেন, হলধারী।

সারদামণিকে গদাধরের পত্নীরূপে নির্দ্দেশ—

গদাধরের বিয়ের জন্যে যখন কনে খোঁজাখুঁজি চলছে, তখন গদাই বললে, মিছে হয়রাণ হচ্ছ কেন—আমার কনে সারদামণি, জয়রাম-বাটীতে কুটবাঁধা হয়ে আছে। বিয়ের অনেক আগে শিওড়ে হৃদয়দের বাড়ীতে গান হচ্ছে। যেমন ছোট থেকে বড় পর্যন্ত মেয়ে পুরুষ গান শুনতে এসেছে, তেমনি গদাধরও এখানে গান শুনতে এসেছেন।

সারদামণি স্বয়ংবরা—

হৃদয়দের বাড়ীতে গান শুনতে অনেক লোক এসেছেন তার মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের কোলে তিন চার বছরের এক খুকী। মেয়েটি

ড্যাব্ ড্যাবে চোখে, সভার দিকে চেয়ে আছে। তাই স্ত্রীলোকটি একটু রঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলে, "বিয়ে করবি ?" কোলের মেয়ে ঘাড় নেড়ে তার সম্মতি জানালে। তারপর এত লোকের ভেতর সে স্বয়ংবর সভার মত এই গানের সভায় পতি নির্ব্বাচন করে, তার ছোট হাত তুলে গদাধরকে দেখিয়ে দিলে।

যে স্ত্রীলোকটি মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন, তিনি মেয়েটির মা। জয়রামবাটীতে রাম মুখুজ্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে, নাম শ্যামাসুন্দরী—আর কোলের মেয়েটির নাম সারদা।

শ্যামাসুন্দরীর অলৌকিক ঘটনা দর্শন—

একদিন শ্যামাসুন্দরী অসুস্থ অবস্থায় বে-ঠাহর হয়ে একলা পুকুর ধারে এক বেলতলায় গিয়ে বসে পড়েছে। গাঁয়ের কুমোরদের পোয়ান যেখানে হাঁড়ি-কুঁড়ি তৈরী করে পোড়ায়, ঠিক সেইখান থেকে ঝুনুঝুনু করে ছোট পায়ের নূপুর বেজে উঠল। আর দেখতে দেখতে একটি ছোট মেয়ে নাচতে নাচতে ছুটে এল। তারপর সে শ্যামাসুন্দরীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর তখনই তাঁর মনে হল যে, মেয়েটি যেন তাঁর পেটে ঢুকছে।

এই অলৌকিক ঘটনা দেখে শ্যামাসুন্দরীর মাথা ঘুরে গেল। তিনি মাটির ওপর পড়ে গেলেন।

রামচন্দ্রের স্বপ্ন—

একদিন দুপুরবেলায় রামচন্দ্র ঘুমচ্ছে, এই সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন, একটি ছোট্টো মেয়ে পিঠের ওপর পড়ে দুহাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলে। আহা! যেমন তার রূপ তেমনি তার গায়ে হাতে গহনা রয়েছে। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কে মা তুমি ? এখানে কি করতে এলে ?" মেয়েটি বললে, "এই এলুম তোমার কাছে।"

সারদামণির আবির্ভাব—

গদাধরের জন্মের প্রায় আঠার বছর পরে, শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে হল। নাম রাখলেন তাঁর সারদা। অন্ধকার আকাশে যেন দেখা গেল একখানি সোনার মত উজ্জ্বল চন্দ্রমা। সারদা এই মোহমায়া-

ঘেরা নানা বিষয়-বাসনায় পূর্ণ সংসারে শশীকলার মত একটু একটু করে বড় হতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে কেউ জানত না, তাই কেউ চিনতেও পারে নি, যে ইনি কে—জন্মের আগে শুধু তাঁর পিতাকেই তিনি স্বপ্নে জানিয়েছিলেন, "এলুম তোমার কাছে।" মা শ্যামাসুন্দরীর পেটে এক অলৌকিক দর্শন দিয়ে আসার পর তিনি এসেছেন একথা শুধু তাঁর পিতামাতাই জানত আর,একটি প্রাণীও জানত না।

গদাধর ও সারদা—

ঠাকুর গদাধর কিন্তু এই মেয়েটিকে চিনেছিলেন, তাই তাঁকে বলেছিলেন, ও সারদা ও সরস্বতী! সকলকেও বলেছিলেন, সারদা সরস্বতী জগতের অজ্ঞানী নরনারীকে জ্ঞান দিতে এসেছেন।

এই সারদামণিকে গদাধর বিয়ে করেন।

এখন এই প্রশ্ন সকলের মনে আসে, যিনি সাধু, যিনি অবতার তিনি বিয়ে করলেন কেন?

ঠাকুর নিজেই এই প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাঁর বিয়ে হল কেন? স্ত্রী কিসের জন্য? সত্যি কথা যে, যাঁর পরার কাপড়ের পর্যন্ত ঠিক নেই, তাঁর আবার বিয়ে কেন? আর তাঁর স্ত্রীই বা কেন?

এই সমস্ত প্রশ্নের তিনি নিজেই উত্তর দিলেন।

তিনি বলেছিলেন, ব্রাহ্মণের শরীরে দশ রকম সংস্কার আছে। বিয়ে তার মধ্যে একটা। শুকদেবেরও এই সংস্কারের জন্য বিয়ে হয়েছিল। দশ রকম সংস্কার হলে তবে আচার্য হয়। সমস্ত ঘর ঘুরে এলে ঘুঁটি তবে চিকে ওঠে।

বিয়ে করে অথচ ভোগ না করে, বিয়ের কত বড় আদর্শ হতে পারে, তাই সংসারকে দেখালেন। তিনি দেখালেন, পুরুষ হতেই শক্তিরূপিণী মহামায়ার সৃষ্টি। তাই যে পুরুষ সেই প্রকৃতি—পুরুষ ও প্রকৃতি এক।

সেই পরমপুরুষ স্বামী হয়ে স্ত্রীকে ভোগাসনে বসালেন না, বসালেন যোগাসনে। রতির পৃথিবীতে মূর্তিমতী বিরতিকে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করলেন। ঠাকুর নারীকে অর্পণ করলেন নারীর যে সবচেয়ে বৃহত্তম মহিমা, সেই মহিমায়।

মথুর বলেন, এই তো আমি চেয়েছিলুম—

হাজার টাকা দিয়ে মথুরবাবু খুব ভাল শাল কিনে এনে আদর করে গদাধরের গায়ে পরিয়ে দিলেন। গদাধর ঠিক শিশুর মত আনন্দ করে সকলকে বলতে লাগলেন, ওরে শুনেছিস হাজার টাকা দাম!

পরক্ষণেই মনে হল এতে ছাগলের লোম ছাড়া আর তো কিছুই নেই। ঈশ্বরের স্পর্শও পাওয়া যাবে না। এই শালেতে বিকার বাড়বে বরং, মনে হবে আমি মস্ত এলেমবাজ। আমি একজন কেষ্ট বিষ্টু কেউ।

তাই তিনি হঠাৎ শালখানি মাটির ওপর ফেলে দিয়ে ওতে থুথু ফেলে, ধূলোয় ফেলে পায়ে মাড়িয়ে তবুও ক্ষান্ত হন নাই। আগুনে পুড়িয়ে ফেলব এই জঞ্জাল বলায় কে একজন ছুটে এসে শালখানিকে উদ্ধার করে। এই কথা শুনে মথুরবাবু বললেন, বেশ করেছেন, ঠিক করেছেন এই তো আমি চেয়েছিলুম!

সোনার থাল, রূপার বাটি—

মথুর জানবাজারের বাড়ীতে ঠাকুরকে এনে সোনার থালে ভাত খেতে দিলেন। রূপার বাটিতে ব্যঞ্জন দিলেন। তারপর সেই থালা-বাটি ঠিক মাজা-ঘষা হল কিনা, ভাঙ্গা-ফুট হল কিনা, চোরে চুরি করে নিয়ে গেল কিনা, এত হাঙ্গামা পোহাল, কিন্তু যে খেয়ে গেল তার কাছে সমস্তই ভোজবাজীর মত অসার। থালা-বাটির দিকে নজরও নেই আর শেষে বাসনের যে কি হল তারও ভাবনা নেই। যতকিছু গরজ মথুরবাবুর।

ভৃগুমুনির পদাঘাত—

মথুরবাবুদের কুলপুরোহিত গদাধরের প্রাধান্য দেখে হিংসেয় ভাবল, কোথাকার কে এক বিদেশী এসে কি কৌশলে বাবুকে বশীভূত করে ফেললে। তার এত প্রতাপ কিসের?

আর ওকে আস্কারা দেওয়া ঠিক নয়, একটা হেস্ত-নেস্ত করতে হবে। এই ভেবে সে বাইরের ঘরে গিয়ে দেখলে গদাধর বেহুঁশ হয়ে বসে আছে।

তখন গদাধর-বিদ্বেষী চন্দ্র হালদার তাঁকে ঠেলা মারতে লাগল "ও বামনা, বল না সত্যি করে, কি করে বাবুকে বশ করেছিস?" কিন্তু তার কথায় গদাধর কোন উত্তর না করায়, সে বললে, "উঃ ফুটুনি হয়েছে।" এই কথা চন্দ্র হালদার বলে, একবার নয় তিন বার সে ঠাকুরকে লাথি মারলে।

ঠাকুর গদাধর চোখ মেললেন না বা কিছু বললেনও না, ভৃগুমুনির পদাঘাত নারায়ণ বুক পেতে সহ্য করেছিলেন। আর মানুষ্যরূপী গদাধর আবার সেই ব্রাহ্মণের পদাঘাত সহ্য করলেন, কিছুই বললেন না—কাউকে কিছু জানালেনও না। মথুরবাবু এই কথা শুনলে চন্দ্র হালদারকে আর আস্ত রাখতেন না।

যে সয় সেই রয়—

ঠাকুর হৃদয়কে বলতেন, তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করব। যেমন—যাকে রাখো সেই রাখে। তেমনি যে সয় সেই রয়। এখানেতেও ঠাকুর দেখিয়েছেন, বিষ্ণু সত্যগুণান্বিত। তাই ব্রাহ্মণের হয়ে তাকে সত্যগুণান্বিত হতে হবে, ভৃগুমুনির পদাঘাত সহ্য করতে হবে, বশিষ্ঠের মত সমস্ত দুঃখকে বরণ করে নিয়ে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিতেই হবে। যে ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের কাজ করে না, সে নামে ব্রাহ্মণ, কিন্তু ক্ষমতায় বা পরিচয়ে ঠিক ব্রাহ্মণ নয়। চন্দ্র হালদার যে কাজ করেছিলেন তা ব্রাহ্মণের কাজ নয়, তাই উপদেশে ঠাকুর হৃদয়কে বলেছে সহ্য করতে। সহ্যতেই শান্তি, অসহ্যে অশান্তি, তাই যে সয়—সেই রয়, এই দেখা যায়।

মথুরমোহন—চন্দ্রমণি ও এক আনার দোক্তা পাতা—

একদিন মথুরবাবু চন্দ্রমণিকে খুব ধরে বসলেন ও বললেন, ঠাকুরমা তোমায় আমার কাছ থেকে কিছু নিতে হবে, না নিলে হবে না—নিতেই হবে যা তোমার ইচ্ছে হয়।

চন্দ্রমণি মথুরবাবুর এই কথা শুনে বললেন, যে তাঁর তো কিছু অভাব নেই। যা দরকার হয় সমস্তই তিনি পেয়ে থাকেন, তবে আর কি চেয়ে নেবেন।

কিছুই দরকার নেই তাঁর। কিন্তু মথুরবাবুর সেই এক কথা, কিছু নিতেই হবে।

চন্দ্রমণি বললেন, কিছু প্রয়োজন নেই—তিনি কি চাইবেন।

মথুরবাবুর সেই এক কথা, আমার কাছ থেকে কিছু নাও।

চন্দ্রমণি ভাবতে লাগলেন, তিনি কি চাইবেন। তাই অনেক ভেবে শেষে বললেন, যদি দাও তো তাহলে তুমি আমাকে চার পয়সার দোক্তা পাতা কিনে দাও।

এই কথা শুনে মথুরবাবু অবাক্ হয়ে গেলেন।

হাজার টাকার শাল গদাধরের কাছে কিছু নয়। মাত্র চার পয়সার দোক্তাই চন্দ্রমণির কাছে যথেষ্ট। এমন মা না হলে তাঁর গর্ভে কি আর গদাধরের মত সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

ছোট ছেলের মত মাতৃ-আজ্ঞা পালনকারী গদাধর ভক্তের চোখে ভগবান—

এখন ক্রমশঃ জনসাধারণের সন্দেহ দূরে সরে যেতে লাগল। পাপীরা পুণ্যের আলো পেল। পুণ্যবান যাঁরা তাঁরা ঠাকুরকে চিনতে পারলেন। ভক্তেরা নিজেদের ধন্য মনে করলেন। তাঁরা নিজেদের ধন্য মনে করে, দলে দলে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। তাঁকে ঈশ্বরের অংশ জ্ঞানে প্রচার করতে লাগলেন। পূজা করতে লাগলেন প্রাণ ভরে। লোকে তাঁকে বলতে লাগল অবতার! ঠাকুর কিন্তু নিজের ভাবে বিভোর। কারো কথায় তিনি কান দেন না। নিজেকে বড় বলে মনে করেন না। কেবল মা মা করেন। তাই নিজে যখন ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায় বুঝতে পারেন না, তখন সেই সমস্ত কিছুর জন্য মায়ের কাছে যান ও তাঁকে ছোট ছেলের মত এক এক করে বলেন, তাঁর আদেশ চান। সর্ব্ব-কল্যাণময়ী শুদ্ধ-সনাতনী মা, তিনি যা বলেন সমস্ত শুনে, ঠিক তখন সেই মতই কাজ ঠাকুর করেন।

বকুলতলার ঘাটে, নৌকা করে, ভৈরবী এসে নামলেন।

তারপর গদাধরের কাছে এসে, তাঁকে তন্ত্রমতে সাধনা করতে

বললেন। ভৈরবীর কথা শুনে ঠাকুর মাকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা গো বামনি তন্ত্রমতে সাধনা করতে বলছেন, করব ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, "করবি বৈকি, সম্পূর্ণরূপে করবি !"

ঠাকুর মায়ের কথা মত কঠিন তন্ত্র সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করলেন।

জটাজূটধারী উলঙ্গ নাগা-সন্ন্যাসী তোতাপুরী—

তারপর একদিন এক জটাজুটধারী নাগা-সন্ন্যাসী দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাস্নান করে উঠে এলেন।

গদাধর যে সন্ন্যাসীকে এই মাত্র দেখে এখানে চলে এসেছেন, এই তো সেই জটাজূটধারী উলঙ্গ নাগা-সন্ন্যাসী! ইনি সাত শ' নাগা-সন্ন্যাসীর প্রধান—তেজঃপুঞ্জ কলেবর।

গদাধর ও তোতাপুরী—

তোতাপুরী সন্ন্যাসী গদাধরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "এই তো যোগ্য লোক পাওয়া গেছে।" তারপর তিনি গদাধরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু সাধন-ভজন করবে ?"

গদাধর বললেন, "আমি কি জানি।"

সন্ন্যাসী এই কথায় বললেন, "তবে কে জানে ?"

গদাধর বললেন, "আমার মা জানেন।"

সন্ন্যাসী তখন কে তাঁর মা জিজ্ঞাসা করায়, গদাধর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "ঐ পাষাণময়ী আমার মা!" সন্ন্যাসী এই কথা শুনে গদাধরকে বললেন, "ঈশ্বর এক, দেব-দেবী সমস্ত ভুল। তুমি বেদান্ত সাধন করে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ কর !"

সন্ন্যাসী কিন্তু বুঝলেন, গদাধর তার মায়ের আদেশ ছাড়া কোন বিদ্যাই লাভ করবে না। তাই তখন বললেন, "বেশ তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে, দীক্ষার ব্যবস্থা কর। আমি তিনদিনের বেশী চশু থাকি না।"

অভাব ধর অনেকক্ষণ তাঁকে ভাল করে দেখে, জিজ্ঞাসা করলেন, আর ষি কি তোতাপুরী ?"

সন্ন্যাসী বললেন, "কি আশ্চর্য! তুমি জানলে কি করে? পাঞ্জাবে লুধিয়ানায় আমার মঠ ছিল। চল্লিশ বছর ধরে সেখানে সাধনা করেছি। তারপর ব্রহ্মজ্ঞ হবার পর তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছি। গঙ্গাসাগর আর শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে, মাত্র তিনদিনের জন্যে এই দক্ষিণেশ্বরে এসেছি। আমার নামই তোতাপুরী। আমি বেদান্তবাদী। নিরাকার ব্রহ্মসাধনা করে থাকি।"

ভৈরবী যখন গদাধরকে তন্ত্রসাধনা করতে বলে, তখনও তিনি যেমন বলেছিলেন, এখনও তেমনি ভবতারিণীর দুয়ারে এসে বললেন, "মা, তোতাপুরী বলছে নিরাকার সাধনা করতে, করব?"

মার আদেশ হল, "করবে বৈকি! তোমাকে শেখাবার জন্যেই সে এসেছে।"

ভৈরবী কিন্তু বারণ করে তাঁকে বলেন, "ন্যাংটার কাছে যেও না, তোমার সমস্ত ভাবটাব ও নষ্ট করে দিয়ে, শুক্‌ন দড়ি বানিয়ে ছাড়বে।"

গদাধর বললেন, "বানাক্ না। এসেছি তো ভাবরাজ্যের চরম সীমাতে। এইবার ভাবাতীত অদ্বৈতভূমিটা একবারবেড়িয়ে আসি।" ঈশ্বর লাভ করতে হলে, সাকার নিরাকার দুই লাগে। কেউ সাকার থেকে নিরাকারে আসে। কেউ নিরাকার থেকে সাকারে। তা ছাড়া মা যখন আদেশ করেছেন, তখন দীক্ষা নেবই। এই স্থির করে গদাধর তোতাপুরীর কাছে এসে বললেন, "আমায় চেলা করুন।"

তোতাপুরী এগার মাস থেকে, গদাধরকে বেদান্ত সাধনা শিক্ষা দিলেন। গদাধর বেদান্তে জ্ঞান লাভ করলেন, সন্তুষ্ট হয়ে তিনি উপাধি দিলেন—পরমহংস।

গদাধরের নতুন জন্ম—নতুন নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ, পদবী পরমহংস। তোতাপুরীর উপর করুণাময়ীর অপার করুণা! কিন্তু তবুও জগদম্বাকে সে মানে না।

বোধ হয় তাই এখন মহামায়া ভাবলেন, আমার আসল অবস্থাটা কী তা ওকে একবার বুঝিয়ে দিই।

দৈবীমায়া—

তোতাপুরীর লোহার মত শরীরে হঠাৎ রোগ দেখা দিল। রক্ত আমাশায়, শেষে পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গায় ডুবে প্রাণ দিতে গেলেন। ব্রহ্মা এখন পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়েছেন। তাই এখন মহামায়ার কৃপা না হলে কে তাঁকে রক্ষা করবে?

তোতাপুরী ডুবে মরার জন্যে ক্রমশঃ যতই এগোয়, জলও ততোই কমে যায়। তাই এখন তোতাপুরীর ডুব্-জল না থাকায়, তিনি অসহায়ের মত চিৎকার করে উঠলেন—"এ ক্যা দৈবী মায়া!"

তোতাপুরীর চিৎস্বরূপিণী পরমানন্দময়ীকে দর্শন—

নিরাকার ব্রহ্মবিদ্যার মহাসাধক তোতাপুরীর ভুল ভেঙ্গে গেল। অদ্বৈত ব্রহ্মকে তিনি দেখলেন, মায়ারূপিণী শক্তিরূপে। মায়ের এই বিরাট 'বিশ্বব্যাপ্ত রূপ দেখে, তোতা অবাক্ হয়ে, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলায় ফিরে এসে, ধুনীর ধারে বসে, যতবারই চোখ বুজে ধ্যান করেন, ততবারই তিনি দেখেন, চিৎস্বরূপিণী পরমানন্দময়ী সেই মাকে।

তোতাপুরী ও উল্লসিত গদাধর—

তারপর দিন রামকৃষ্ণ দেখলেন, তোতার রোগ সেরে গেছে। তোতাপুরী এইবার স্বীকার করলেন আর তাই রামকৃষ্ণকে বললেন, "কাল তোমার মাকে দেখেছি। দেখ্‌লাম, যে ব্রহ্ম, সেই শক্তি।" কথাগুলি বলতে বলতে তোতার মুখ জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল।

তাই শুনে রামকৃষ্ণ উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, "তখন না বলেছিলে আমার কথা ভুল।" রামকৃষ্ণ মহা সুখী। তিনি তোতাকে আবার বললেন, "আমার মাকে তুমি না দেখে কেমন করে এখান থেকে যাবে? যোগে বসে দেখলে তো আমার মহাযোগিনী মাকে।"

তোতাপুরীর ছুটি প্রার্থনা ও অন্তর্ধ্যান—

তোতা রামকৃষ্ণকে বললেন, "এবার তোমার মাকে বলে আমায় ছুটি পাইয়ে দাও।"

রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, "তুমি বলো মাকে।" তোতা

ভবতারিণীর মন্দিরে এসে, মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করলেন।

দয়াময়ী ব্রহ্মময়ী মা তোতার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। তিনি তখনি তাঁকে যাবার অনুমতি দিলেন।

রামকৃষ্ণকে এইবার তোতাপুরী বিদায় জানিয়ে, কালীবাড়ী ছেড়ে কোন্ দিকে চলে গেলেন—ঠিক যেন ভোজবাজীর মতো, তা কেউ বুঝতে পারলেন না।

মা ও ছেলে আর ভক্ত ও ভগবান—

মায়ের কাছে তার সন্তান ছুটে আসে, তার অভিযোগ, দুঃখকষ্ট, সুখ, শান্তি যার যা কামনা, তাই সে জানায়। মা তাঁর সন্তানকে ভরসা দেন। তার কথা শুনে, সদিচ্ছা ও কামনা পূর্ণ করেন। ভক্তের দল ভগবানকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চায় কিন্তু তাঁকে ধরতে গেলে যে ভক্তি দরকার, তা কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকা চাই।

সন্তান মাকে যদি ঠিক ডাকার মত ডাকে, তবে তিনি তার ডাক্ শোনেন। ভক্ত ঠিক যদি তাঁকে চায়, তবে তিনি তাকে নিশ্চয়ই ধরা দেন।

দক্ষিণেশ্বরে মায়ের কাছে তাই এত ভিড় জমেছে। এত লোক আসা যাওয়া সরু করেছে।

অনেক উঁচু দরের সাধু-সন্ন্যাসীও আসছে। তীর্থ যাবার পথে দক্ষিণেশ্বরের মাকে আর ভক্ত-সন্তান গদাধরকে দেখা যাচ্ছে।

দক্ষিণেশ্বরে এক অদ্ভুত সাধু—

একদিন এক সাধু দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এসে হাজির হল। এই অদ্ভুত সাধুর একটা ঘটি আর পুঁথি আছে। সেই পুঁথি সে পড়ে আর তাকে ফুল দিয়ে পূজা করে।

গদাধর দেখতে চাইলে পুঁথিতে কি আছে।

গদাধরের বিশেষ অনুরোধে সে দেখালে ঐ পুঁথির প্রতি পাতায় শুধু ওঁ রামনাম লেখা, আর কিছু নয়।

গদাধর ও রামলাল—

আগত এই নূতন সাধুর নাম জটাধারী। ইনি বৈষ্ণবদের রামায়েৎ সম্প্রদায়ের লোক। গদাধরের তন্ত্রসিদ্ধি হবার পর ১২৭১ সালে সে তার সঙ্গে অষ্টধাতুর রামচন্দ্রের বিগ্রহ নিয়ে, ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছে। এটি রামচন্দ্রের বালকমূর্ত্তি। বিগ্রহের নাম রামলাল। সাধু জটাধারী ভিক্ষে করে এনে রেঁধে-বেড়ে রামলালকে খাওয়ায় আর নিজে খায়। রামলাল তার কাছে খায়, হাত বাড়িয়ে এটা ওটা আব্দার করে।

গদাধর প্রত্যক্ষ করলেন, রামলালমূর্ত্তি মানুষের মত হাত বাড়িয়ে খায় কিন্তু মূর্ত্তি মানুষের নয়, রামগোপালের। রামগোপাল এইবার গদাধরের পিছু নিলে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে তার সঙ্গে ঘুরতে লাগল। জটাধারী তাকে খেতে যাবার জন্যে বললেও আর খায় না। মায়ের কাছে ছোট ছেলে যেমন তার সঙ্গে সঙ্গে ওঠে বসে, খায় দায়, বায়না করে, ঘুরে বেড়ায়, তেমনি রয়েছে দেখে, জটাধারী গদাধরকে বললেন, "আমি এখন চললুম।"

গদাধর বললেন, "তোমার রামলালের কি হবে ?"

জটাধারী বললেন, "ও যেতে চায় না, তাই ওকে তোমার কাছেই রেখে যাব।"

এই কথা শুনে গদাধর আনন্দে উছ্‌লে উঠল। এতদিন রঘুবীরকে গদাধর আরাধনা করেছে এখন জটাধারী তাঁকে গোপাল মূর্ত্তিতে দীক্ষা দিয়ে, দেখিয়ে দিলে তার বালকমূর্ত্তি। গদাধর ভৈরবীকে বললেন, মধুর ভাব সাধনার এই তো আসল তাৎপর্য্য। রাম শুধু দশরথের ছেলে নয়, তিনি সজীব দেহে প্রকাশিত। তিনি আনন্দদায়ক, তিনি মধুর, তিনি অসীম অনন্ত, তিনি সরস, তিনি সুন্দর।

তীর্থস্থান দক্ষিণেশ্বর—

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির আজ সাধু, সন্ন্যাসী, মানী, গুণী, রাজা, মহা-রাজা, ছোট-বড়র তীর্থস্থান। এইখানেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করে

সিদ্ধি লাভ করেন। নিজে জাগ্‌লেন—জাগালেন, মা ভবতারিণীকে। মহাতীর্থ কালীঘাটের মত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরকেও তীর্থস্থান রূপে দেশ থেকে দেশান্তরের লোক জেনে গেল। মন্দিরে মাকে দেখতে কত সাধু, কত মহাপুরুষ, ছুটে এলেন। এসে মাকে প্রণাম করে দেখলেন, মায়ের আদুরে ছেলে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করলেন। ভক্ত আর ভগবানের লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর ধন্য হয়েছে। সত্যই কাশীর বিশ্বেশ্বরী ভবতারিণীরূপে প্রকাশিত হয়ে, ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেছেন। তাই গায়ক ও মহাসাধক রামপ্রসাদের গান আবার রামকৃষ্ণও তাঁর আবেগ-ভরা প্রাণ-মাতানো মধুর কণ্ঠে গেয়েছিলেন—

"গয়া, গঙ্গা, বারানসী,
কাশী, কাঞ্চি, কেবা চায় ?"

সকলে দলে দলে আসে, ক্রমে ভিড় বাড়তে থাকে তীর্থস্থান দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণি ও মথুর বিশ্বাস—

এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির স্থাপনা যিনি করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন রাণী রাসমণি, জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী—জাতিতে কৈবর্ত্তের মেয়ে।

কৈবর্ত্তের মেয়ে হলেও, ছোট বয়স থেকেই তিনি রামের উপাসিকা ছিলেন। বোধ হয় রামের দয়ায়, গরীবের মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে, জমিদার রাজচন্দ্র তাঁকে বিয়ে করে রাণী করলেন। রাসমণির চারটি কন্যা। চারটি কন্যার ভিতর তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীর স্বামী যিনি, তিনিই আমাদের সেজবাবু আর তাঁরই নাম মথুরমোহন বিশ্বাস।

বিয়ের অল্প কাল পরে করুণাময়ী মারা যায়। রাণী রাসমণি তখন তাঁর চতুর্থ কন্যা জগদম্বার সঙ্গে মথুরমোহনের বিয়ে দেন।

লক্ষ্মী রাসমণি হলেন রুদ্র চামুণ্ডা—

মথুরবাবু এখন রাণী রাসমণির ছোট মেয়েকে বিয়ে করে, ছোট জামাই হলেন—কিন্তু তাঁর আগের সেই ডাকনাম সেজবাবুই থেকে

গেল। রাণী রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র গত হবার পর একদিন সৈন্য-ব্যারাকের মাতাল সৈন্য ঢুকে পড়ে লুঠতরাজ সুরু করলো—সেই সময় আত্মীয়-পুরুষেরা কেউ নেই। তাদের রুখ্‌তে গিয়ে, দারোয়ানেরা ঘায়েল হয়েছে। তাই রাণী রাসমণি এখন কি করবেন? কোন উপায় আর না দেখে, লক্ষ্মী ছিলেন রাসমণি, অস্ত্র ধরলেন—হাতে পূজার খাঁড়া নিয়ে হয়ে দাঁড়ালেন—রুদ্রচণ্ডী চামুণ্ডা।

ঠিক এই সময় মথুরমোহন ও অন্য আরো অনেকে এসে পড়ায়, গোরারা পালিয়ে গেল। সকলে অবাক্ হয়ে গেল রাসমণির মূর্ত্তি দেখে।

মহাশক্তির পদাশ্রিতা রাণী রাসমণি—

গোরাদের এই হঠাৎ আক্রমণের পর রাণী রাসমণি বুঝলেন, শক্তি চাই—তাই তিনি মহাশক্তির পদাশ্রিতা হলেন।

রাণী রাসমণি কৈবর্ত্তের মেয়ে কিন্তু আসলে ইনি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখীর এক সখী। তিনি বৈষ্ণবী হয়েও এখন শক্তির সাহায্য নিলেন—কৃষ্ণকালী এক হয়ে গেল। মানুষের ধর্ম্মমত ও সাধনপথ অনেক কিন্তু একটি মত ও একটি পথ না ধরলে, সে বিপথগামী হয়ে, কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে বিভ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে, শুধুই দুঃখ পাবে। তাই রাণী রাসমণির এখন কৃষ্ণকালী এক হয়ে গেছে। সংসারে তিনি কিছুই চান না। তিনি চান শুধু সেই মহাযোগেশ্বরী মহাকালীর রাঙ্গা পা দুখানি। একমাত্র রাসমণির কামনা মায়ের রাঙ্গা চরণ, তাই শুধু তিনি সকল সময় বারবার প্রার্থনা করেন।

রাণী রাসমণির কাশীধামে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথকে দর্শন ইচ্ছা—

এখন রাসমণির ইচ্ছা হল, কাশীতে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথকে দর্শন করে আসবেন। তিনি তাই নৌকায় করে অনেক টাকা, জিনিস-পত্র, দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে চললেন সেই কাশী।

রাণী রাসমণির কাশী যাত্রা ও স্বপ্নাদেশ—

রাণীর নৌকার সঙ্গে প্রায় আরো একশ'খানি নৌকার বহর চলেছে। রাত হয়েছে, রাণী রাসমণি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের কাছে এসে রাণী স্বপ্ন দেখলেন, দেবী ভবতারিণী এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, "কাশী যাবার দরকার নেই।" এই ভাগীরথীব পাশেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর! আমাকে অন্ন ভোগ দে।" রাণী রাসমণি ধড়্‌ফড়িয়ে উঠে বসে বললেন, "আর কাশী যাবার দরকার নেই। কাশীশ্বরী স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন।"

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠায় রাণী রাসমণি—

রাণী রাসমণি ধড়্‌ফাড়য়ে উঠে স্বপ্নে মায়ের যে আদেশ হয়েছিল, সেই মত দক্ষিণেশ্বরে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই কয় জাতির জমির মালিকের, পর পর মিলন-ক্ষেত্র, এক লপ্তে ষাট বিঘা জমি কিনে মন্দির নির্ম্মাণ করলেন। স্থাপনা করলেন রাধাগোবিন্দ, দ্বাদশ শিব আর মা ভবতারিণীকে।

মন্দির তৈরী হতে প্রায় দশ বছর সময় লাগল। আর এই দশ বছর রাণী রাসমণি ব্রতধারিণী হয়ে কঠোর নিয়মে, সংযমে ছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেছেন, খেয়েছেন হবিষ্যান্ন, শুয়েছেন শুধু শুকনো মেঝের ওপর আর জপ করেছেন সেই কৃপাময়ীর নাম অবিরাম।

এই অনুষ্ঠান কি রাণী রাসমণির বৃথা হয়েছিল? না-না তা হয়নি, তা হয়নি—তাই তো তিনি পেলেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা ভবতারিণীকে, ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে।

কৈবর্ত্তের মেয়ে রাণী রাসমণির অন্নভোগ দেবার অধিকার নেই। তাই তিনি সোয়া দু'লাখ টাকায় দিনাজপুর জেলার শানবাড়ী পরগণা কিনে মার সেবায় দান করলেন। মা অন্নভোগ চেয়েছেন। এখন তিনি কি করেন, তাই ভাবতে লাগলেন। সকলেই বললে, কৈবর্ত্তের মেয়ে অন্নভোগ দিতে পারে না, সে অধিকার তার নেই। রাসমণি এই কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন।

পণ্ডিত রামকুমারের নব-বিধান ও ভ্রাতা গদাধর সহ দক্ষিণেশ্বরে আগমন—

রামকুমারের টোল থেকে হঠাৎ খবর এলো যে যদি তিনি সমস্ত কিছু ব্রাহ্মণকে দান করতে পারেন, তা হলে অন্নভোগ চলতে পারে।

এই কথা শুনে রাসমণি গুরুর নামে সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করলেন। কিন্তু তবুও কেউ পূজার ভার নিতে চাইলেন না। তাই শেষে রামকুমার নিজে এলেন। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাঁর সকলের ছোটভাই গদাধরকে।

অন্ন ভোগের ব্যবস্থা এবং দক্ষিণেশ্বরে বহু সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্তের আগমন—

রামকুমার ও গদাধর আসার পর, দক্ষিণেশ্বরে কত সাধক এলেন মা ভবতারিণীর কাছে প্রাণভরে পূজা করতে ছুট রাঙ্গা চরণ আর দেখতে তাঁর আদুরে ছেলে ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে। ভাববার কথা যে, একদিন যাঁরা নিষেধ করেছিল আর সাবধান করেছিল রাসমণিকে মায়ের অন্নভোগ দেওয়া চলবে না বলে, এখন তাঁরাই এসে মায়ের প্রসাদ সেই অন্নভোগ পেয়ে, নিজেদের ধন্য মনে করলেন। রাণী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠার পর রামকুমার আর গদাধর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে সমস্ত দ্বিধা ও শাস্ত্রের কঠিন বাঁধাধরা নিয়ম ঘুচিয়ে দিলেন। রাসমণি ধন্য হলেন আর ধন্য হল ভক্ত জনসাধারণ।

দেব-সম্পত্তি দানপত্র—

আঠারো শো একষট্টি সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারী রাসমণি দেবতার নামে যে সম্পত্তি কিনেছিলেন, তাই দানপত্র করে দিলেন। ছোট মেয়ে জগদম্বা সই দিলে তার কোন দাবী দাওয়া নেই বলে, তবে বড় মেয়ে পদ্মমণি সই দিলে না। রাসমণি তাই মেয়ের এই ব্যবহারে বড় অশান্তি ভোগ করছিলেন আর তাই মাকে বারবারই জানাচ্ছিলেন, পদ্মমণি সই দিলে না—মাগো! তোর মনে কি আছে তা তুই জানিস।

অসুস্থ ও অশান্ত রাণী রাসমণিকে জগৎমাতার সান্ত্বনা—

অসুস্থ অবস্থায় রাণী রাসমণি দানপত্র করলেন।

দানপত্রের পরের দিন কালীঘাটের বাড়ী থেকে তাঁকে সকলে গঙ্গার ধারে নিয়ে আসার পর, রাসমণি সেখানে অনেকগুলি আলো

জ্বলছিল দেখে, তাই হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন, "সরিয়ে দে—নিভিয়ে দে সব রোশনাই! অন্ধকার করে দে, এখন আমার মা এসেছেন, তাঁর অঙ্গের আলোয় দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।"

রাত্রি দ্বিতীয় যাম।

রাণী রাসমণি আকুল হয়ে বললেন, "মা এসেছিস। কিন্তু শেষ কথাটা তোকে বলি, পদ্ম যে সই দিলে না।"

মা হাসলেন। তারপর হেসেই বললেন, "তোর তাতে কি। হয় তো মাম্‌লা মোকদ্দমায় দৌহিত্ররা দেবোত্তর সম্পত্তি তছ্‌নছ্‌ করে ফেলবে। কিন্তু তার জন্যেও তোর ভাবনা কেন? যা থাকবার নয় তা যাক্‌ না। তুই থাকবি আর তোর গদাধর থাকবে।"

মানুষের চোখে অন্তর্যামী গদাধর উন্মাদ—ভক্তের চোখে ভগবান—

রাণী রাসমণি গদাধরের কোন দোষ দেখতেন না। তাঁর জামাই মথুরমোহনও গদাধরের কোন্‌ দোষ দেখতেন না। গদাধর কিন্তু নিজে তাঁর খেয়াল মত কাজ করে চলতেন, তাই তিনি বললেন, "এ আবার কি হল। একদিন রাসমণিকে চড় মেরেছিলুম—আজ আবার বরানগর ঘাটে ঠাট্‌ করে জয় মুখুজ্যে জপ করছিল—কিন্তু তার মন অন্যদিকে থাকায়, তাকেও তুই চড় মেরে বসেছি।"

হলধারী তাঁর কথা শুনে বললেন, "উন্মাদ তুই।" হলধারী যদিও এই কথা শুনে তাঁকে উন্মাদ বললেন কিন্তু রাসমণি গদাধরের চড় খেয়ে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। মথুরবাবু গদাধরকে হাজার টাকার শাল কিনে দিয়েছিলেন। এত টাকা দামের শাল কিন্তু গদাধর নষ্ট করেছিলেন আর তা অসার বস্তু ভেবে তাকে পায়ে করে পিষে, পরে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে, জঞ্জাল দূর করতে যাচ্ছিলেন। তাই শুনেই মথুরবাবু বলেছিলেন, "এইতো চেয়েছিলুম।" তিনি বলেননি তো, ও উন্মাদ হয়েছে, ওকে শাস্তি দাও, ও হাজার টাকার শাল নষ্ট করেছে।" রাসমণির মত মথুরবাবুও ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়েছিলেন, বুঝেছিলেন, গদাধর মানুষ নয়; তিনি অবতার!

মথুরমোহন ও গদাধরের তীর্থযাত্রা—

মথুরমোহন গদাধরকে নিয়ে তীর্থ করতে গেলেন—সঙ্গে তাঁর অনেক লোক। তীর্থযাত্রীরা প্রথম বৈদ্যনাথধামে নামল।

সেখানে একটা গ্রাম পেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ রামকৃষ্ণ দেখলেন, সেই গ্রামবাসীদের পরনে কাপড় নেই, মাথায় তেলও নেই। তাই তিনি তখুনি আবেগভরে বললেন, "কোন্ বৈদ্যনাথকে দেখতে চলেছি—সে কত দূরে। তোরা বৈদ্যনাথকে চিনবি না। এই অনাথের নাথকে দেখে নাও।" এইবার মথুরকে তিনি বললেন, "এদের মাথায় তেল, পরনে একখানা কাপড় আর একদিন পেটপুরে খাইয়ে দাও।" তাঁর কথা শুনে মথুরবাবু প্রথমে গাঁইগুঁই করে বললেন, "তীর্থে অনেক খরচ, এদের এই সমস্ত করলে, টানাটানি পড়ে যাবে, সামলাতে পারব না।"

গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—

মথুরমোহনের কথা শুনে গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ রেগে গিয়ে বললেন, "তুই তোর দলবল নিয়ে যা, আমি এদের কাছেই থাকব, কিছুতেই এদের ছাড়ব না।" তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে মথুরবাবু কলকাতা থেকে কাপড় আনিয়ে স্থানীয় বাজার থেকে পাঁঠা কিনে একদিন মহাপ্রসাদের ভোগ লাগিয়ে দিলেন।

কাশীধামকে স্বর্ণময়ী ও তৈলঙ্গস্বামীকে বিশ্বনাথ-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন—

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীতে এসে, ভাবনেত্রে প্রথমে দেখলেন, স্বর্ণময়ী এই কাশীধাম। কিন্তু পরে তিনি হৃদয়কে বললেন, "ওরে সেখানেও যে আমগাছ তেঁতুলগাছ বাঁশঝাড় এখানেও তেমনি। তবে কি দেখতে এলুম রে! সেখানেও মা এখানেও তাই।" কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ তৈলঙ্গস্বামীকে দেখলেন, স্বয়ং বিশ্বনাথ কাশীধাম উজ্জ্বল করে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তৈলঙ্গস্বামীকে স্বপাক পায়স প্রদান ও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর—

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে পায়স রেঁধে তৈলঙ্গস্বামীকে খাইয়ে

এলেন। তখন তৈলঙ্গস্বামী মৌনাবলম্বন করে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "ঈশ্বর এক না বহু ?"

তৈলঙ্গস্বামী ইশারায় বললেন, "সমাধিতে যদি দেখ, এক। জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখলে, বহু।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ওরে আমার কৃষ্ণ কই—

কাশী থেকে প্রয়াগ, তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানেও ভাবাবেশ হতে লাগল। রাখালরা গরু নিয়ে বাড়ী ফিরছে, তাই দেখে অমনি তিনি তাদের পিছু পিছু ছুটলেন "কৃষ্ণ কই—ওরে আমার কৃষ্ণ কই!" তিনি সেখান থেকে আসতে আর চান না। তাঁর এই রকম দেখে, হৃদয় তাঁকে ধম্‌কায় আর মথুরবাবু তো তাঁকে কিছু বলতে পারে না, তাই তিনি মহাভাবনায় পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, দক্ষিণেশ্বর কি দক্ষিণাবিহীন হয়ে যাবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণের মনস্থির, মাতা স্বর্গ হতে বড়—

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর মাতাঠাকুরাণী চন্দ্রমণিকে প্রত্যহ সকালে দেখতে আসতেন ও দেখাশোনা করে খবরাখবর নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন "মা তুমি কেমন আছ ?" তাই মাতৃভক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ পরে ব্যাখ্যা করে ভাবে গদগদ হয়ে বলেছিলেন, "মা কি কম জিনিষ! মা গুরু, মা ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, নিজে সর্ব্বদুঃখহরা। মা পরমা মায়া, পরমা ক্ষমা, পরমা শান্তি! মাকে ধ্যান করতে পারা যায়। মায়ের মত এমন ধ্যানের মূর্ত্তি আর কি আছে ? মা সকল তীর্থের উর্দ্ধে। মা স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী।" চৈতন্যদেব মায়ের অনুমতি পেয়ে তবে সংসার থেকে বেরিয়েছিলেন। নারদের মা যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি সংসার ত্যাগ করে যেতে পারেন নি। তাই বৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, মা চন্দ্রমণি কালীবাড়ীর নবতে একলাটি বসে আছেন রামকৃষ্ণের আসার আশা-পথ চেয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা ও স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিদিন মায়ের খোঁজ নেন। মাকে ভক্তি করেন, মায়ের প্রতি কর্ত্তব্য করেন, কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি কি কর্ত্তব্য করবেন, তাই যেন ভাববার কথা।

মা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, তিনি থাকেন নবতবাড়ীতে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের প্রতি এই কর্ত্তব্য পালনের সুযোগ পান। কিন্তু এখানে তাঁর স্ত্রী তো আসেন নি। তিনি আছেন তাঁর বাপের বাড়ী জয়রামবাটীতে। সে যে এই দক্ষিণেশ্বর থেকে অনেক দূরে। তাই কেমন করে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিদিন তাঁর খোঁজ নেবেন, কেমন করেই বা তাঁর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করবেন? এই কথাটাও তো তেমনি একটা ভাববার মত কথা।

এ জগত মায়াময়। মহামায়ার ইচ্ছায় সমস্তই সম্ভব হয়। মানুষ চলে, বলে, তাঁকে ডাকে, নিদ্রাও যায়। কিন্তু শত শত কাজ তার সুমুখে এসে পড়ে আর এই কাজ তখন তাকে সারতে হয়। কর্ত্তব্য কাজ সেরে তবেই তো মানুষ তাঁকে পায়। কিন্তু তবুও অনেক সময় আরো কত, শত শত সাধারণ মানুষ তাঁকে ধরতে গিয়েও ধরতে পারে না, প্রত্যহ এমনি কত শত কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে, নানা পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে।

সারদার স্বামীদর্শন ইচ্ছা—

জয়রামবাটীতে সারদামণির ইচ্ছে হয়েছে সে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর স্বামীর কাছে যাবে। সেই চার বছর আগে দেখা, এখন তাঁর আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে। ভরা যৌবনের ডাকে তাঁর হৃদয় আজ স্বামীর সঙ্গে তাঁরই জীবন-দেবতার সঙ্গে মিশতে চায়। কিন্তু এই কথা তার বাবার কানে উঠবে বলে, লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়—সত্যিই তার এই ইচ্ছাই করে আর সে তাই মনে মনে বার বার বলে, "ওগো তোমার কাছে যেতে চাই!" তার চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে কিন্তু মুখে কোন ভাষা নেই। মনে মনেই বলে, "তুমি আমায় রক্ষা করো!" সারদার এই ডাক ঠাকুরের কানে

পৌঁচেছে তাই সারদার বাবার মনে বোধ হয় কে যেন কি বললেন। রামচন্দ্র তাঁর মেয়ে সারদামণিকে তাই হঠাৎ ডেকে বললেন, "সমস্ত জিনিসপত্র গোছগাছ করে নাও।" সারদা তার বাবার এই কথা শুনে, অবাক্ হয়ে গেল ও কৃতজ্ঞ-করুণ চোখে চেয়ে রইল।

তারপর সারদা তার বাবার আদেশমত তাঁরই সঙ্গে শুধু স্বামীদর্শন নয় তীর্থদর্শনে যাত্রা করল। বেশী দূরপাল্লার পথ তো দূরের কথা, কোনদিন সারদা পথেও বেরোয়নি। কিন্তু তবু প্রাণে আনন্দ! তবু প্রাণে একটা আশা—যিনি তীর্থপতি তিনিই তীর্থপথিককে ঠিক নিজের কাছে টেনে নেবেন। এদিকে বিষ্ণুপুর ওদিকে তারকেশ্বর—রাস্তার খেই যেন হারিয়ে গেছে—সমস্ত যেন কি রকম ঝাঁ-ঝাঁ করছে। আহা! মুখখানি সারদার দারুণ রোদে ঝল্সে গেছে। তিনি প্রকৃতির এই দারুণ বাধাকে একটুও গ্রাহ্য না করে, তাঁর কমল-কোমল পা ফেলে, তবু আরো—তবু আরও এগিয়ে যাচ্ছেন। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রামচন্দ্র বুঝলেন, তার খুব কষ্ট হচ্ছে। সারদার এই কষ্টে, সত্যি হু হু করে জ্বর এসে গেল। মেয়ে পথের মাঝে এলিয়ে পড়ল দেখে, রামচন্দ্র কি করবেন তাই ভাবতে লাগলেন। সহযাত্রীরা কেউ থামলে না, তারা সকলেই চলে গেল। রামচন্দ্র সারদাকে নিয়ে এক চটীতে উঠলেন। সারদা ভাবতে লাগল, বাবাকে কষ্ট দিয়ে নিজে অসুখে পড়লুম—আর তোমাকে দেখার দিনও আমার পিছিয়ে গেল!

কে এই কালো মেয়ে—

এখন সারদার জ্বরে প্রায় বেহুঁস অবস্থা।

তার পাশে কে একটি কালো অথচ আলো-করা রূপ নিয়ে মেয়ে এসে বসল। এমন রূপ সারদা স্বপ্নেও দেখেনি। মেয়েটি তার মমতা-মাখা বড় বড় টানা চোখ দুটি দিয়ে, কত ঠাণ্ডাভাবে চেয়ে, সারদার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর নরম হাতের স্পর্শে সারদার গায়ের তাপ যেন তিনি আস্তে আস্তে মুছে দিতে লাগলেন।

সারদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "কোথা থেকে আসছ?"

সে সারদার এই কথার উত্তরে বললে, "দক্ষিণেশ্বর থেকে।"

সারদা আশ্চর্য হয়ে গেল, মেয়েটি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছে শুনে বললে, "বলো কি? দক্ষিণেশ্বর থেকে?"

"আমিও ভেবেছিলুম দক্ষিণেশ্বরে যাব। রাস্তায় এই জ্বর!"

"আচ্ছা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখেছ?"

মেয়েটি বললে, "দেখেছি বৈ কি!"

সারদা এখন বললে, "অনেক আশা করে বেরিয়েছিলুম তাঁর সেবা করব বলে, জ্বর এসে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে।"

মেয়েটি বললে, "না না তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈ কি!"

সারদা ভাল হয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাবে, সেই মমতাময়ীর কাছে এই ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আমাদের কে হও গা?" মেয়েটি বললে, "আমি তোমার বোন।"

সারদা খুব আনন্দে বললে, "বাঃ বেশ তাই বুঝি এসেছ?"

এই সমস্ত কথা বলতে বলতে, কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালবেলা সারদা উঠে, এইজন্যে আশ্চর্য্য হল যে, বোনও নেই আর তাঁর জ্বরও নেই একটুও।

দক্ষিণেশ্বরে সারদা—

পথের শেষ হল! সারদা তাঁর বাবার সঙ্গে নৌকা করে রাত ন'টার সময় দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে পৌঁছল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে খুব আনন্দ করলেন। তারপরই দুঃখ করে বললেন, "এত দেরী করে এলে। আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। তোমায় আমি রাখি কোথায়? সেজবাবু তোমায় অট্টালিকায় রাখতেন। তাকে দেখতে পেলে না।" রাসমণির জামাই সেজবাবু অর্থাৎ ভক্ত মথুরমোহন এখন লোকান্তর গমন করেছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা সারদামণিকে দুঃখ করে বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে ডেকে সারদাকে মাদুর পেতে বসতে দিলেন, খাওয়ালেন, যত্ন করলেন। অনেক দূর থেকে এসেছে তাও আবার শরীর খারাপ শুনে, বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সারদা শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পাগল হয়ে গেছে, এখন তাঁর সেই ভুল ভেঙ্গে গেল। তাঁর সেখান থেকে যেতে ইচ্ছা না করলেও তিনি বললেন, মায়ের কাছে নবতবাড়ীতে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথায় বললেন, তুমি এখানে থাকবে, তা না হলে কে তোমায় দেখবে? ওষুধ পথ্য আমি না হলে, কে খাওয়াবে তোমায়? পরের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তার আনলেন। তিন চার দিন নিজে সেবা করে, সারদাকে ভাল করে দিয়ে বললেন, এইবার তুমি নবতবাড়ীতে মায়ের কাছে যাও। সারদার পিতা রামচন্দ্র এই দেখে, শান্তিতে ঘরে ফিরে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কামজয়—

সমস্তই মহামায়ার ইঙ্গিত। তাই রামকৃষ্ণের মনে পড়ল তোতাপুরী বলেছিলেন, "তুমি যে কামজয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্ত্রীকে দেশে রেখে, একলা এখানে বসে থেকে, কামজয়ের কথা বলা সোজা। স্ত্রীকে কাছে রেখে বলতে পার, তবে তো বুঝি?" এই তো পরীক্ষার সুযোগ এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে পাঠালেন, "সারদা আমার কাছে শোবে।" সারদার ভয় করতে লাগল কিন্তু শাশুড়ী বললেন, "যাও, ও যখন বলছে।" ঘরের মধ্যে একান্তে ডেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আমায় সংসার-পথে টেনে নিতে এসেছ?" ঘোমটা ঢাকা মুখে সারদা বললেন, "না তোমায় ইষ্টপথে সাহায্য করতে এখানে এসেছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে, অনেক ভাল ভাল উপদেশ দিলেন।

সারদা জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে আমি তোমার কে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি আমার বিদ্যা। তুমি সারদা, সরস্বতী। রূপ ঢেকে, বিদ্যার আলো জ্বালিয়ে, তুমি এসেছ জ্ঞান দিতে। তুমি জ্ঞানদাত্রী।"

সারদা অত শত বুঝলেন না। তিনি বললেন, "জ্ঞান বুঝি না

ভক্তি বুঝি, বুঝি সেবা।" সারদা তাই শ্রীরামকৃষ্ণের পা টিপতে বসলেন, পা টেপার পর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে প্রণাম করলেন।

সারদা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, "আমি তোমার দাসী।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। তিনিই সম্প্রতি নবতে, আবার তিনিই এখন আমার পদ সেবা করছেন। তুমি শুধু এই ঘরে নও—বিশ্বব্যাপিনী হয়ে আছ।"

ভাল করে দ্যাখ্, ও তোর কে হয়?—

শ্রীরামকৃষ্ণ বড় তক্তপোষটিতে বসে আছেন। এক সঙ্গে লাগানো ছোট খাটটিতে সারদা শুয়ে আছেন। তিনি লজ্জায় জড়সড় হয়ে, আগা গোড়া গা ঢেকে, শুধু পদ্মদলের মত পা দুটি অনাবৃত রেখে শুয়ে আছেন।

বসন্তকালের থমথমে মধ্য রাত। ঘরে খিল দেওয়া। এঘরে কেবল তাঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। মধুঋতু না এখন? দক্ষিণেশ্বরের বাগানে অনেক রংয়ের ফুল, তাদের রূপের ডালি সাজিয়ে, যেন মুখ টিপে হাসছে। অনেক সুগন্ধ ফুল ফুটে, আনন্দে তাদের সৌরভ চারিধারে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গঙ্গার ওপরের বাতাস মন্থর হয়ে এসেছে। প্রকৃতি যেন নিজেকে হারিয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে নি, ঘরের কোণে শুধু একটা প্রদীপ জ্বলছে।

এই আধো-আলো—আধো-অন্ধকারের মধ্যে একটি অমল ও অনুপম সৌন্দর্য্যময়ী, একটি অনাঘ্রাত, কুসুমের মত নিষ্পাপ মুখশ্রী ঘুমিয়ে আছে।

"দ্যাখ্, চোখ ভরে দেখছিস্? সত্যি সত্যি বল্ তো কী দেখছিস্? একটি স্বাস্থ্যে, সারল্যে, পবিত্রতায় পরিপূর্ণা, অস্পৃষ্ট, শ্রীরা, লাবণ্য উর্ম্মিলা স্রোতস্বতী, পূর্ণ-যৌবনা নারী। দিলেন, ‚কি সুন্দর—কি মধুর—তোর ও কে হয় বল দেখি? তাও আহয়। সংসার সৃষ্টির পক্ষে শাস্ত্রমতে যার সম্বন্ধে কোন নেই, নিবারণ নেই, এ সেই—এ সেই স্ত্রী, যাতে নতুন

করে নিজেকে জন্মগ্রহণ করানো যায়, এ সেই—এ সেই জায়া। এ সেই স্ত্রী, নিভৃত-শয্যায় এসে শুয়ে আছে।

সম্পূর্ণ এ তোর। এ তোর সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। ভাল করে চেয়ে ছ্যাখ্, সদ্‌প্রাণ করা এ সেই স্ত্রী, অপূর্ব্ব মুখশ্রী নিয়ে তোর কাছে নিজেকে ধরা দিয়ে, নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে আছে। দেখেছিস এই আনন্দকান্তি অপরূপা সুন্দরীকে ? হ্যাঁ, একেই বলে স্ত্রী শরীর।"

ও মন কি তুমি চাও ?—

শ্রীরামকৃষ্ণ মনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকে বলে এর চেয়ে ভোগ্য, এর চেয়ে উপাদেয়, পৃথিবীতে কিছু নেই আর তাই এখন তুই গ্রহণ করবি কি ?

তবে হ্যাঁ, ঐ দেহেই যদি আবদ্ধ হয়ে থাকিস তা হলে ঈশ্বরকে পাবি না। নারী না নারায়ণী কি চাস ? ভাল করে বিবেচনা করে ছ্যাখ্।" মন খুঁত খুঁত করে বলে, "কাম ভোগ করে কি কামের নিবৃত্তি হবে ? এ যতই আহুতি, ততই আকুতি ! রাজা যযাতি পুত্রের যৌবন নিয়ে কাম ভোগ করেও তার কামের উপশম হল না।"

মন মুখ ফেরায়, জেগে ওঠে বৈরাগ্য, বলে, "আমি ঈশ্বরানন্দ চাই।" "দেখিস্, পেটে মুখে এক হ'। ভাবের ঘরে চুরি করে মুখে বাহাদুরী মারবি আর পেটে খিদে থাকবে তা হবে না। হাতের নাগালের মধ্যেই আছে। যদি চাস সোজাসুজি টেনে নে, স্বচ্ছন্দে নিজের অধিকারে রয়েছে। লুকোচুরিতে লাভ নেই।"

তোতাপুরীর কাম-জয় পরীক্ষায়, ভৈরবীর অগ্নি-পরীক্ষোত্তীর্ণ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ—

মন উস্‌খুস্ করে উঠল, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদার অঙ্গ স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়ালেন।

একি ! তোতাপুরীর পরীক্ষার কাছে কি ভৈরবীর পরীক্ষা হার মানলে ?—

একি সেই রামকৃষ্ণ ! যে রামকৃষ্ণ ভৈরবীর কাছে তন্ত্র সাধনার অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ?

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চমুণ্ডির আসন ও ভৈরবীর অগ্নি-পরীক্ষা—

দক্ষিণেশ্বরের বাগানের উত্তর সীমায় বেলগাছ, তার নীচে বেদী তৈরী করে, সেই বেদীর তলায় তিনটি নরমুণ্ড পুঁতে বিকল্প আসন হল পঞ্চবটীতে। সেই বেদীর নীচে পঞ্চজীবের পঞ্চমুণ্ড। শেয়াল, সাপ, কুকুর, ষাঁড় আর মানুষ।

ভৈরবী-সাধনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—

ভৈরবী সমস্ত যোগাড় করে দিলে। গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণ এই উগ্র তপস্যা পার হয়ে শাস্ত্র সঙ্গত ফল লাভ করলেন। গুণে গুণে চৌষট্টিখানা তন্ত্র একের পর এক করে ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে শেখালেন। তারপর একদিন রাত্রে, কোথা থেকে এক অপরিচিতা স্ত্রীলোককে বাম্‌নী মানে ভৈরবী ধরে নিয়ে এলেন।

অপরিচিতা পূর্ণ-যৌবনা অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক। ভৈরবী এইবার তাঁকে বেদীর উপর বসিয়ে গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবী-বুদ্ধিতে পূজা করতে বললে। তিনি তাই করলেন।

ভৈরবী বললেন, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে এর কোলে বসে তদ্‌গত হয়ে জপ কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিউরে উঠলেন! রমণী দিগম্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আমি তোর দুর্ব্বল সন্তান, আমার এ দুঃসাহসের শক্তি কি আছে?"

ভৈরবী বললেন, "তুই আমার বীর সন্তান! তুই আমার কোলে বসবি না? ওখানেও তো আমিই! এ তো সহজ অবস্থা! এতে আবার দুঃসাহস কি?" অনন্ত দৈব বলে বলীয়ান হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নারীর কোলে বসেই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

ভৈরবী বললেন, "বাবা! পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছ!" তারপর শবের খপ্পরে মাছ রেঁধে ভৈরবী জগদম্বাকে অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণকে খেতে দিলেন। নিঘৃণ্য হয়ে তিনি তাই খেলেন।

এর পর অন্য একদিন কোথা থেকে গলিত নরমাংস যোগাড় করে এনে, দেবী-তর্পণ শেষে, ভৈরবী সেই নরমাংস শ্রীরামকৃষ্ণকে জিভে ঠেকাতে বলায় তিনি বললেন, "অসম্ভব এ আমি পারব না!"

ভৈরবী বললেন, "ঘেন্নার কি ? কোন ঘেন্না আনতে নেই। এই ছ্যাখ্ বলেই, একটুক্‌রো মাংস নিজের মুখে ফেলে চিবতে লাগলেন। এইবার তুমি খাও।" গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণের মাঝে এইবার এই কথায় এক উদ্দীপনা এসে গেল। তিনি মা-মা বলে, ভাবাবিষ্ট হতেই, ভৈরবী তাঁর মুখে তখনি মাংসের টুক্‌রা দিয়ে দিলেন।

ভয়, লজ্জা, ঘৃণা নেই—তিনি এখন ত্রিপাশমুক্ত।

শেষ তন্ত্র এখনও বাকি। এইবার শক্তির লীলা-বিলাস। শ্রীরামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্প হয়ে রইলেন। সমস্ত স্ত্রীকেই তিনি মাতৃ-ভাবে নিরীক্ষণ করছেন। এই মাতৃভাবই সাধনার শেষ কথা।

জগন্মাতার পরীক্ষা—

যা কল্পনাও করা যায় না, এই রকম ভয়াবহ সাধনায় যিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। আজ মা নিজে তাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করছেন—এ পরীক্ষা ভৈরবীর তন্ত্রসাধনার সেই পরীক্ষা নয়—শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী সারদাকে তিনি নিয়ে এসেছেন এখানে, এই দক্ষিণেশ্বরে। তিনি সারদাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য চেয়ে নিতে বলছেন। বিয়ে করে সংসার ধর্ম্ম পালন করবে না এ আবার কি কথা। মানে হচ্ছে, এ আর এক যেন কি পরীক্ষা ? স্ত্রীসহবাস এ তো সাধারণ কথা। কিন্তু ভৈরবী এনেছিল অন্য একটি স্ত্রীলোক—অপূর্ব্ব রূপসী। যার তুলনা মানুষের সঙ্গে মেলা কঠিন।

মুনিরও মতিভ্রম হয়—

মুনিরও সত্যি মতিভ্রম হয় এমন এক পূর্ণ-যৌবনা স্ত্রী যাঁর মুখের দিকে চাইলে, চোখ আর ফেরাতে পারে না একজনও। তাই সেই আলো-করা রূপের মাঝে কে না ঝাঁপ দেবে ? কে না ডুবিয়ে দেবে নিজেকে, কোন কিছু ভাল মন্দ বিচার না করে ? শ্রীরামকৃষ্ণও যদি নিজেকে সাম্‌লাতে না পারেন, তবে সেটা সত্যি কি তাঁর দোষ হবে ? সেটা কি তাঁর ভুল হবে ? এই প্রশ্ন করা বা ভাবা কি ভুল ? না, এ ভাবা ভুল নয়—ভুল নয়।

বিশ্বামিত্র ও মেনকা—

মহর্ষি বিশ্বামিত্র যাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে, দেবতারা কি করবেন তাই ভেবে ভেবে, শেষে ঠিক করলেন, রূপ-সাগরে যে করে হোক বিশ্বামিত্রকে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু একথা ভাবা সহজ, কাজে কতটা হবে সেটা খুব শক্ত। কারণ বিশ্বামিত্র যে সে তপস্বী নয়। মহাদেবের তপস্যা ভাঙ্গতে গিয়ে মদনই নিজে ভস্ম হয়ে গেলেন। শেষে রতিদেবী মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে, তবে আবার মদনকে ফিরে পেলেন। তাই সেই মহাদেবেরই মত উগ্র-তপস্বী বিশ্বামিত্রকে রূপ-সাগরে ফেলে দিতেই হবে। ঐ মোহ ঘেরা রূপ-সাগরের মাঝ থেকে দেখা যাক্ বিশ্বামিত্র কেমন করে ওঠেন—কত বড় তিনি তপস্বী! ঠিক তাই হল! বিশ্বামিত্র নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

তিনি মেনকার ভরা-যৌবনের আকর্ষণে নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না—তার অপরূপ রূপে মুগ্ধ হয়ে, নিজেই রূপ-সাগরে ডুব দিলেন। তারপর ?

তারপর মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসজাত কন্যা শকুন্তলা ভূমিষ্ঠ হলে, মেনকা বিশ্বামিত্রকে এই শিশুকন্যাকে দেখবার ভার দিয়ে, হেসে বললেন, "তাঁর যতটুকু কাজ ছিল তা শেষ হয়ে গেছে।"

বিশ্বামিত্র বুঝলেন, তিনি কি করেছেন। তাই স্বর্গের মেনকা স্বর্গে চলে গেলেন আর বিশ্বামিত্রও চলে গেলেন, আবার নিজের কাজে। অসহায় শিশুকন্যা পড়ে কাঁদতে লাগল। এই সময় এক শকুনি এসে শিশুকে রক্ষা করবার জন্য সে তার ডানা মেলে দাঁড়াল।

দেবতা হয়েদেবতার ও মানুষ হয়ে মানুষের, কাজ করলে না। সে কাজ সুসম্পন্ন করলে, কুখাদ্য, পচা, গলা, মাংসভোজী নিকৃষ্ট শকুনি। শেষে কণ্বমুনি এই শিশুকে নিজের কন্যার মত মানুষ করলেন। দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ হল। কিন্তু তপঃভ্রষ্ট বিশ্বামিত্র নিজের ভুল বুঝতে পারা মাত্রই আর মায়ায় আবদ্ধ না হয়ে তখনি চ'লে গেলেন। বিশ্বামিত্র আবার তপস্যায় বসলেন। আবার শক্তি সঞ্চয়ও করলেন। এই দুর্নাম, এই কুকীর্ত্তি, তিনি কিন্তু তপস্যা করে মুছতে পারলেন না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

যে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়ে তাঁর অসীম মনোবল ও তপস্যায় দেবতাদের ব্যস্ত করে তুলেছিলেন। যে বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন, ব্রহ্মা তাঁকে নিজে উপবীত দিয়েছিলেন। সেই তেজস্বী বিশ্বামিত্র আর একজন সাদাসিধে মায়ের ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের দুজনের মধ্যে তুলনা করলে কি মনে হয়? মনে হয় যা বিশ্বামিত্র পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণও তা কিছুতেই পারবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ পারবেন না, না—না—এই ভরা-যৌবনের ডাক্‌কে উপেক্ষা করতে তিনি পারবেন না! রূপ-সাগরে না ডুব দিয়ে, তার কূলে শুধু স্থির হয়ে চুপ করে বসে থাকবেন, এই কথাই নিশ্চিত। শ্রীরামকৃষ্ণও এই রূপ-সাগরের তীরে, তাই দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি করবেন! রূপ-সাগরের জল টল্ টল্ করছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে স্পর্শ করবে বলে হাত বাড়িয়েছেন। রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে, প্রাণ ভরে স্নান করে নিজেকে শান্ত, নিজেকে ধন্য করতে এগিয়ে এসেছেন! মন কিন্তু তাঁর বেঁকে বসল। তিনি রূপসাগরে ডুব না দিয়ে, কোথায় ডুব দিয়ে, ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলেন, একেবারে অতলে।

সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভীতা সারদা—

সারদামণিকে কে যেন হঠাৎ ডেকে তুলে দিলে। তিনি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে বসে দেখলেন, একি! শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও শোন নি? বিছানায় একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন?

রাত কটা কে জানে। এমন ভাবরূঢ় কুটস্থ মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের দেখে, সারদা ভয় পেয়ে, ঘরের বাইরে এলেন ও ঝি কালীর মাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "ভাগ্‌নেকে শিগ্‌গীর ডেকে দাও—উনি যেন কেমন হয়ে গেছেন।"

কালীর মা হৃদয়কে ডেকে দিলে। হৃদয় এসে বললে, "ভাবরাজ্যে বাস করেন, তাই ভাবের ঘোরে ভর হয়ে গিয়েছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি—

হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণকে নাম শোনাতেই আবার পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরে এলেন। তিনি নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে, প্রথমে বিশেষ বিশেষ যে কথাগুলি সারদাকে বলেছিলেন, সে কথাগুলি তাঁরই বিশেষ জানা দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের সারদাকে ভরসা ও মন্ত্রদান—

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে ভরসা দিয়ে বললেন, "আমার আরো অনেক রকম ভাব হবে। তুমি ভয় পাবে না। বাহ্যজ্ঞান আনতে কোন্ ভাবে, কোন্ মন্ত্র শোনাবে, শিখিয়ে দিচ্ছি। ভাব না হলে কি তাঁকে কেউ ধরতে পারে। ভাবের উদয় আর লয়—যেমন লোহাকে চুম্বক ধরে তেমনি।"

এমনি করেই কি সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণের কাটবে ?

প্রথম এই রাত্রির মত কত রাত্রি কেটে গেল। সারদা ঘোম্‌টায় মুখখানি ঢেকে চুপ করে শুয়ে থাকেন। তারপর কত কি ভাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কত যুক্তি, কত তর্ক তিনি নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করে তাকে নিবৃত্ত করেন। সারদা মাঝে মাঝে ঘোমটা সরিয়ে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ভেঙ্গে গেলে তিনি বলেন, "তুমি শোও। রাত পোহাতে এখন অনেক বাকী।" কিন্তু এমনি করেই কি তাঁদের রাতের পর রাত কাটবে ?

সোজাসুজি বল আমি মা হব—

কে যেন একজন স্ত্রীলোক সারদাকে বললেন, "তুই বড় ন্যাকা—তুই বড় বোকা।" এই কথা শুনে সারদা অবাক্ হয়ে বললেন, "কেন কি হয়েছে ?" সারদার কথার পর আবার তিনি বলেন, "তুই হাঁদী। তুই এমনি আহাম্মক হবি! আচ্ছা গাঁয়ের মেয়ে কি স্বামী নিয়ে ঘর করে না, তাদের ছেলে-পিলে হয় না ?"

সারদা বলেন, "তা আমি কি করব ?"

"স্বামীকে ভেসে যেতে না দিয়ে সংসারে টেনে নিবি নে ?"

"ধর্ম্মপত্নী হয়ে তুই এমন অধর্ম্ম ঘটাবি ?"

"তুই স্ত্রী হয়েছিস্ মা হবি নি? স্বামীর কাছ থেকে ষোল আনা আদায় করে নে! তাকে সোজাসুজি গিয়ে বল, আমি মা হব!"

সারদার সন্তান প্রার্থনা—

সরলা সারদামণি সেই রাত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, "একটা ছেলেপুলে হবে নি? বিয়ে হয়েছে, আমার তা নইলে কিসে সংসার ধর্ম্ম বজায় থাকবে?"

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্ব্বিকল্প-সাধনা ও সর্ব্ব-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—

ঠাকুর রামকৃষ্ণ চম্‌কে উঠলেন সারদার কথা শুনে!

সারদা উপযাচিকা হয়ে তাঁর বিছানায় এসে, পা টিপে দিতে বসলেন।

রামকৃষ্ণ মহামায়ার চাতুরা বুঝে মনে মনে হাসলেন। তিনি ভাবলেন, এতদিন তুই মা হয়ে এখানে ছিলি, এখন আবার তোর কি খেয়াল হল, স্ত্রী-মূর্ত্তি ধরে এলি আমার কাছে। তুই আসতে পারলে আমার ভয় কি?

চকিতে যেন সারদা কি রকম হয়ে গেলেন—তিনি ঠিক সেই সময় নিজের দেহ-বোধ হারিয়ে ফেললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি মা হতে চাও, তা একটি ছেলেতে কি হবে? দেশ-দেশান্তর থেকে তোমার কত ছেলে আসবে, মা ডাকে তুমি তখন তিষ্ঠতে পারবে না।" সারদা নিজে সরে গেলেন, তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন মহানন্দে শান্তিতে!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বীর্য্যের পরীক্ষায়, স্থৈর্য্যের পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ হলেন। উত্তীর্ণ হলেন, নির্ব্বিকল্পের সাধনায়।

সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্মপথের সহায়—

শ্রীরামকৃষ্ণের কিন্তু মনে উদয় হল যে, সারদা বীর্যবতী বিদ্যা, বলবতী মেধা, ধারণাবতী স্মৃতি। সারদাকে তাই তিনি ঘুম থেকে ডেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "সারদা তুমি কি আমায় সংসার পথে আবার টেনে নিতে চাও?"

সারদা উত্তর করলেন, "না—আমি তোমার ইষ্টপথে সাহায্য

করতে চাই।" এইবার সারদার এই কথায়, একটা বিরাট সমস্যার সমাধান হল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মনে শান্তি—

সারদার এই কথা শুনে, শ্রীরামকৃষ্ণের মনে শান্তি নেমে এল। তিনি তখন সারদাকে বললেন, "যাও শান্তিতে ঘুমও।" তারপর আবার সারদাকে তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যি করে বলো, তোমার কি মনে হয়। আমি তোমায় কি ত্যাগ করছি?"

সারদা বললেন, "তা কেন হবে, তুমি তো আমায় গ্রহণ করেছ।" শ্রীরামকৃষ্ণেব সহধর্ম্মিণী সারদা এখন শান্ত—সমস্ত কামনা, বাসনা শূন্য। বার বার ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি লজ্জায় তিনি নিজের মনের কথা গোপন করে থাকেন তাই। কিন্তু সারদার মনে কোন কিছুরই চাহিদা নেই। তাঁর কোন কিছুর অভাবও নেই। কেবল কথাবার্ত্তায়, ভাব ভঙ্গিমায়, তাঁর বিরাজ করছে শুধু শান্তি।

দক্ষিণেশ্বরে যোগেনের মা—

বড়লোকের বউ যোগেনের মা সংসার-জ্বালায় অস্থির হয়ে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "শান্তি আছে সারদার কাছে। তুমি তার কাছে থাক।"

কিছুদিনের মধ্যেই যোগেনের মা সারদার কাছে থেকে, ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। সারদা তাঁকে বললেন, "ওঁর কেমন ভাব হয় দেখলে?"

যোগেনের মা সারদার কথার উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ দেখলুম!"

সারদার ভাবপ্রার্থনা—

যোগেনের মাকে অনুরোধ করলেন, যে "তুমি গিয়ে ওঁকে একটু বল যে, আমায় যেন তিনি একটু ভাব্ টাব্ দেন।" যোগেনের মা সারদার কথা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সেই কথার কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে রইলেন।

ভাবের ভাবুক সারদার ভাব-সমাধি—

যোগেনের মা নহবতে সারদার কাছে ফিরে এসে দেখলেন, সারদা পূজায় বসেছেন। আবার দেখলেন, সারদা হাসছেন—

আবার দেখতে দেখতে, একটু পরেই তাঁর খুব কান্না, তারপর একেবারে একদম সমাধি।

এই দেখে পরে যোগেনের মা সারদাকে বললে, "তুমি যে বল তোমার ভাব্ টাব্ হয় না।" এই কথায় সারদা বললেন, "কি জানি কেমন হয়ে গেলুম, আমি মহানন্দে যেন ভেসে গেলুম! তিনি আমার চর্ম্ম স্পর্শ করেন নি, তিনি আমার মর্ম্ম স্পর্শ করেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে বললেন, "তুমি—তুমিই নিতে পাররে আমার ভাব।"

মথুরমোহনের ভাবপ্রার্থনা ও প্রত্যর্পণ—

সারদামণির মত মথুরবাবুও ভাব চেয়েছিলেন।

তিনি একদিন রামকৃষ্ণকে বললেন, "বাবা জমিদারী চালাতে গিয়ে অনেক খুন জখম করতে হুকুম দিয়েছি। আমি অনেক কুকর্ম্মই করেছি, তাই দাও আমায় নিষ্কৃতি! দাও আমায় ভাব দাও!"

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনে বললেন, "দিব্যি আছিস। সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবি কেন?"

মথুরবাবু কিন্তু এ কথা শুনতে চান না। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে চান ভাব-সমাধি!

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলেন, "আমার কথা না শুনলে চলবে কেন! এদিক ওদিক তোর দুদিকই চলছে। ভাব হলে, তখন তোর বিষয় কে দেখবে?"

তবু মথুরবাবু নাছোড়বান্দা, তার ভাব চাই।

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটু ইতঃস্তত করে বললেন, "কি জানি বাপু মাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি, তিনি কি বলেন, দেখি তাঁর কি ইচ্ছা!" এর কিছুদিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ডাক পড়ল। দেখ আবার কি হল! তিনি গিয়ে দেখলেন, মথুর যেন কি রকম হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে যেন চেনা যায় না। মথুরবাবুর চোখ লাল, তিনি কেবলই কাঁদছেন, মুখে তাঁর শুধু একই ঈশ্বরের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেই মথুর তাঁর দু'পা জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাবা আমার দোষ মাফ্ কর। তুমি তোমার ভাব ফিরিয়ে নাও! বিষয় কর্ম্মে মন দিতে পারছি না, চেষ্টা করেও মন উঠে যাচ্ছে। এই তিনদিনে বারো ভূত ছেড়ে, তেত্রিশ ভূত এসে লেগেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কেন ইচ্ছে করেই ভাব নিয়েছ, এখন ফেরৎ দিলে চলবে কেন?"

তারপর আবার মথুরকে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "আনন্দ নেই এতে?"

ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথা মথুরবাবু শুনে ভাবে গদগদ হয়েই বললেন, "ওগো নিত্যানন্দ এ আনন্দ তোমারই সাজে! আমাদের ও সমস্তয় কাজ নেই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে স্নেহের হাত মথুরের বুকে বুলিয়ে দিতে, তিনি ধাতস্থ হয়ে গেলেন।

মথুরকে শান্তি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আবার বললেন, "তুই আর কি চাইবি? শুধু প্রসন্নতা, শুধু আশ্রয়, শুধু প্রেম, শুধু শান্তি, ব্যাকুল হয়ে এই প্রার্থনা কর! সংসার কর্মে লেগে থাকলেও মন ঈশ্বরে ফেলে রাখ!"

শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে শান্তির প্রলেপ—

ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে আছে শান্তির প্রলেপ। যখনই যার অশান্তি হয় তখনই তিনি তাঁর শান্তি-হাত সেই অশান্ত বুকের ওপর বুলিয়ে দিয়ে শান্তি দেন।

যেন যাদুমন্ত্রে সমস্ত জ্বালা, যন্ত্রণা কোথায় চলে যায়, তা কে জানে?

আনন্দময় হৃদয়ের শান্তিভঙ্গ—

হৃদয় মহা আনন্দেই কাটাচ্ছে। তার মামা আছে, তার আর ভাবনা কি? মামার হলেই ভাগ্নের হল। মামার কিছু দরকার নেই।

তিনি কিছু নেনও না চানও না। কিন্তু ভাগ্‌নে জমি, জমা, গরু, টাকা, পরিবার, গহনা এই সমস্ত যোগাড় করছে আর ডঙ্কা মেরে বেড়াচ্ছে। এত সুখ তার সহ্য হল না।

তার স্ত্রী এই সময় মারা গেল।

হৃদয়ের বৈরাগ্য ও ভাবপ্রার্থনা—

হৃদয়ের মনটা হঠাৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে বদলে গেল। সে এই আঘাত পেয়ে বললে, "তোমার কেমন ভাব্ টাব্ হয়, আমায় তেমনি ভাব্ টাব্ দাও। আমাকে অতলে ডুবিয়ে দিয়ে দেখাও তোমার মহামায়াকে।" এই কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে বললেন, "আমার সেবা করলেই তোর সব হবে। আমায় সেবা কর!"

হৃদয় বললে, ঢের সেবা করেছি, বলে বেশ ঝেঁজে উঠল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে অনেক বুঝিয়েও কিছু পারলেন না।

আমরা অবতার—

একদিন গাডু গামছা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যেতে যেতে হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখে বললেন, "আমরা দু'জনেই অবতার, চল দেশে দেশে গিয়ে জীবের উদ্ধার করি।" রামকৃষ্ণ তখন তাকে মিনতি করে বললেন, "চুপ কর ওরে চুপ কর!" কিন্তু হৃদয় তাঁর কথা না শোনায়, তিনি তাঁকে ছুঁয়ে দিয়ে বললেন, "মা শালাকে জড় করে দে!" হৃদয় অসহায়ের মত চেয়ে রইল। তারপর সে বললে, কি করলে, "আমি আর সেই দৃশ্য দেখতে পাব না?"

হৃদয়ের পঞ্চবটী আসনে সাধনা—

পরে হৃদয়ের আবার ঝোঁক হল, মামাকে আর তার দরকার নেই। পঞ্চবটী আসনেরই মাহাত্ম্য আছে। সে একাই পারবে বলে, যেইমাত্র সেই পঞ্চবটীর আসনে বসা, অমনি যন্ত্রণায় সে অধীর হয়ে চিৎকার করে উঠল। কে যেন তার গায়ে এক মাল্‌সা আগুন ঢেলে দিলে। হৃদয় চিৎকার করে বলতে লাগল, "পুড়ে মলুম। শিগ্‌গীর বাঁচাও!"

আমার সেবায় তোর সমস্ত হবে—

হৃদয়ের চিৎকার শুনে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটে এসে তাঁর স্নেহ-করুণ হাত বুলিয়ে দিতেই সমস্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি বললেন, "কেন এই সমস্ত ঝামেলা করিস। তোকে বলেছি না যে আমার সেবা করলেই তোর সমস্ত হবে।"

হৃদয় বুঝলে যে মামার সেবা-শুশ্রূষা ছাড়া আর পথ নেই।

হৃদয়ের মত মথুরমোহনের ঝোঁক—

হৃদয়ের মত মথুরবাবুও একবার ঝোঁক ধরলেন, বিজয়াদশমীর দিন মাকে বিসর্জ্জন দেব না, নিত্য পূজা করব।

এই ঝোঁক কারো কথায় কমল না। স্ত্রী জগদম্বার কথাও কানে নিলে না। চোখ লাল করে অস্থির চিত্তে পায়চারী করছেন আর বলছেন, "মাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমি বাঁচতে পারব না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের শান্তি-প্রলেপে অশান্ত মথুরের শান্তি—

মথুরমোহনকে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরোধ করলেন কিন্তু তাঁর অনুরোধও তিনি ঠেলে দিলেন।

এইবার তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শান্তি-মাখা হাত মথুরের বুকে বুলিয়ে দিলেন, আর মুখের অমৃত-মাখা কয়েকটি কথায় বললেন, "মাকে বিসর্জ্জন দিলেও তিনি যাবেন কোথায়? তিনি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। এই তিন দিন বাইরে থেকে পূজা নিয়েছেন, এইবার তোমার অন্তরের অন্দরে বসে পূজা নেবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের শান্তি স্পর্শে শান্তি পেলেন মথুরবাবু। তাঁর সমস্ত অশান্তি দূরে গিয়ে, তিনি পূর্ব্বের মতই সহজ সরল হয়ে গেলেন। শান্তি-প্রলেপে যেন তাঁর দেহ মনকে শান্ত করে দিলে, নিমিষের মধ্যে।

সকলের দুঃখে দুঃখী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—

শ্রীরামকৃষ্ণ অপরের দুঃখে কষ্টে নিজে দুঃখ কষ্ট অনুভব করতেন। অপরের আঘাতে নিজে আঘাত পেতেন। মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, "একবার চলো আমার জমিদারীটা দেখে আসবে চলো।"

"তাই চলো" বলে, তিনি হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে মথুরবাবুর সঙ্গে তাঁর জমিদারী দেখতে গেলেন। চূর্ণির খালে সকলে তাঁরা নৌকা করে বেড়াচ্ছেন এমন সময় রাণাঘাটের কাছে কুলাই ঘাটায় এসে শ্রীরামকৃষ্ণের সেইখানের লোকের ওপর নজর পড়ল। তিনি তাদের দেখে, বড়ই কষ্ট অনুভব করে বললেন, "এই তোমার জমিদারীর চেহারা ?" মথুরবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "কেন কি হয়েছে!" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ওদের পরনে টানা, পেটে পিঠে এক হয়ে গেছে। ওদের তুমি একখানা করে কাপড় দাও আর এক বেলা খাইয়ে দাও!"

এই কথায় মথুরবাবু না না করায় শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে বললেন, "চল জমিদারী দেখে দরকার নেই দক্ষিণেশ্বরে ফিরে চল।"

মথুরবাবু এইবার শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথা শুনে, তখন তিনি তাদের অন্ন বস্ত্র দুই বিতরণ করে, রামকৃষ্ণকে খুসী করলেন।

সর্ব্বজীবে নারায়ণ ও সর্ব্বজীবের ব্যথার ব্যথী শ্রীরামকৃষ্ণ—

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, নৌকার ওপরে দুই মাঝি ঝগ্‌ড়া করছে, তারপর তাদের ঝগ্‌ড়া ক্রমশঃ বেড়ে উঠে হাতাহাতি, মানে একজন আর একজনকে খুব মার দিলে। তার মার খেয়ে, সে খুব কাঁদতে লাগল। এই দেখে, শ্রীরামকৃষ্ণও তারমত খুব কাঁদতে লাগলেন।

হৃদয় ছুটে এসে বললে, "মামা তোমার কি হয়েছে ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আমায় মেরেছে।" হৃদয় তখন রেগে গিয়ে বললে, "কে মেরেছে আমায় দেখিয়ে দাও!"

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "ঐ যে মাঝি, ঐ মাঝি মেরেছে।"

হৃদয় তখন একটু অবাক্ হয়ে বললে, "তা তুমি তার জন্যে এতো কাঁদছ কেন ?" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ওকে মারাই মানে আমায় মারা। ওর আঘাতে আমি আঘাত পেয়েছি। জানিস তো

নারায়ণ সর্ব্বজীবেই রয়েছেন। তাই ওর আঘাতেই আমার আঘাত লেগেছে।”

হৃদয় আশ্চর্য হয়ে গিয়ে দেখলে, সত্যি তার মামা একটুও মিথ্যে বলেনি, সত্যিই তাঁর পিঠ আঘাত পেয়ে, লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

এক হয়েও বহু—সর্ব্বজীবে নারায়ণ—

এই সর্ব্বজীবে নারায়ণ এ কথা কিন্তু সকলের বলা সাজে না। অনেকে সুখ-সুবিধার বেলায় তখন সর্ব্বজীবে নারায়ণ কিন্তু অসুবিধায় পড়লে এই নারায়ণ ভাব আর নেই তার। নিজেকে যখন সকলের সঙ্গে সমজ্ঞান হবে, যখন একজনের সুখে সুখ পাবে আর একজনের দুঃখে তেমনি দুঃখ পাবে, তখনই সর্ব্বজীবেই নারায়ণ, আমিই সকলের ভেতরে—তখন সে দেখবে আমার ভেতরেই সকল। সেই নারায়ণ একমাত্র আছেন যিনি সকলের ভিতর এক হয়েও বহুরূপে বিরাজ করছেন।

দুঃখের দুঃখী শ্রীরামকৃষ্ণের সমজ্ঞান—

শ্রীরামকৃষ্ণেরই এই কথা বলা শোভা পায়, যাঁর সমস্ততেই সমজ্ঞান। কামারপুকুর থেকে ফেরার পথে তিনি কাঁটা ফুল দেখে, সেই মাঠেই মাহাদেবের পুজা করতে বসলেন। এই কাঁটা ফুলে মহাদেব নাকি খুব প্রসন্ন হন। কিন্তু হৃদয় তাঁকে ধমকে বললো, “মাঠময় বিঠা দেখতে পাচ্ছি, এ তোমার ভাল হচ্ছে না।”

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরুত্তর। তাঁর কাছে বিষ্ঠা আর চন্দনে ভেদ নেই, তাই তিনি সকলের দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন আর তাই তো তিনি মথুরবাবুর জমিদারী দেখতে গিয়ে, সেখানের জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখে, দুঃখ পেয়ে, মথুরকে দিয়ে অন্ন বস্ত্র বিতরণ করেছিলেন। তাইতো তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে বৈদ্যনাথের পথে সেখানেও দুঃখীদের মথুরবাবুকে দিয়ে অন্ন বস্ত্র দান করেছিলেন।

মাঝির আঘাতে নিজে আঘাত পেয়েছিলেন মনে। ঠাকুরের এই মনের আঘাত মনেই ছিল না, তা বাইরে ফুটে উঠেছিল একেবারে স্পষ্ট লাল হয়ে।

কাঙ্গালীদের ভোজন করিয়ে, তিনি তাদের সেই সমস্ত এঁটো নোংরা নিজের হাতে ধুয়ে দিয়েছেন। কোন কিছুই তাঁর মনে দাগ লাগে নি। তিনি দেখেছেন, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন। তিনি ও তারা সকলেই এক।

সর্ব্বজীবে নারায়ণের গল্প—

তাই বলে এই গল্পের মত সর্ব্বজীবে নারায়ণ জ্ঞান ভাল নয়। এই গল্প কথা, এক গুরু তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন। কোন এক গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন, "সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন।" তাই পথ দিয়ে হাতী ছুটে চলেছে। আর হাতীর ওপর থেকে মাহুত সকলকে সাবধান করছে যে, "পথ থেকে সকলে সরে যাও!" কিন্তু এই শিষ্য সে পথ থেকে না সরে, হাতী-নারায়ণকে স্তব করতে লাগল। হাতী শিষ্যকে শুঁড়ে করে পথের ধারে আছাড় দিয়ে সরিয়ে রেখে গেল। তারপর শিষ্যের গায়ের ব্যথা আর ঘা সারলে, তখন সে তার গুরুকে বললে, "প্রভু, সর্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন। তাই হাতী-নারায়ণকে পথে পেয়ে স্তব করেছিলুম। কিন্তু হাতী-নারায়ণ আমার শেষে এই অবস্থা করলে।" গুরু হেসে বললেন, "মাহুত-নারায়ণের কথা শুনলে, এমন হোত না।"

তোতাপুরীর ক্রোধ জয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ আর তাঁর গুরু তোতাপুরী ধুনীর ধারে বসে দু'জনেই অদ্বৈত ধ্যানে প্রায় অচেতন হয়ে আছেন। এমন সময় কে একজন তামাক খাবার জন্যে তোতাপুরীর ধুনী থেকে যেই আগুন নিয়েছে, অমনি তোতা রেগে তাকে চিমটে তুলে, এই মারে তো এই মারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই দেখে খুব হেসে বললেন, "জীব মাত্রেই ব্রহ্ম। তবে সেই বহুরূপে বর্ত্তমান ব্রহ্মকে মারতে গেলে?" শ্রীরামকৃষ্ণ শেষে তোতাপুরীকে শিক্ষা দেবার জন্যেই আবার বললেন, "কাম জয় করেও ক্রোধ জয় করতে পারনি!"

তোতা এই শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, "আজ থেকে ক্রোধ ত্যাগ করলুম।" গুরু হয়ে তিনি শিষ্যের কাছে শিক্ষা নিলেন।

চৈতন্যের আসনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-সমাধি—

আবার কালী দত্তের বাড়ীতে হরিসভায় শ্রীচৈতন্যের আসনে উঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-সমাধি হয়ে গেল। তাঁর এই ভাব-সমাধি হওয়ার কথা চারিধারে প্রচার হয়ে গেল। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ছয় রিপুর মধ্যে কাম আর ক্রোধ সাধুদের প্রথম জয় করতেই হয়। কিন্তু তোতাপুরী কাম জয় করে ক্রোধ জয়ের শিক্ষা পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। এইবার এক এক করে, বহু গুরু ও ভক্তের শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আরম্ভ হল।

ভগবানদাস বাবাজীর ক্রোধ—

শ্রীচৈতন্যের আসনে শ্রীরামকৃষ্ণ উঠে বসার কথা শুনে, কাল্‌নায় ভগবানদাস বাবাজী খুব রেগে গিয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আশ্রমে হাজির হলেন। তাঁর পৌঁছবার পর বাবাজী সুগন্ধের আঘ্রাণ পেলেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে, তিনি বুঝলেন, মহাপ্রভুর মহাভাব তাঁর অঙ্গে প্রকাশিত।

ভগবানদাসকে অহঙ্কার ও ক্রোধ জয় শিক্ষা এবং ভগবান দাস নিজেকে ভাগ্যবান-জ্ঞানে ক্ষমা প্রার্থনা—

শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাকে ক্রোধ জয় করতে ও ভগবানদাসকে অহঙ্কার আর প্রতিহিংসা জয় করতে শেখালেন।

ভগবানদাস বললেন, "আমার নাম ভগবানদাস বটে কিন্তু আজ থেকে আসল নাম ভাগ্যবান। আমি ভাগ্যবান বলেই আপনাকে পেয়েছি, আপনি দেখা দিয়েছেন।" শ্রীরামচন্দ্র যেমন ছোট বড় ভেদাভেদ না করে তার সঙ্গে সখ্যতা করেছেন, চৈতন্য মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে জ্ঞান দিয়ে উদ্ধার করেছেন, তেমনি, শ্রীরামকৃষ্ণ মথুর আর হৃদয়কে নিয়ে, নৌকা করে বেড়াতে এসে, তাঁর শহর দেখতে ইচ্ছা হয় ও ঘুরতে ঘুরতে, লোককে জিজ্ঞাসা করে, তিনি ভগবান দাসের আশ্রমে উপস্থিত হন। ভক্ত, ভগবানকে দেখে যখন চিনতে পারে, তখন তার ভুল ভেঙ্গে যায়। তখন সে নিজের এই

অপরাধের জন্তে যেমন ক্ষমা প্রার্থনা করে, তেমনি ভগবানদাসও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরকে বললেন, "এখানে একটি মোচ্ছব লাগিয়ে দাও।"

সাধু হয়েও রিপুর কবলে—

মানুষ সাধু হয়েও রিপুর কবলে কে কখন পড়ে যায় তা সে বুঝতে পারে না। তখন তাই রামকৃষ্ণ ওদের জয় করে আর শিক্ষা দিয়ে হাসেন—আবার তখনি তেমনি ভয়ও পান—রক্ত-মাংসে গড়া শরীরে ভুল যদি হয়?

তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু। সর্ব্বত্যাগী উলঙ্গ নাগা-সন্ন্যাসী হয়েও কিন্তু তিনি ভুল করে, ক্রোধের কবলে পড়লেন। ভগবান দাস বাবাজী বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েও ভুল করে, অহঙ্কার ও প্রতিহিংসার কবলে পড়লেন।

দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুঘরের সাধুবালক পূজারী—

রামকৃষ্ণের ভাইপো বাপ-মা মরা ছেলে অক্ষয় বিষ্ণুঘরের পূজারী হয়ে বসেছেন। তার বয়স তখন মাত্র সতর বছর। এই সুরূপ ছেলে অক্ষয় পূজা করে, নিজে হাতে রান্না করে খায় আর সারা দিন গীতা পড়ে। ধ্যানে নিস্পন্দ হয়ে দু'তিন ঘণ্টা বসে থাকে। তার ভক্তি দেখে রামকৃষ্ণ তাকে খুব ভালবাসেন।

অক্ষয়ের বিয়ে হবার পর সে অসুখে পড়ল। সামান্য জ্বর সেরে যাবে, ডাক্তার বললেন। কিন্তু হৃদয়কে ডেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ছোঁড়া বাঁচবে না।"

হৃদয় বললে, "ছিঃ তুমি এই কথা বললে, তোমার মুখে এ কথা বেরুল কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তা জানি না। অক্ষয় চলে যায় তা কি আমি চাই। মা আমায় যেমন বলান তেমনি বলি।" হৃদয় উঠে পড়ে যত ডাক্তার আছে সকলকেই দেখালে। কিন্তু মাস খানেক ভুগে অক্ষয় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। শোকে অধীর হয়ে, হৃদয়

কাঁদতে লাগল আর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন ভাবভূমিতে চলে গিয়েছেন, তাই দুঃখ তখন তাঁর নেই। তিনি বললেন, "অক্ষয় অমৃত-তীর্থে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে, সে চলে গেছে, ক্ষয়হীন আনন্দধামে।" এর পর আর একটি ঘটনা ঘটল।

কাশীতে মথুরমোহন কল্পতরু—

মথুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে কাশীতে কল্পতরু সেজে যে যা চেয়েছিলেন, তিনি তাকে তাই দান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে এইবার মথুর বললেন, "তুমি কি চাও?" পূর্বে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গর্ভধারিণী মা চন্দ্রমণি, মথুরের অনেক অনুরোধে, অনেক সাধ্য সাধনায় মাত্র এক আনার দোক্তা চেয়েছিলেন। এখন তাঁর ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ চাইলেন একটি কমণ্ডলু।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট মথুরের প্রার্থনা—

মথুর অসুখে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই কমণ্ডলুর একটু গঙ্গাজল দেবে না? কৃপানিধি হয়ে তুমিও কৃপণ হয়ে গেলে?"

মথুরের এই কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কোন দরকার নেই, স্বয়ং গঙ্গা তোমায় নিয়ে যেতে আস্‌ছেন।" শ্রাবণ মাসের পয়লা সেইদিনেই মথুরের শেষ।

সূক্ষ্মদেহে শ্রীরামকৃষ্ণ—

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। কিন্তু তাঁর সূক্ষ্মদেহ জ্যোতির পথ ধরে মথুরের শয্যা পার্শ্বে চলে এলেন। মথুর শেষবারের মত কেবল তাঁকে দেখে, চোখ বুজলেন।

বিকেল পাঁচটায় ধ্যান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ উঠে, হৃদয়কে বললেন, "ওরে মথুর রথে উঠে বেগে দেবীলোকে চলে গেল।" বাতে দক্ষিণেশ্বরে খবর এল বিকেল পাঁচটায় মথুরবাবু লোকান্তরিত

ইচ্ছা ন।

দাসের ষ্ণের সূক্ষ্মদেহ ধারণের আর একটি ঘটনার কথা—

চিনতে বাবুর কাছ থেকে হৃদয় দেশেতে দুর্গাপূজার জন্য টাকা

চাইলে, তিনি এই টাকা দিতে চাইলেন এই সর্ত্তে, যে পূজার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে যাবে না।

হৃদয় বললে, "আমার প্রথম পূজায় মামা থাকবে না?" শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে বললেন, "ক্ষুণ্ন হস্‌নে হৃদু, আমি রোজ সূক্ষ্মদেহে তোর পূজা দেখে আসব।"

তারপর আবার বললেন, "তবে অন্য কেউ আমায় দেখতে পাবে না, শুধু তুই দেখতে পাবি।" সত্যি। পূজার পর, রোজ আরতির সময় হৃদয় দেখতে পেত, প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। এরপরও কতবার তাঁকে সূক্ষ্মদেহে ভক্তের কাছে গিয়ে বাইরে ও তার হৃদয়-মন্দিরে দাঁড়াতে হয়েছে তা সকলে হয়ত জানে না। কিন্তু ভক্ত জানে ঠাকুর শান্তিদাতা—ঠাকুর দয়াময়।

ভক্তির ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—

বাগবাজারের এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একটি মাত্র মেয়ে চণ্ডী রাজরাণী হয়েও, অকালে তার মাকে শোকের সাগরে ডুবিয়ে, পৃথিবী থেকে চলে গেল। কিন্তু সেই শোকাতুরা ব্রাহ্মণী কি করে এই দারুণ শোকের হাত থেকে শান্তি পাবেন সেই জন্যে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসা করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ওপর তার কত ভক্তি, তারই প্রমাণ পরে পাওয়া গেল। তাই ভক্তের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তার সকল শোক তাপ হরণ করলেন। জীবনে এনে দিলেন আনন্দের জোয়ার।

ঐ তোমার আপনজন—

ব্রাহ্মণী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বললেন, "তার আপনার বলতে একটি মাত্র মেয়ে ছিল। নাম তার চণ্ডী কিন্তু সে রাজরাণী হয়েও অকালে মারা গেছে।" এই কথা বলে সে কাঁদতে লাগল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে যা বলেছিলেন, তার মানে "চণ্ডী তোমার কেউ নয়—সে তোমার আপন নয়—ঐ দেখ, মা চণ্ডী ভবতারিণীকে—শুধু ওঁকে বিশ্বাস কর উনিই প্রত্যেক মানুষের সকল সময় আরাধ্যা দেবী—ওঁকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর—ওঁকে পাবার চেষ্টা কর—একমাত্র উনিই তোমার আপনজন।"

আমার ভাগ্যি দেখে যা—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীকে বলেছিলেন, যে বাগবাজারে নন্দ বোসের বাড়ী থেকে তিনি তার বাড়ী যাবেন। ঠাকুর তাকে এই কথা দেওয়ায়, সে ঠিক সময়ে তাঁর আশা পথ চেয়ে আছে আর ভাবছে, বুঝি এই এলো—বুঝি এই এলো ঠাকুর!

ঠাকুর নির্দ্দিষ্ট সময়ে না আসায়, এধার ওধার ঘুরে এসে দেখে, ঠাকুর দলবল নিয়ে তার বাড়ীতে এসে বসে আছেন। তাঁকে দেখে তখন তার এত আনন্দ হল যে, সে তা চেপে বলতে না পেরে, খুব আনন্দে বললে, "ওগো! আমার মেয়ে চণ্ডী যখন এসেছিল আর তার সঙ্গের সেপাই-সান্ত্রীরা আমার দরজায় পাহারা দিচ্ছিল, তখন আমার এত আনন্দ হয়নি। আমার একি হোল—চণ্ডীর শোক আর আমার একটুও নেই গো! আমি মরে যাব! একজন মুটে এক টাকায় এক লক্ষ টাকা পেয়ে, যেমন আনন্দে মরে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি! তাই সকলে আমায় আশীর্ব্বাদ কর—ওগো আমার এত সুখ সইবে না! আমার ভাগ্যি দেখে যা—দেখে যা আমার ঘরে কে এসেছে!"

ভগবান যখন মানুষ হয়ে যুগবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যুগবতার! কারণ ভগবান মানুষ হয়ে যখন তিনি মানুষের ঘরে জন্মান তখন মানুষের মতই কাজ করেন। ঠাকুর যদি সাধারণ মানুষই হবেন, তবে কেমন করে বিধবা ব্রাহ্মণীর শোক হরণ করলেন। কেমন করে মথুরমোহনের কাছে গিয়ে শেষ শান্তি দিলেন! কেমন করে হৃদয়ের পূজার আরতির সময়, দেবীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা রাখলেন! আর কেমন করে সারা নবদ্বীপে, গোঁসাইবাড়ী আর এধার ওধার ঘুরে নৌকোয় এসে ভাবে মগ্ন হয়ে দেখলেন, গৌর-নিতাইকে আর আর সকলকে।

নৌকায় ভাবমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ কি বুঝলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, এইখানে প্রভুর জন্মস্থান। তা শুনে মথুর বললে, এই যে বালুর চড়া এই হচ্ছে আসল নবদ্বীপ। যে নবদ্বীপে ঠাকুরের জন্ম হয় তা এখন গঙ্গায় ভেসে গেছে। তাই এখানেই

ঠাকুরের ভাব-সমাধি হয়েছে। তুমি ভাবাম্বুনিধি—তুমি সর্ব্ব গুণেশ্বর।

তিনি বললেন, "আমি আবার কে। আমি কেউ নই।"

জগৎমাতার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আকুল প্রার্থনা—

শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে ক্রোধ জয় করতে শেখালেন। ভগবানদাস বাবাজীকে অহঙ্কার আর প্রতিহিংসা থেকে নিজে গিয়ে মুক্তি নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সাধু হয়েও তিনি অজান্তে রিপুর বশ হয়েছিলেন। তাই তিনি মাকে বললেন, "মা কাম জয় করেছি কিন্তু ওর মধ্যে সারদামণির মধ্যে কাম ভাব আনিস নি। ও যদি কামময়ী হয়ে ওঠে, তবে হয়তো দেহবুদ্ধি জেগে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। মা আমায় কৃপা কর। মা তোর দুয়ার ধরে পড়ে আছি, আমায় কৃপা কর। সারদাকে তুই সারভূতা করে দে। আমি প্রেম, সারদা পবিত্রতা, তাই আমার স্ত্রীকে কাম-মোহিনী না করে কাল-মোহিনী করে দে।"

সজীব বা অভিনব সাধনা—

প্রস্ফুটিত কুসুমের মত নব-যৌবনা স্ত্রীকে সম্মুখে রেখে, মায়ের কাছে একজন সুস্থ সামর্থ্যবান বীর্য্যবান যুবকের, একি অসাধারণ সাধনা—একি অসাধারণ আরাধনা।

মা কৃপা করে সেই ঘরেই সারদার মধ্যে দেখা দিলেন। জগদীশ্বরীকে তিনি সারদার মধ্যে দেখালেন।

একই শয্যায় দুজনে আটমাস কাটালেন। এ শবসাধনার চেয়েও কঠিন। এ সজীব সাধনা। এ এক অভিনব সাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা—

এই সাধন শেষে জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় সাল ১২৮০—ফলহারিণী কালীপূজার দিন—সেই দিনটিই খুব প্রশস্ত। এই কালীপূজা কিন্তু মন্দিরে হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। গুপ্তভাবে এই পূজা হবে। পূজা হবে ষোড়শীরূপিণী স্ত্রী সারদার। মার মন্দিরে হৃদয় জাঁকজমকে মা ভবতারিনীর মামুলি পূজায় ব্যস্ত। হৃদয় দধি

ও সমস্ত জোগাড় করে দিয়েছে। তবু রাধাগোবিন্দের পূজা করে দীনু নামে একটি ছেলে—শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানী ভাইপো। সে ফুল বেলপাতা জোগাড় করে জিজ্ঞাসা করলে, "এ কেমন পূজা ?"

"এ রহস্যপূজা" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করলেন।

কালীবাড়ীতে হৈহৈ গান-বাজনা চলছে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত নেই। রাত্রি তখন ৯টা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দরজা বন্ধ।

সারদাকে বলা ছিল তাই তিনি সাধারণ বেশে রাত ঠিক ন'টার সময় এসে দরজায় আঘাত করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দরজা খুলে তাঁকে পিঁড়ির উপর এনে বসালেন। আল্‌পনা আঁকা পিঁড়ে আর তার সামনে, পাশে, পূজার উপকরণ সাজানো রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে গঙ্গার দিকে পশ্চিম মুখো হয়ে বসো বলে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। তারপর তিনি পূব মুখো হয়ে বসে, প্রথমে সারদার পায়ে আল্‌তা পরিয়ে দিলেন। কপালে মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে দিলেন। তাঁর স্পর্শেই সারদার অর্ধবাহ্যদশা হয়ে গেল। এইবার তিনি সারদার পরণের শাড়ী নিজে ছাড়িয়ে, পরিয়ে দিলেন নব-বস্ত্র। থালায় করে মিষ্টি খেতে দিয়ে বললেন, খাও। খাবার পর পান দিলেন মুখে। পূজার উপকরণ সংশোধিত হল। সামনের কলসে মন্ত্রপূত জল ছিল, যথা বিধানে সারদাকে অভিষিক্ত করলেন, ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে ষোড়শীর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, "ইহ গচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ।" এই প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণের পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার উচ্চারণ করলেন "হে কালিকা সর্ব্বশক্তির অধিশ্বরী জননী, হে ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত করো। এর দেহ মন পবিত্র করো, এতে আবির্ভূত হও। এতে বিরাজিতা থাকো। জগৎ-সংসারের সর্বকল্যাণকরণ সম্পূর্ণ করো।"

"হে কপালিনী আমাকে ভার্যা দাও মনোরমা। শুধু মনোরমা নয়, মনোবৃত্তি অনুসারিণী।"

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর রুদ্রাক্ষের মালা, কবচ যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল, আগের সাধন-ভজন করার বেশবাস পর্যন্ত এনে সারদার পায়ে প্রণাম করলেন। পূজার শেষ উপচার এই প্রণাম করে তিনি বললেন, "যত জপ, সাধন, ভজন, যত আচার, বিচার, ক্রিয়া-কাণ্ডের মালা—সমস্তই তোমার পায়ে দিলাম। এ পূজাতেই আমার সমস্ত পূজার ইতি হল।"

এই বলে, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে প্রণাম করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রমেয়াকে প্রতিমায় পরিণত—

সারদা এই সমস্ত চোখ মেলে দেখছেন, কথা কইতে পারছেন না।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করেছিলেন আজ আবার অপ্রমেয়াকে প্রতিমায় নিয়ে এলেন। তিনি জানালেন, "হে সর্ব্বমঙ্গল-স্বরূপা সর্বার্থসাধিকা, হে শরণদায়িনী ত্রিনয়নী, সনাতনী নারায়ণী তোমায় প্রণাম।"

আত্মনিবেদন করে, শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন।

যখন শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙ্গল তখন রাত্রি প্রায় তিন প্রহর। সারদা পিঁড়ির উপর তখনো নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। কে কার পূজা করলে? শিব ও শক্তি—পুরুষ আর প্রকৃতি। এক ব্রহ্ম দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে, একজন অপরজনের পূজা করছেন। উমা মহাদেবের পূজা করেছেন, আবার কালমোহিনী কালীকার পদতলে, শিব শব হয়ে, বুক পেতে দিয়ে, আত্মসমর্পণ করেছেন। ওধারে আবার ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী রূপে ত্রিপুরারী বিশ্বেশ্বরীর কাছে যোড়হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। অন্নপূর্ণারূপে অন্নদান করে, মহাদেবী শরণাগত দেবাদিদেব মহাদেবের বাসনা পূর্ণ করেছেন। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝরাতে নিভৃতে আবার জানালেন, "হে সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ সর্বার্থসাধিকা, হে শরণদায়িনী ত্রিনয়নী সনাতনী নারায়ণী তোমায় প্রণাম।" আত্মনিবেদনকারী শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। তারপর সমাধি তাঁর ভেঙ্গে যাওয়ার পরও সারদা প্রতিমার মত নির্বাক নিশ্চল। তাঁর কোন ক্ষমতা নেই, তাই তিনি পিঁড়ির উপর নিশ্চল হয়ে বসে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার সমাপ্তি ও আদেশ—

ষোড়শীপূজার কি এখনও বাকী আছে? না বাকী নেই মনে হয়, তাই এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে বললেন, নবতে এইবার তুমি যেতে পারো—পূজা শেষ হয়েছে। সারদা তাড়াতাড়ি উঠে নবতের দিকে ছুট্ দিলেন। এইবার তার মনে হল, ছিঃ! একটা প্রণাম করে আসা উচিত ছিল, তাই এখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে মনে প্রণাম করলেন।

লক্ষ্মী ও সারদা—

এই পূজার কথা লক্ষ্মী শুনে সে সারদাকে বললে, "এত লজ্জা তোমার, তুমি তাঁকে কাপড় পরাতে দিলে কিগো?" সারদা তার কথার উত্তরে বললেন, "কি জানি কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম।"

—"উনি তোমায় মিষ্টি খাওয়ালেন, পায়ে ফুল দিলেন, হাত দিলেন, তুমি ঠায় বসে রইলে।"

—"কি জানি বাপু বসে রইলুম। সমস্ত দেখেও, নড়তে চড়তে বা কথা বলতে পারলুম না।"

—"আর কেউ টের পেলে না?"

—"দরজা বন্ধ, কি করে টের পাবে!"

লক্ষ্মী এইবার সারদাকে বললে, "তুমি মহাশক্তি। তা না হলে এ পূজা গ্রহণ করে এমন শক্তি কার?"

সারদার রাধা ভাব ও চরম ভাবের অবস্থা—

এই পূজার পর থেকে সারদার ভাব হয়। সেই থেকে বংশী-বটবিহারীকে দেখেন, তাঁর বাঁশরীর স্বর শুনতে পেয়ে মনে হয় যেন তিনি নিজে রাধিকা হয়ে গেছেন। ঘুমতে ঘুমতে তাই তিনি সেই মধুর বাঁশী শুনে উঠে বসেন। সারদার এই ভাবের চরম, নীলাম্বরবাবুদের বাড়ীতে হয়। শ্রীমায়ের ধ্যানের পর আর সমাধি ভাঙ্গে না। তাই অনেক নাম শোনবার পরে, তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বার বার বলতে লাগলেন "ও যোগেন আমার হাত কই, আমার পা কই? আমি কি করে ঢুকবো এই শরীরের মধ্যে।"

স্ত্রী-ভক্তরা শ্রীমার হাত, পা, টিপে দিতে লাগল, "এই যে হাত।" তবু দেহটা যে কোথায় খুঁজে পাচ্ছেন না।

নবতে সারদা চট্ করে চলে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এবার শান্তিতে গা মেলে ঘুমোও। আমার কাছে থাকতে আর সারা রাত জেগেই, বসে থাকতে। কখন কি ভাব হয় আমার আর কখন কি নাম মন্ত্রে বলে আমায় সচেতন করো— এতে কি কারুর সুখ থাকে, না শরীর থাকে—তুমি মার কাছে নবতে গিয়ে ঘুমোও!" সারদা এই সমস্ত কথা শুনে ভক্তিতে ও ভাবেতে ভরপুর হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, "তাই যাব, তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যাব বিরহের মন্দিরে, সেখানেই বিশ্বনাথের আরতি করব। আমার বসন নিয়েছ, তুমি নাও আমার সমস্ত বাসনা!"

হৃদয়ের ব্যঙ্গোক্তিতে সারদার উত্তর—

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি দেখে হৃদয় সারদাকে ঠাট্টা করে বললে, "সবাই তো মামাকে বাবা বলছে তুমিও তবে বাবা বলে ডাক না!"

সারদা হৃদয়ের এই কথায় রুষ্ট বা অপ্রতিভ একটুও না হয়ে গভীর প্রীতি আর নিবিড় ভক্তির সঙ্গে বললেন, "উনি বাবা কী বলছ, উনি বাবা, মা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত। যেখানে যে সম্পর্কে যতটুক আনন্দ আছে সমস্তই উনি। উনি আনন্দময়!"

জগৎমাতা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা পূর্ণ—

শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীপূজার শেষে মাকে বলেছিলেন, আমাকে ভার্যা দাও মনোরমা। শুধু মনোরমা নয়, মনোবৃত্তি অনুসারিণী। তাই মা সারদাকে তাঁর পতি শ্রীরামকৃষ্ণের মত মনোবৃত্তি করে দিয়েছেন।

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি—

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মথুরের দেওয়া বেনারসীর জোড় পরে হঠাৎ এক সময় তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে হাজির হলেন, তখন সারদা উঠানে তাঁকে দেখে নিজের মাথায় তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা দিয়ে মাকে গিয়ে বলেন, "দেখ মা কে এসেছেন!" সারদার মা জামাই শ্রীরামকৃষ্ণকে ক'দিন যথেষ্ট আদর যত্ন করলেন কিন্তু তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে

যাবার সময় তাঁকে খুবই সংসারে অনাসক্ত বুঝে কেঁদে বললেন, "যদি সংসারই না করবে, তবে বিয়ে করেছিলে কেন?" সারদার মা বুঝলেন না ইনি যুগে যুগে অবতার হলেও এখন মা তাঁকে যা বলান তাই বলেন যা করান, কেবল তাই করেন।

মহামায়ার মায়া—

সারদার মা শ্যামাসুন্দরী তাঁর মেয়ের দুঃখে কাতর। পেটের মেয়ে তাই তার ওপর এতো মায়া। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ দেখেও ভুলে গেছলেন সারদা কে? তাই সারদা যখন একবার দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলেন, সেই সময় সন্ধ্যার আঁধারে দলছাড়া হয়ে, একলা কেলো ভেলোর মাঠ দিয়ে চলছেন—তখন এক ডাকাত এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "কে তুমি?" সারদা বলে, আমি তোমার মেয়ে বাবা!" ডাকাতের পাষাণ প্রাণ এই কথায় হঠাৎ গলে গেল। ডাকাত দেখলে, সারদার পিছনে স্বয়ং মা কালী অস্ত্রধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ডাকাত সারদাকে মেয়ের মত স্নেহে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রীতে দুজনে যত্ন করে সাধ্যমত খাওয়ালে, সেবা করে পরমানন্দ বোধ করলে। পরে সারদাকে নিজে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিলে। সমস্তই মহামায়ার মায়া, এ মায়া বোঝা কঠিন।

মথুরের শেষ প্রশ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে হঠাৎ বিষাদছায়া—

মথুরবাবু শেষ রোগশয্যায় পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বাবা—সেই যে তুমি বলেছিলে, তোমার অনেক ভক্ত আসবে, কই তারা তো আজও এল না?" "কি জানি বাপু কতদিনে আসবে সব। মা যত কিছু বলেছেন, যত কিছু দেখিয়েছেন সব ফলেছে, শুধু এইটেই ফলল না।" এই কথার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে পড়ল যেন ঈষৎ বিষাদের ছায়া।

ঠিক সময়ে যাঁর প্রয়োজন তিনিই এসেছেন—

মথুরবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার পর কিন্তু যখন যাঁর প্রয়োজন হয়েছে, তখন ঠিক সকলেই এসেছেন। সাধনার সময় যখন যাঁর দরকার হয়েছে, তিনিই বিনা আহ্বানে এসে আপনি হাজির হয়েছেন।

যখন তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রয়োজন, তখন এসেছেন কোথা থেকে কেউ জানে না ভৈরবী যোগেশ্বরী।

তারপর বোধ হয় ব্রহ্মদীক্ষাব প্রয়োজন হয়েছিল। তাই ঠিক সেই সময় এলেন, সাতশো সন্ন্যাসীর প্রধান উলঙ্গ নাগা-সন্ন্যাসী তোতাপুরী। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হল, ধর্ম্ম মানে যা ধরে তাঁর কাছে পৌছন যায়। তাই সেই ধর্ম্ম ভিন্নপথের হলেও, তা ঠিক কি না?—এখন তাই মা সে সাধও তাঁর পূর্ণ করলেন। এলেন, মুসলিম ধর্ম্মাবলম্বী গোবিন্দ রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ইস্‌লামের পথও তো একটা পথ—

মা পাঠিয়েছেন গোবিন্দ রায়কে, তাই তিনি বললেন, ইস্‌লামের পথও তো একটা পথ। আমি সেই পথটা বাদ দেব কেন? শ্রীরামকৃষ্ণকে গোবিন্দ রায় দীক্ষা দিলেন। তাই এবার দীক্ষার পর আর তাঁর মুখে মা মা নেই। মায়ের নামের বদলে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুধু আল্লা আল্লা। নমাজ পড়া, এমন কি মুসলমানের মত কাছা খুলে কাপড় পরতে লাগলেন ও রাঁধুনী বামুনকে কাছা খুলিয়ে বাবুর্চির নির্দেশ মত উগ্র পেঁয়াজ, রশুন দেওয়া রান্না করিয়েও খেলেন। সাধনার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দেখলেন, এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বৃদ্ধ ফকিরের বেশে এসে, শান্তি ও মধুর কথায় বললেন, "তুমি এসেছ বেশ"—এই বলে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করলেন। ইনি সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি ব্রহ্ম ছাড়া আর অন্য নন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবার অবোধ শিশুর মত বার বার মায়ের কাছে প্রার্থনা—

এই মুস্‌লিম ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের তিন দিন ছিল। তারপর আবার সেই আগের মত। "মা-মা—তোমার শরণাগত। শুধু তোমার শরণাগত। তাই এই করো মা তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধ-ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবন-মোহনী মায়ায় মুগ্ধ করো না—শরণাগত—মা-মা আমি তোমার শরণাগত।"

"ও মা—ও মা, ওঁকাররূপিণী মা—এরা কত কি বলে মা—কিছু বুঝতে পারিনি।"

এই সমস্ত বলে, কালীমন্দিরের চাতালে বসে, শ্রীরামকৃষ্ণ স্তব করছেন। মায়ের তিনি সত্যিই শরণাগত—তাই তিনি সেই আগের মত মা-মা, করে অবোধ শিশুর মত মায়ের কাছে বারবার প্রার্থনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও যদু মল্লিক—

এইবার এরপর এলেন, যদু মল্লিক আর শম্ভু মল্লিক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাই যদু মল্লিককে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি বড় অন্যমনস্ক। ঈশ্বর চিন্তায় নয়, বিষয় চিন্তায়। তুমি সেই রামজীবনপুরের শিলের মত আধখানা গরম, আর আধখানা ঠাণ্ডা। ঈশ্বরেও মন আছে আবার সংসারেও মন। তুমি পুরুষ মানুষ, কথা দিয়ে কথা রাখ না কেন?

মান সম্বন্ধে হুঁশ যদি থাক্‌তো তবে তো মানুষই হতে। মান আর হুঁশ নিয়েই মানুষ—আর পুরুষ কাকে বলে, তার সম্পদ কোথায়?"

যদু মল্লিক এদিক ওদিক তাকায়। তখন তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "হাতির দাঁত আর পুরুষের বাত শুধু নিজেকে পুরুষ বলে মানলে হবে না। কথা দিলে কথা রাখতে হবে। বাড়ীতে চণ্ডীর গান দেবে বলেছিলে তা হল কই? কতদিন তো কেটে গেল। যদু মল্লিক বলেন, "অনেক ঝঞ্ঝাট—নানান ঝামেলা।"

যদু মল্লিক নিজেকে পুরুষ মানুষ বলে মানেন কিনা রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন। যদু মল্লিক নিজেকে পুরুষ মানুষ বলায় রামকৃষ্ণ ওপরের কথাগুলি বলে সত্যি কাকে পুরুষ মানুষ বলে তা বুঝিয়ে দেন। আর এই যদু মল্লিক সংসার চিন্তা থেকে সরে এসে খুব ১০ফি-দন না করে ভগবৎ চিন্তায় যাতে মন দিতে পারেন, শুধু তারই মথুরবাবুর এই কথাগুলি শিক্ষার ছলে বলেন।

হয়েছে, তখন ঠিক প্রশ্ন—

দরকার হয়েছে, ভিন্ন বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ বেড়াতে এসে এক মেম সাহেব

আর তাঁর ছেলেকে দেখে কোন রকমেই তাঁর চোখ ফেরাতে পারেন না। কে এই দেবশিশু ও মা পুণ্যময়ী পতিব্রতা ?

এই প্রশ্নের উত্তর এল—মা মেরী আর তাঁর ছেলে যীশু।

মথুরমোহনের পর রসদদার শম্ভু মল্লিককে শ্রীরামকৃষ্ণের এক আদেশ—

শ্রীরামকৃষ্ণ শম্ভু মল্লিককে বললেন, শোনাও আমায় যীশুর গল্প। এখন ভক্ত শম্ভু মল্লিকই মথুরবাবুর পর শ্রীরামকৃষ্ণের রসদদার। বাগবাজার থেকে তিনি সটান হেঁটে বাগানে আসেন। কেউ কেউ বলে, "গাড়ী করে কেন আস না ? কোন যদি বিপদ হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শম্ভু মল্লিকের প্রায় এক মত এক পথ—

এই কথায় শম্ভু মল্লিকের মুখ মলিন হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, "মা'র নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথার পর বলেছিলেন, আমিও লেখাপড়া জানি না কিন্তু মায়ের নাম করি বলে সকলে মানে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাইবেল শোনার পরের অবস্থা ও কথা—

শম্ভু মল্লিক হেসে বললেন, "আহা! তা আর জানি না।" শ্রীরামকৃষ্ণকে সকলে মানে একথা তিনি সমর্থন করার পর তাঁকে বাইবেল পড়ে শোনাতে বলায়, শম্ভু মল্লিক তা পড়ে শোনালেন। আবিষ্টের মত শ্রীরামকৃষ্ণ তা শুনতে লাগলেন। পরে আর একদিন সেই ছবি দেখে মনে হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু পীযূষ, প্রেমময়, শুধুই যীশু। কৃষ্ণ নয় খৃষ্ট আর সেই ঘরখানি যেন গির্জ্জা হয়ে গেছে। নানা ধূপ, দীপ, মোমবাতি জ্বেলে পাদরীরা ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করছে। সামনে তাদের দেবতা যীশু। শ্রীরামকৃষ্ণ হেঁটে গির্জ্জার সামনে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে কিন্তু ভেতরে ঢুকবার সাহস পেলেন না। তাঁর মনে হল যদি কিছু হয়। কালীঘরের খাজাঞ্চি হয়তো বসে আছে ওখানে। ভেতরে গেলে যদি দক্ষিণেশ্বর কালীঘরের লোকেরা আর তাঁকে ঢুকতে না দেয়, তবে দোর-গোড়া থেকেই দেখি বলে, শ্রীরামকৃষ্ণ দোর-গোড়া থেকে ভেতরে চেয়ে দেখলেন। চোখে

তাঁর পরম পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টি। সত্যি তিনি দেখলেন এ কালীঘর। ভেতরের বেদীতে কালো রূপে আলো করে মা বসে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দুই চোখ আনন্দধারায় ভেসে গেল।

যীশুর আবির্ভাব ও শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে লীন—

এই খৃষ্টান ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে তিনদিন রইল, চারদিনের দিন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে কে একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল ও তারপর আলিঙ্গন করে তাঁরই দেহে লীন হয়ে গেল। ঈশ্বর যুগে যুগে ধর্ম্মকে রক্ষার জন্য যুগবতার-রূপে এসেছেন তিনি কখন কৃষ্ণ কখন খৃষ্ট। তাই দক্ষিণেশ্বরের এই ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণের মাঝে আবার যীশু নিজে এসে লীন হয়ে গেলেন। মানুষের মনে জ্ঞানের আলো জ্বেলে সেই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণের দেহেই লীন হয়ে দেখালেন, তিনি এক এবং সমস্ত জাত ও ধর্ম্মের ভেতর একাকার।

খৃষ্টান সন্ন্যাসী মিশ্র—

সন্ন্যাসী মিশ্র ধর্ম্মে খৃষ্টান। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বললেন, আপনি আর যীশু এক। ঠাকুর ভাবে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। তারপর মিশ্রের দিকে চেয়ে হেসে হেসে সবাইয়ের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করতে লাগলেন।

সাহেবের ছেলের ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃষ্ণরূপ দর্শন—

গড়ের মাঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বেড়াতে গিয়েছেন। বেলুনে উঠবেন। কিন্তু বেজায় ভিড়। তাই তিনি সরে এসে দাঁড়িয়েছেন এক পাশে। এমন সময় তাঁর নজর পড়ল একটি সাহেবের ছেলে ত্রিভঙ্গিম হয়ে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যেই দেখা অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপনা হয়ে তাঁর সমাধি হয়ে গেল।

ঈশ্বরের কৃপায় সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বজীবে তাঁর দর্শন সম্ভব—

সমস্ত ধর্ম্ম, সমস্ত জাত, সমস্ত স্থানে ও সমস্ত জীবে ঈশ্বর

বিরাজমান। সমস্ত ধর্ম্মেই তাঁকে ধরতে পারা যায় সমস্ত মানুষই যদি তাঁর কৃপালাভ করে তবে নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ গির্জার বেদীতে মাকে দেখলেন, গড়ের মাঠে সাহেবের ছেলেকে ত্রিভঙ্গিম হয়ে গাছে হেলান দিয়ে থাকতে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ মনে করে ভাবে সমাধিস্থ হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও দক্ষিণেশ্বরে দুর্দ্দান্ত সাহেব ব্যারিষ্টার মাইকেল মধুসূদন দত্ত—

দক্ষিণেশ্বরে ব্যারিষ্টার হিসাবে মামলার উপলক্ষে মথুরবাবুর বড ছেলে দ্বারিক এনেছেন, বাঙ্গালী হলেও সাহেব মাইকেল মধুসূদন দত্তকে। খবর এল, শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দেখতে চান।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভয়েই অস্থির। লেখাপড়ায় দুর্দ্দান্ত সাহেব মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি এই কথা ভাবলেন ও স্থির করলেন, সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে হবে কিন্তু তিনি তো ইংরাজী টিংরাজী কিছুই জানেন না, তাই নারায়ণ শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

নারায়ণ শাস্ত্রী ও মাইকেল মধুসূদন—

মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে নারায়ণ শাস্ত্রী সংস্কৃত কথা বলায়, মাইকেল তাঁকে বাঙ্গলায় কথা বলতে বলেন। কথা চললো দু'জনের মধ্যে। নারায়ণ শাস্ত্রী বললেন, "তুমি ধর্ম্ম ছাড়লে কেন ?" মাইকেল পেট দেখালেন।

নারায়ণ শাস্ত্রী ঘৃণায় চলে এলেন। এই জন্যে আমার মনে হয়, যে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।' তিনি কেন নিজের ধর্ম্ম ছাড়লেন। এ কথা সকলে জানে অথচ তিনি মুখে বলতে পারলেন না। তাই নারায়ণ শাস্ত্রীর আত্মকথা-গোপনকারী মাইকেলের প্রতি একটা অন্য ভাব এল—আর তিনি ঘৃণায় সেখান থেকে চলে এলেন এই বলে, যে পেটের জন্যে ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তিনি তার সঙ্গে কথা বলেন না।

অনুতপ্ত মাইকেলকে শ্রীরামকৃষ্ণের শান্তিদান—

মাইকেল শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে বারো বছরের বড় কিন্তু তা হলেও

তিনি করজোড়ে বললেন, আপনি কিছু বলুন, আপনি আমাকে কৃপা করবেন না? আপনার আমি ভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই কথায় বললেন, "কথা কইতে চাই কিন্তু কে আমার মুখ চেপে ধরেছে।"

মাইকেল তাঁর এই কথা শুনে মর্ম্মাহত হলেন ও বিশেষভাবে ভাবতে লাগলেন যে, তিনি কি এত অভাজন? এত পরিত্যজ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন। তাই বললেন, "গান শোন শান্তি পাবে।" মাইকেল শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে রামপ্রসাদী গান শুনে শান্তি পেলেন। তারপর ভাবে আস্তে আস্তে চোখ বুজলেন।

বিদ্যাসাগর সমীপে শ্রীরামকৃষ্ণ—

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর শুধু বিদ্যারই সাগর নয়, মাতৃভক্ত, দয়ার সাগর। তাই মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা করতে ইচ্ছা হল। ইচ্ছা হলেই উপায় হয়। আর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা কি অপূর্ণ থাকে? উপায় হয়ে গেল। মাষ্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন, তাই শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, বিদ্যাসাগরকে দেখতে তাঁর সাধ হয়েছে। মাষ্টার বিদ্যাসাগরকে এই কথা জানালে, তিনি আনন্দের সঙ্গে তাতে রাজী হয়ে কেবল এই কথাটা বললেন, "কেমন পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া পরে থাকেন?" মাষ্টার বলেছিলেন, "না তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ। লাল পেড়ে কাপড় আর গায়ে জামাও পরেন। পায়ে আবার বার্নিশ করা চটীজুতা কালীবাড়ীর একটী ঘরে অতি সাধারণ ভাবে বাস করেন। বাহ্যিক সাধুর কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া কিছুই জানেন না। শুধু তাঁরই চিন্তা করেন।"

বিদ্যাসাগরের কথামত একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বাড়ী গেলেন। ঠাকুরকে দেখে, উঠে দাঁড়িয়ে, সম্মান দেখালেন বিদ্যাসাগর। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর টেবিলে হাত রেখে যেন কতদিনের চেনা তাই একদৃষ্টে তাঁকে দেখতে দেখতে ভাবে হাসতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগরের তখন বাষট্টি, তেষট্টি বছর বয়স। ঠাকুরের চেয়ে

ষোল, সতের বছরের বড় হবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটিজুতা, গায়ে একটি হাতকাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চারধার উড়িয়াদের মত কামানো। কথার সময় উজ্জ্বল বাঁধান দাঁত দেখতে পাওয়া যায়। মাথা খুব বড়, উঁচু কপাল ও একটু বেঁটে। ব্রাহ্মণ তাই গলায় পৈতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের রসিকতা এবং সাত্ত্বিক কর্ম্ম ও বিদ্যা-অবিদ্যার বিচার—

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুর একটু হেসে প্রথমেই বললেন, "আজ সাগরে এসে মিললাম।"

বিদ্যাসাগরও হেসে এই কথার উত্তরে বললেন, "তবে খানিকটা লোনা জল নিয়ে যান।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলবেন, "না গো লোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র।"

বিদ্যাসাগর বললেন, "তা বলতে পারেন বটে বলে, চুপ করলেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার এই কথার ব্যাখ্যা করে বললেন, "তোমার কর্ম্ম সাত্ত্বিক কর্ম্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম্ম করা যায় সে রাজসিক কর্ম্ম বটে কিন্তু এ রজগুণ সত্ত্বের রজগুণ, এতে দোষ নেই। শুকদেবাদি লোক-শিক্ষার জন্যে দয়া রেখে-ছিলেন। ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দেবার জন্যে তুমি বিদ্যা দান করেছ। এও ভাল, কারণ নিষ্কামভাবে করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কিন্তু কেউ করে নামের জন্যে, পুণ্যের জন্যে, তাই তাদের কর্ম্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি তো আছই।"

বিদ্যাসাগর বললেন, "কেমন করে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, "আলু, পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম—তোমার এত দয়া।" বিদ্যাসাগর এইবার আবার হেসে বললেন, "কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়।" সেখানে যারা ছিলেন সকলে হেসে উঠলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি তা নও গো—শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া, না এদিক না ওদিক।

শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর তার ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, তারা শুনতেই পণ্ডিত কিন্তু তাঁদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য। তা হলে, অবিদ্যা যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন আর বিদ্যা যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম। এই বিদ্যাই ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়।” তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে বিদ্যাসাগর চুপ করে রইলেন। অন্যান্য সকলে এই আনন্দময় পুরুষের দর্শন ও তাঁর কথামৃত পান করতে লাগলেন।

ব্রহ্ম কি ?—

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। তিনি ষড়দর্শন পড়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন, যে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “ব্রহ্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত Problem of Evil ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। জীবের সম্বন্ধে দুঃখাদিই তাই।” শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন, “বিদ্যামায়া অবিদ্যা-মায়া দুই আছে। জ্ঞান, ভক্তি আছে আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে, ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ সৎ অসৎ জীবের পক্ষে এই সমস্ত ব্রহ্মের কিছু হয় না। যেমন প্রদীপের সুমুখে কেউ ভাগবত পড়ছে আর কেউ জাল করছে—প্রদীপ কিন্তু নির্লিপ্ত। সূর্য শিষ্টের ওপর আবার দুষ্টের ওপরও আলো দিচ্ছে। যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি, এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে ওসব জীবের পক্ষে—ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, তাই অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।”

ব্রহ্ম মুখে বলার জিনিস নয়—

মুখে সমস্ত কিছু বলে বোঝান যায় কিন্তু ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না। তাই ব্রহ্ম ছাড়া সমস্ত জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে।

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়-দর্শন মুখে পড়া হয়েছে। মুখে উচ্চারণ, তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু ওই একটি জিনিসই কেবল কখনও উচ্ছিষ্ট

হয়নি। সেই জিনিসটি হচ্ছেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নি।

বিদ্যাসাগর ব্রহ্ম সম্বন্ধে শুনে, বন্ধুদের বললেন, "বাঃ! এটি তো বেশ কথা, আজ একটি নতুন কথা শিখলাম।"

ব্রহ্মের গল্প—

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটি গল্প বললেন, "একটি লোকের দুই ছেলে। আচার্যের কাছ থেকে এলে, তাদের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, যে তারা কেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছে?

বড় ছেলে বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে, ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে লাগল। বাবা চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি ছোট ছেলেকে এই একই প্রশ্ন করায়, সে হেঁটমুখে চুপ করে রইল। এইবার বাবা ছোট ছেলেকে বললেন, তুমি কিছু বুঝেছ, কারণ তুমি তাঁর কথা মুখে বলতে পারলে না। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না।"

চিনির পাহাড় ও পিঁপড়ে—

ব্রহ্মের গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "মানুষ মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি, যেমন একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে, একটি দানা খেয়ে আর একটি দানা মুখে নিয়ে, বাসায় ফেরার সময় ভাবছে, এবার এসে সমস্ত চিনির পাহাড়টা নিয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই রকমই মনে করে, তারা জানে না, ব্রহ্মবাক্যও মনের অতীত। যে যতই বড় হোক না কেন, তাঁকে কি করে জানবে। শুকদেবাদি না হয় ডেঁয়ো পিঁপড়ে। চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক তিনি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে তাঁরা সাগর তীরে দাঁড়িয়ে, হিল্লোল কল্লোল দেখে, বর্ণনা করেছিলেন, তিনি আনন্দস্বরূপ। বেদের এই কথা তিনি সচ্চিদানন্দ। আর এক মতে আছে তাঁরা সাগরে নামেন নি। কারণ এ সাগরে নামলে আর ফেরবার উপায় নেই।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শন কি?—

সমাধিস্থ হলে (সাধকের) ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শন হয়। কিন্তু

সেই অবস্থায় তাঁর বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না।

যেমন লবনের পুতুল সমুদ্রে কত জল আছে মাপতে গিয়ে সে যেই জলে নামল আর অমনি গলে গেল। সমুদ্রের জল মেপে সে আর সেই মাপের খবর এনে দিতে পারলে না। কারণ সে তো জলে নামতেই গলে গেল। তাই কে আর খবর দেবে! একজন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, "সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তিনি কি আর কথা কন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ও অন্যদের বলেছিলেন, "ব্রহ্মদর্শন হলে, মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। যেমন ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে, ততক্ষণ তার কল্‌কলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়লে তখন আর একবার ছ্যাক্ কল্ কল্ করে। যখন এই কাঁচা লুচিকে পাকা করে তখন আবার চুপ। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোক-শিক্ষা দেবার জন্যে আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।"

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্‌ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধু পান করার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুন্‌গুন্ করে।"

"পুকুরের কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়, পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। তবে অন্য এক কলসীতে যদি ঢালা-ঢালি হয়, তা হলে আবার শব্দ হয়।"

এই ব্রহ্মের বিষয় নানা ভাবে বোঝাবার জন্যে নানা পথ।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—

কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহ বুদ্ধি যায় না তাই সোহং নিজেকে সেই আমি—আমিই সেই ব্রহ্ম বলা ভাল নয়। আমি দাস আমি ভক্ত এ অভিমান। ভক্তিপথে থাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। যেমন সিঁড়ির এক একটি ধাপে উঠে ছাদে ওঠা যায়। তেমনি জ্ঞানী বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করে তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে।

বিজ্ঞানীর মতে ছাদে উঠতে হলে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় কিন্তু ছাদ আর সিঁড়ি একই বস্তু, ইট চুণ আর সুরকী দিয়েই তৈরী। তাই নেতি নেতি করে, বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠে, যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে, তিনি জীব জগৎ হয়েছেন। কিন্তু ছাদে লোকে অনেকক্ষণ থাকতে পারে না আবার নেমে আসে। তেমনি সমাধিস্থ হয়ে, পরে নেমে এসে দেখেন, তিনিই আমি। তিনিই জীব জগৎ সব। এর নামই বিজ্ঞান। জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। সব পথই সত্য ও তাঁর কাছে পৌঁছন যায়। তবে ভক্তির পথই সোজা।

বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কি কাউকে কম আর কাউকে বেশী শক্তি দিয়েছেন ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করেছিলেন, "তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিপড়েতে পর্যন্ত কিন্তু বিশেষে একজন দশজনকে হারিয়ে দেয়। আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আচ্ছা তোমার কাছে লোকে আসে, তোমায় মানে কেন, তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে। তোমার দয়া তোমার বিদ্যা আছে, অন্যের চেয়ে তাই তোমায় মানে, তোমায় দেখতে আসে।"

এই কথায় বিদ্যাসাগর হেসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরে বললেন, "শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যেই বই পড়া। এক সাধুর পুঁথিতে কি আছে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাঁর পুঁথি খুলে দেখালেন। তার পাতায় পাতায় শুধু ওঁ রামনাম লেখা। গীতার অর্থ কি ? গীতা গীতা দশবার বলতে বলতে, ত্যাগী ত্যাগী হয়ে যায়। গীতার অর্থ হে জীব সব আসক্তি ত্যাগ করে, ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা কর। সাধুই হোক আর সংসারীই হোক মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।"

ভক্তিযোগের রহস্য The Secret of Dualism—

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "বিজ্ঞানী কেন ভক্তি নিয়ে থাকে ?

'আমিত্ব' এই ভাব সমাধি অবস্থায় চলে যায়। কিন্তু আবার ফিরে আসে।

সাধারণ জীবের অহং যায় না। যেমন অশ্বত্থ গাছকে কাটার পর আবার কোথা থেকে ফেঁকৃড়ি বেরয়। তেমনি জ্ঞানের পরও আবার কোথা থেকে অশ্বত্থ গাছের ঠিক ফেঁকৃড়ির মত অহং, আমি এই ভাব এসে পড়ে। সাধারণ জীবের জ্ঞানের পরও কোথা থেকে 'আমি' এই ভাব এসে যায়। যেমন স্বপ্নে বাঘ দেখে, ঘুম ভাঙ্গার পরও বুক ধড়্ফড়্ করে।"

জীবের আমি লয়েই যন্ত্রণা—

"গরু হাম্বা হাম্বা, আমি আমি করে যন্ত্রণা পায়। তাকে যখন লাঙ্গলে জুড়ে, তখন তার গায়ের ওপর দিয়ে রোদ বৃষ্টি চলে যায়। আবার কসাই কাটে, চামড়ায় জুতা হয়, ঢোল হয়। তখন সেই ঢোল খুব পেটে। তবুও নিস্তার নেই। শেষে নাড়ী ভুঁড়ী থেকে তাঁত তৈয়ারী হয়। তখন ধুনুরীর যন্ত্র হয়ে, 'আমি' আর না বলে, বলে তুঁহু তুঁহু অর্থাৎ তুমি তুমি বলে, আর তখনই হয় নিস্তার।"

জীবের আমি দাস হয়ে থাকি—

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হনুমান তুমি আমায় কিভাবে দেখো?" হনুমান বললে, "রাম যখন আমি বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস। আর রাম যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

"সেব্য সেবক ভাবই ভাল আমি তো যাবার নয়। তবে থাক শালা দাস 'আমি' হয়ে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাসাগরকে জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা—

পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, "আমি ও আমরা দুটিই অজ্ঞান থেকে আসে। যেমন আমার বাড়ী, আমার বিদ্যা, আমার ঐশ্বর্য। তাই হে ঈশ্বর তুমি কর্তা আর তাই বাড়ীর ছেলেপিলে লোকজন, বন্ধু-বান্ধব এ তোমার জিনিস— এই ভাব জ্ঞান থেকে হয়।"

আমাদের কি কর্ম করা দরকার—

মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড়লোকের বাগানের সরকার কেউ বাগান দেখতে এলে, তাঁকে বলেন, এই বাগানটি, এই পুকুরটি আমাদের। কিন্তু কোন দোষ দেখে যদি কর্ত্তা সরকারকে ছাড়িয়ে দেয়, তবে তার নিজের আম কাঠের সিন্দুকটা পর্যন্ত নিয়ে যাবার অধিকার আর থাকে না। দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।

ভগবানও হাসেন—

ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দেব। তিনি হাসেন এইজন্যে আমি মারছি, আর এ বলে বাঁচাব। কবিরাজ ভাবছে আমি কর্ত্তা, ঈশ্বর যে কর্ত্তা একথা ভুলে গেছে। তারপর দুই ভাই দড়ি ফেলে, এদিকটা আমার ওদিকটা তোমার বলে যখন ভাগ করে, তখন ভগবান মানে ঈশ্বর আর একবার হাসেন। এই মনে করে যে আমার জগৎব্রহ্মাণ্ড আর ওরা বলছে, এ জায়গা আমার আর তোমার। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তাঁকে বিচার করে জানা যায় না, তাঁর দাস হয়ে শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক। কিন্তু তোমার কি মনে হয়?" এই কথায় বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হেসে বললেন, "আচ্ছা সে কথা একদিন বলব।"

বিদ্যাসাগর ও তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে মতামত—

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ছাত্র অবস্থায়ও তাঁর প্রতিভার পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সোনার পদক ছাত্রবৃত্তি পেয়েছেন। ক্রমে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়েছেন অনেক, এ বিষয়ে জ্ঞানও অর্জন করেছেন কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে কাউকে শিক্ষা দেন নি। একদিন মাষ্টার এই ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর মুখে শুনেছিলেন যে, তাঁকে মানে—ঈশ্বরকে তো জানবার যো নেই! এখন কর্ত্তব্য কি? আমার

মতে কর্তব্য আমাদের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয় পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়। বিদ্যাসাগর ষড়দর্শন পাঠ করে দেখেছেন ও বুঝেছেন ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, নিজের মত অন্য সময় বলবেন বলে, মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে বললেন, "তাঁকে পাণ্ডিত্যের দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।" এই কথা বলে তিনি প্রেমোন্মত্ত হয়ে গান ধরলেন—

"কে জানে কালী কেমন ?
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥"

'ষড়দর্শনে না পায় দরশন' মানে তাঁকে দর্শন করার সুবিধা বা সন্ধান দিতে এই শাস্ত্র পারে নি। পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকে পেতে হলে, বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। বহু লেখা-পড়া শিখে বিদ্যাসাগর পণ্ডিত হয়েছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ কত অল্প—কত সহজ। প্রকৃত ভক্তের পক্ষেই শুধু এটা সম্ভব। কারণ যার খুব ঈশ্বর-বিশ্বাস আছে সেই প্রকৃত ভক্ত। আর তাঁরই ভক্তির জোর যে কত, তার কথা বুঝিয়ে দিলেন ঠাকুর আরো একটি গল্পে।

ঈশ্বরে বিশ্বাসের গল্প—

বিভীষণ একজনকে তার কাপড়ের খুঁটে একটা কি বেঁধে দিয়ে বললেন, তুমি নির্বিঘ্নে জলের ওপর দিয়ে চলে যেতে পারবে। সেও এই কথায় বিশ্বাস করে জলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে ভাবলে দেখি জিনিসটা কি। খুলে দেখে, শুধু তাতে রাম নাম লেখা একটি পাতা। তখন সে ভাবলে এই জিনিস। এই যেই ভাবা আর অমনি ডুবে যাওয়া। কথায় বলে হনুমান রাম নামে বিশ্বাস করে সমুদ্র পার হলেন কিন্তু স্বয়ং শ্রীরামকে সমুদ্র বাঁধতে হল। যদি

সকলের তাতে বিশ্বাস থাকে তবে পাপই করুক আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের ভাব নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে, বিশ্বাসের মাহাত্ম্য গাইতে লাগলেন।—

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তরো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।"

ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য The end of Life—

এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "বিশ্বাস আর ভক্তি। ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।"

এই কথা বলতে বলতে তিনি আবার গান ধরলেন—

"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥"

গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ, দেহ উন্নত ও স্থির। চোখ দুটি স্পন্দনহীন, বেঞ্চের ওপর পশ্চিমাস্য হয়ে বসে আছেন। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে, ঠাকুরের এই অদ্ভুত অবস্থা দেখছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে অছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার সহাস্যে কথা কইছেন—"ভাব ভক্তি এর মানে—তাঁকে ভালবাসা।"

ব্রহ্ম ও মা—

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই মা বলে ডাক্‌ছে।"

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতারে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥"

রামপ্রসাদ নিজে ভক্ত। তাই মনকে ঠারে ঠোরে বুঝে নিতে বলেছেন। বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাক্‌ছি। যিনিই নিগুর্ণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। নিষ্ক্রিয় বোধ কালে বলি ব্রহ্ম। আর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন

এই বোধ কালে তিনি সেই ব্রহ্মই—আদ্যাশক্তি কালী বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি। অগ্নি বললেই দাহিকা-শক্তিকে বোঝায় আর দাহিকা-শক্তি বললেই অগ্নিকে বোঝায়। একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হয়ে যায়। এই বলেই তিনি আবার বললেন, "একটি গান শোন।"

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ওগো) যেমন ভাব তেমনি লাভ মূলে সে প্রত্যয়॥
কালীপদ সুধা হ্রদে চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
তবে পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়॥"

চিত্ত তদ্‌গত হলে, তাঁকে ভালবাসলে মানুষ মরে না। বেদ তাই ভগবানকে অমৃত হ্রদ বলছে। এতে ডুবে গেলে মানুষ মরে না—অমর হয়। পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়, যদি তাঁর ওপর ভালবাসা আসে। পাখা হওয়ার জন্যে। দক্ষিণের হাওয়া আপনি এলে পাখার দরকার কি?

কি করলে ঈশ্বরকে লাভ হয়—

তুমি যেসব কর্ম করছ এসব সৎকর্ম। যদি আমি কর্তা এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে করতে ঈশ্বরের ওপর ভক্তি, ভালবাসা আসে, তবে তাহলেই এই নিষ্কাম কর্মেই ঈশ্বরকে লাভ হয়। কিন্তু এই নিষ্কাম কর্ম যতই করবে ও ভালবাসা আসবে, তখন ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। যেমন গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হলে, শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যত মাস বাড়ে, ততই কর্ম আরো কমিয়ে, দশ মাসে আর কিছু কর্ম করতে বউকে শাশুড়ী দেয় না। পাছে ছেলের কোন হানি বা প্রসবের ব্যাঘাত হয়। তাই নিষ্কাম কর্মে চিত্ত শুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা আসবে আর তাঁর কৃপা হবে। আর একটি গল্প শাশুড়ী বউয়ের মত। যেমন এক ব্রহ্মচারী কাঠুরেকে এগিয়ে যেতে বললেন। কাঠুরে এগিয়ে গিয়ে দেখলে চন্দন গাছ। তারপর সে এগিয়ে দেখলে, রূপোর খনি। আরো এগিয়ে দেখলে, সোনার খনি! তারপর

হীরে, মাণিক, তখন এই সমস্ত নিয়ে একেবারে আণ্ডিল হয়ে গেল। ব্রহ্মচারী শুধু তাকে এগোতে বলেছিলেন। চন্দন গাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নি। তাই নিষ্কাম কর্ম করলে, তাঁর ভালবাসা হয়, ক্রমে তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। সকলেই অবাক্ আর নিস্তব্ধ হয়ে, এই কথা শুনছেন। তাদের মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী যেন শ্রীরামকৃষ্ণের জিভে অবতীর্ণ হয়ে, বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ্য করে, জীবের মঙ্গলের জন্যে কথা বলছেন।

রাত্রি ন'টা বাজে,ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বিদ্যাসাগরের প্রতি বললেন, "এ যা বললুম বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন, তবে খবর নেই।"

বিদ্যাসাগরও সহাস্যে বললেন, "তা আপনি বলতে পারেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ আবার সহাস্যেই বললেন, "হ্যাঁ গো অনেক বাবু জানে না চাকর বাকরের নাম বা তাঁর বাড়ীর কোথায় কি দামী জিনিস আছে।" সকলে চুপ করে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার সহাস্যে বললেন, "একবার বাগান দেখতে যাবেন—রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।" বিদ্যাসাগর বললেন, "যাবো বইকি আপনি এলেন আর আমি যাব না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমার কাছে? ছিঃ ছিঃ।"

বিদ্যাসাগর—"সে কি, এমন কথা বললেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, আমরা জেলে ডিঙ্গি। (সকলে হেসে উঠল) খাল, বিল আবার বড় নদীতে যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে, পাছে চড়ায় লেগে যায়। এই কথায় সকলে হেসে ওঠায় বিদ্যাসাগর সহাস্য বদনে চুপ করে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, "তার মধ্যে এই সময় জাহাজ যেতে পারে।" মানে ভগবানের ইচ্ছা হলে জাহাজও যেতে পারে। এই কথায় বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতেই বললেন, "হ্যাঁ

এটি বটে।" (সকলে হেসে উঠল) মাষ্টার (স্বগতঃ) নবানুরাগে বর্ষা, নবানুরাগের সময় মান অপমান বোধ থাকে না বটে।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করলেন ভক্তদের সঙ্গে। বিদ্যাসাগর তখন আত্মীয়গণের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। ফটকের কাছে এক গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ বয়স ছত্রিশ, সাইত্রিশ হবে। মাথায় শিখেদের মত সাদা পাগড়ী, পরণে কাপড়, মোজা জামা চাদর নেই। এই লোকটি ঠাকুরকে দেখেই মাথায় পাগড়ী পরা অবস্থাতেই মাটিতে মাথা হেঁট করে প্রণাম করতে ঠাকুর বললেন, "বলরাম তুমি এত রাত্রে?" বলরাম হেসে বললে, "অনেকক্ষণ এসেছি, এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ভেতরে কেন যাওনি? বলরাম বললে, "আজ্ঞে সকলে আপনার কথাবার্ত্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা।" এই বলে বলরাম হাসতে লাগলেন।

ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে উঠেও স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কেন দাঁড়িয়ে সেখানে? ঠাকুর মূল মন্ত্র জপতে জপতে ভাবাবিষ্ট হয়েছেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু! বুঝি যাবার সময় বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যে মার কাছে প্রার্থনা করে একজন ভক্তের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। কিন্তু ফটকের কাছে আবার বলরামের কাছে থামলেন, সে নীরবে ঠাকুরের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তার প্রণাম গ্রহণ করে, তার সঙ্গে কথা কয়ে এইবার ঠাকুর গাড়ীতে উঠছেন, এমন সময় বিদ্যাসাগর আস্তে আস্তে ভাড়া দিতে চাইলে মাষ্টার বললে, "আজ্ঞে না, হয়ে গেছে।" বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। গাড়ী ঠাকুরকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে যাত্রা করল। সকলে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝি ভাবছেন এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন, আর বলছেন ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মের রূপ কেমন?—

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনায়

ব্রহ্ম সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তারপর মণিমোহনকে সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে আবার আরো শিক্ষা দেবার জন্যে বললেন, "আকাশবৎ।" ব্রহ্মের ভেতর বিকার নেই। যেমন আগুনের কোন রূপ নেই। তবে শক্তিতে তিনি বহু হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ। আগুনে যদি সাদা রং ফেলে দাও সাদা দেখবে। যদি লাল রং ফেলে দাও লাল দেখবে। কালো রং ফেলে দিলে কালোই দেখবে। সত্ত্ব, রজঃ, তম তিনগুণের অতীত। তিনি যে কি, তাঁর কেমন রূপ, এইখানে লাল, কালো, সাদা এই ভিন্ন রূপের কথা ঠাকুর বলেছেন। মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি করে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি আনন্দস্বরূপ—তিনি অপরূপ।

আনন্দময় ব্রহ্মের গল্প—

একটি মেয়ের স্বামী এসেছে। সে অন্য সমবয়সী ছোক্‌রাদের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে আছে। এদিকে ঐ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। সমবয়স্কারা বরটিকে চেনে না—তাই তারা ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে। ঐটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে, না। আর একজনকে দেখিয়ে, ঐটি কি তোর বর? সে আবার হেসে বলছে, না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে, ঐটি তোর বর? তখন সে হাঁও বললে না, নাও বললে না। কেবল একটু ফিক্ করে হেসে, চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝলে, যে ঐটিই তার আসল স্বামী। যেখানে ব্রহ্ম-জ্ঞান সেখানে চুপ।

ঈশ্বর লাভের উপায় কি?—

মণিমোহন নানা প্রশ্নের পর শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ্ঞে ঈশ্বর মানে কি? আর ঈশ্বরদর্শন কাকে বলে? আর কেমন করে হয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তাঁকে লাভ করতে হলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, মধুর, বাৎসল্য। শান্তভাব—ঋষিদের।

দাস্যভাব—হনুমানের। সখ্যভাব—বন্ধুদের, যেমন শ্রীদামাদি। বাৎসল্যভাব—যেমন যশোদার আর মধুরভাব—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধ্যে মধুরভাব। এ ভাবের ভেতর সকল ভাবই আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।"

মণি জিজ্ঞাসা করলেন, "ঈশ্বরদর্শন কি এই চক্ষে হয়?" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়। তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। তাই সেই চক্ষে তাঁকে দেখা যায়, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়, আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়।"

এই কথায় মণি আবার গম্ভীর হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা হলে, তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। তখন আবার তিনিই আমি এই বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হলে বলে, আমিই কালী।"

ঈশ্বরদর্শনে সাধন ও শান্তি—

দক্ষিণেশ্বরে সহাস্য-বদনে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বললেন, "আর দু' একবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেখা দরকার। চাল-চিত্র একবার মোটামুটি শুধু এঁকে নিয়ে, তারপর বসে রঙ ফলানো। প্রতিমা তৈরীর জন্যে, প্রথমে এক মেটে, তারপর দু' মেটে, তারপর খড়ি রং পরের পর করতে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা আছে। কতকগুলি সৎকাজ করেছে। কিন্তু অন্তরে কি আছে জানে না। অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন, এই কথা জানতে পারলে, সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছে হয়। ঈশ্বরকে জানতে হলে, একটু সাধন চাই।"

মাষ্টার বললেন, "সাধন কি বরাবর করতে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, "প্রথমে একটু উঠে পড়ে করতে হয়, তারপর আর বেশী করতে হয় না। যতক্ষণ ঝড় তুফান আর নদীতে বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়। বাঁক পার হয়ে, অনুকূল হাওয়া হলে আর না।

মাঝি হালে হাত ঠেকিয়ে রাখে। তারপর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত করে, তামাক সাজতে থাকে। কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়-তুফান কাটিয়ে গেলেই তখন শান্তি।

যোগী কাকে বলে ও যোগের অবস্থা কি ?—

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মাষ্টারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন আবার কখনও কখনও বারান্দায় বেড়াচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদের সাবধান হওয়া উচিত। ঠিক সেই সময় অনেক বাধা বিঘ্ন আসে—কামিনী-কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগী যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে।" কিন্তু কেন এমন হয় এই প্রশ্ন মনে হতে পারে। তাই ঠাকুর বললেন, "হয়তো ভোগের বাসনা ছিল। তাই সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জান ?"

মাষ্টার বললে, "আজ্ঞে না দেখিনি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "বাঁশ নুইয়ে, তাতে বঁড়শি লাগানো দড়ি পরিয়ে, বঁড়শিতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ খায় অমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে যায়। নিক্তির একদিকে ভার পড়লে তার কাঁটা ওপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না। নীচের কাঁটাটি মন—ওপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নীচের কাঁটাটি ওপরের কাঁটার সঙ্গে এক হওয়ার নাম যোগ। মনস্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া, মনরূপ দীপকে সর্ব্বদা চঞ্চল করছে। কিন্তু যদি দীপটা আদপে না নড়ে, তা হলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়।

কামিনী-কাঞ্চনে কেন ভালবাসা—

কামিনী-কাঞ্চন যোগের ব্যাঘাত। তাই বস্তু-বিচার করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, মেয়েমানুষের শরীর রক্ত, মাংস, নাড়ী, ভুঁড়ি, কৃমি, মূত, বিষ্ঠায় ভরা, তবে সেই শরীরের ওপর ভালবাসা কেন ?

রাজসিক ভাব ও যোগীর মন—

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে রাজসিক ভাবের আরোপ নিজের ওপর করে, সাচ্চা-জরীর কাজ করা পোষাক আঙ্‌টি পরে, তারপর সেগুলি খুলে

ফেলে দিলেন। কারণ তিনি বললেন, "মন এরই নাম শাল এরই নাম আঙটি—ভাল লাগল না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "যোগীর মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরে থাকে সর্ব্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফ্যাল, দেখলেই বোঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে সব মনটা ডিমের দিকে, ওপরে ওপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা আমায় তুমি সেই ছবি দেখাতে পার?"

মণি বলল, "যে আজ্ঞা আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বিদ্যাসাগর—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে নিজেকে ধরা দিলেন। নানা জ্ঞানের কথা আলোচনা হল। বিদ্যাসাগর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠাকুর কেমন পরমহংস। তা এখন বেশ বুঝতে পারলেন। তিনি বয়সে বড় আর লেখা পড়া শিখে নানা শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়েও, যিনি কখন কোন বিশেষ লেখা পড়াই শেখেন নি, এমন একজন পূজারী ব্রাহ্মণকে স্বীকার করলেন, তিনি অসাধারণ, অসামান্য জ্ঞানী—যাঁর তুলনা শুধু তিনি। তাই ঠাকুরের কথামত বিদ্যাসাগর দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিজে যেতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তাঁর কাছে নানা জ্ঞানের কথা, নানা উপদেশের কথা শুনে, মনে হয় তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন—

ঠাকুর আটত্রিশ বছর বয়সে ১২৮০ সালে ফলহারিণী কালী পূজার দিন ষোড়শীপূজা করে, তাঁর অর্জিত সমস্ত কিছু মার পাদ-পদ্মে নিবেদন করেন ও মানব-কল্যাণের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেকে বিস্তার করেন।

এই বিস্তারের প্রথম দিকেই সাক্ষাৎ হল কেশবচন্দ্রের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের পরম ভক্ত। মা কালীতে ইনি মন সমর্পণ করে বসে আছেন। তাই এঁকে কেউ বলে পাগল, কেউ বলে বায়ুরোগাক্রান্ত, কিন্তু তিনি যে নরকুলে অবতাররূপে অবতীর্ণ

মহাপুরুষ তার পরিচয় ক্রমে ছোট বড় সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কেশবচন্দ্র প্রথম দর্শনেই তাঁর ভেতর দেখলেন, আগুন বা জ্যোতি। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা তাঁর বাংলা পত্রিকা সুসমাচার আর ইংরাজীতে ইণ্ডিয়ান মীরার পত্রিকায় ছড়াতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সারা ভারতের বুকে দেখতে দেখতে হুহু করে ছড়িয়ে পড়ল। ঠাকুরের নানা বিচিত্র কাহিনী পাঠ করে, আর তাঁর সামান্যের ভেতর অসামান্য অথচ সহজ সরল ভাষায় মধুর কথা শুনে, পদধূলি গ্রহণ করে ধন্য হতে, দলে দলে লোকজন ছুটে আসতে লাগল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী—

ঠাকুরের সঙ্গে কেশব সেনের প্রথম সাক্ষাতের কিছুদিন পরে, তিনি ঠাকুরের প্রভাবে পরিচালিত হয়ে বিদেশী অসার চিন্তা ছেড়ে দিলেন। তাঁর পরিচালিত ব্রহ্মদল স্বদেশীয়ানায় মোহমুক্ত হয়ে, নববিধান নামে নতুন ভাবে প্রচারিত হল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তিনি ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হবার পর ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে, যে পথ পেলেন সেই পথেই তাঁর সিদ্ধি লাভ ঘটল। পরে অনেকেই তাঁর অনুসরণ করলেন। ক্ষীণ কলেবর দলের প্রধান হয়ে, শিবনাথ শাস্ত্রী এই জন্যে দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত বন্ধ করলেন।

সংসারী হয়েও দু'জন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ও ক্রমে ক্রমে ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি—

সংসারী রামচন্দ্র দত্ত ও মনমোহন মিত্র ঠাকুরের পরম ভক্ত হলেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তিনিও ঠাকুরের পরম ভক্ত। ইনিই ঠাকুরের কথামৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

ক্রমে ক্রমে একটির পর একটি ভক্তের সংখ্যা এইভাবে বেড়েই চললো। যোগীন্দ্রনাথ নামে একটি ছোট ছেলে ঠাকুরের পরম ভক্ত হল। ইনিই শেষে হলেন স্বামী যোগানন্দ। কলকাতার রামচন্দ্র

দত্তের বাড়ীতে লটু কাজ করত। ঠাকুরকে তার দেখতে ইচ্ছা হয় ও সে পায়ে হেঁটে ঠাকুরের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। ঠাকুর তাকে জায়গা দিলেন, লেখাপড়াও শেখাতে চাইলেন কিন্তু তার লেখাপড়া হল না। লটুকে ঠাকুর লেঠো বলতেন। এই প্রিয় লটু বা লেঠোই ঠাকুরের কৃপায় পরে হলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ। ছোট বড় সকলে তাঁকে কিন্তু জানত 'লাটু' মহারাজ বলেই।

ঠাকুর মেয়েদের দেখতেন ভক্তির চোখে ঠিক মায়ের মত। তাই এখন তাঁর নারী-ভক্তের সংখ্যাও হল প্রচুর। ধনী, নির্ধন, গুণী, নির্গুণ, নাস্তিক, আস্তিক সমস্ত রকমেরই লোক তাঁর ভক্ত হল। সকলকেই তিনি প্রেম দিলেন। ছোট বড় ভেদাভেদ তাঁর না থাকায় সকলেই হলেন সোনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি ভাঙ্গার পর যেন পাঁচ বছরের ছেলে—

মহেন্দ্র গুপ্তের কথামৃত থেকে জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি ভাঙ্গার পর, তিনি যেন কোন ভাবরাজ্যে বিচরণ করতেন। এই সময় তাঁর অবস্থা হয়ে যেত যেন ঠিক পাঁচ বছরের ছেলে। সর্ব্বদাই মুখে মা মা!

ঠাকুরের যখন এই অবস্থা তখন তাঁর কাছে রাম ও মণিমোহন এলেন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে। কেদার, সুরেন্দ্র, চুনী, লাটু, নৃত্য-গোপাল, তারক, নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বাবুরাম, বলরাম, নিরঞ্জন, মাষ্টার, কিশোরী, অধর, নিতাই, ছোট গোপাল। বেলঘরের—তারক, শরৎ, শশী সান্যাল, গদাধর, কালী, গিরিশ, দেবেন্দ্র, শারদ, কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ ও হরি। ১৮৮৫ মধ্যে হরমোহন, যজ্ঞেশ্বর হাজরা, ক্ষীরোদ। কৃষ্ণনগরের—যোগীন, মনীন্দ্র, ভূপতি, অক্ষয়, নৃত্যগোপাল। বেলঘরের—গোবিন্দ, আশু, গিরীন্দ্র, অতুল, দুর্গাচরণ সুরেশ, প্রাণকৃষ্ণ নবাই, চৈতন্য ইত্যাদি। এছাড়াও শশধর পণ্ডিত, বঙ্কিম চাটুজ্যে, আমেরিকার কুক সাহেব, মাইকেল মধুসূদন, কৃষ্ণদাস, দুর্গাচরণ ভাণ্ডারী, রাধিকা গোস্বামী, শিশির, কেশব আরো কত ভক্ত মেয়ে পুরুষ এলেন। এখন মাদ্রাজ, লঙ্কাদ্বীপ, উত্তর

পশ্চিম রাজপুতানা, কুমাউন, নেপাল, বোম্বাই, পাঞ্জাব, জাপান, আবার আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে ভক্ত-পরিবার ছড়িয়ে পড়েছে।

মথুরমোহনের শেষ আশার সফলতা—

শ্রীরামকৃষ্ণকে কিন্তু মথুরবাবু শেষ রোগশয্যায় বলেছিলেন, "আচ্ছা বাবা তুমি যে বলেছিলে, তোমার অনেক ভক্ত আসবে, কই তারা তো আজও এল না?" শ্রীরামকৃষ্ণ এই শুনে বলেছিলেন, "কি জানি কত দিনে সব আসবে। মা যত কিছু দেখিয়েছেন, সবই ফলেছে, শুধু এইটাই বুঝি ফললো না।"

ভক্তের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে একেবারে নিরাশ করলেন না। তিনি 'বুঝি' শব্দটি ব্যবহার করে জানালেন, বোধ হয় ভক্তের দল এল না। কিন্তু মা তাঁকে যা দেখিয়েছেন, তা ফলেছে! এরপর দেখতে দেখতে, কিন্তু দিনের পর দিন তাঁর নাম জগতের বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কত শত পুরুষ ও নারী, দল বেঁধে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে এল। দক্ষিণেশ্বরে সকাল সন্ধ্যা দিনরাত সমস্ত সময় লোকের ভিড় হতে লাগল, এ ভিড় আর কমল না।

ঠাকুরের আসল পুত্র ব্রহ্মানন্দ—

রাখাল বড় লোকের ছেলে। তিনি সংসার ত্যাগ করে ঠাকুরের কাছে এলেন। ঠাকুর তাঁকে পেয়ে খুব আনন্দ পেলেন। রাখাল ঠাকুরের স্নেহের পাত্র হলেন। সত্যিই রাখাল স্নেহের পাত্র হওয়ায়, তাঁর সঙ্গে চললো খেলা, পূজা, সমস্ত কিছু। শেষে এই রাখাল হলেন ঠাকুরের আসল পুত্র এবং তিনিই পরে হলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ রাখাল মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে সকলেই হলেন সোনা—

শ্রীরামকৃষ্ণ যা দেখেছেন তা কি মিথ্যে হতে পারে? না, তা হতে পারে না।

ভক্তের এই যে একে একে আগমন, এ তো তিনি জানতেন। তাই তাদের আশা পথ চেয়ে বসেছিলেন। তারপর তারা যখন একে

একে আসতে লাগলেন, তখন তিনিও তাদের সকলকে ঠাঁই দিলেন—সকলেই তাঁর পাদস্পর্শে হলেন সোনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যা ইচ্ছা করেছেন, তাই পেয়েছেন—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন—একবার তিনি শ্বশুরবাড়ী গিয়েছেন। সেখানে এক আসরে বহু লোকের সংকীর্ত্তন হচ্ছে। এমন সময় তাঁর মনে হল, এ সব কি মা! এ সব কি সত্যি? যদি এই সমস্ত সত্যি হয় তবে দেশের জমিদার কেন আসবে না? তাঁর এই ইচ্ছার পরই জমিদার এসে গেলেন। আবার গায়ে পড়ে আদর করে ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ওরে হৃদে, একটা সুন্দরী ধরে নিয়ে আয়!"—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাসনা হল। তিনি বললেন, "ওরে হৃদে, একটি সুন্দরী ধরে নিয়ে আয়!" তাঁর কথা শুনে হৃদয় অবাক্ হয়ে গেল। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ওরে নিয়ে আয়, আমি পূজো করব।" হৃদয় চৌদ্দ বছরের এক সুন্দরী সধবা কন্যা যোগাড় করলে, কোন বাড়ীর বউ বা মেয়ে হবে। তাকে রামকৃষ্ণ পূজা করলেন ভগবতী জ্ঞানে, তারপর প্রণাম করে বললেন, "ওরে তোরা কেউ মাকে প্রণামীর টাকা এনে দে!" তবুও তৃপ্তি নেই। তিনি কাছে যে কুমারী মেয়েই পান, তাকে ধরে পূজো করেন। সে যতই অকুলীন অপরিচ্ছন্ন হোক, শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর প্রকাশ বেশী। শ্রীরামকৃষ্ণের হঠাৎ মনে হল, মহাদেবের অংশে যার জন্ম সে আসবে—সে আসবে। কিন্তু সে এল না কেন? তাই তাঁকে নিজের কাছে পাবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণের হঠাৎ আবার ইচ্ছা হল।

বারবারই শ্রীরামকৃষ্ণের বাসনা সফল—

বড় লোক বলতে পারা যায় মধ্য কলকাতায় সিমলা অঞ্চলের দত্তবাবুদের। বিদ্যায় আর দয়ায় বড় লোক আখ্যা সত্যই দেওয়া যায়। বাবুদের আদব-কায়দা সমস্তই বিলেতী ধরণের, নরেন্দ্রনাথ হচ্ছে, এই বাড়ীরই একটি ছেলের নাম। পাশ্চাত্ত্যভাবেই পুরোপুরি

গড়ে উঠেছেন। তবে তাঁর এ ছাড়াও একটা বিশেষ গুণ আছে। গলাটা খুব মিষ্টি, চমৎকার গান গাইতে পারেন। একদিন গদাধর-ঠাকুর তাঁর এক ভক্তের বাড়ী গেছেন। এই বাড়ী নরেনদের পাড়ার মিত্রবাড়ী। পাড়ার লোকে নরেনকে গান শোনাবার জন্যে ডেকে আনলে। ঠাকুরকে নরেন গান শোনালে।

গদাধরঠাকুর বা শ্রীরামকৃষ্ণ তার গান শুনে, তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পরিচয় হয়ে গেল তাঁদের দুজনের মধ্যে। ঠাকুর যেন এতদিন তাঁরই আসাব আশা-পথ চেয়েছিলেন। অনেক কাজ, অনেক কিছু করতে হবে—তাই তার এত দেরী কেন? এই কথাই তাঁর মাথার মাঝে ফুটে উঠল।

গদাধর এই সপ্রতিভ যুবকের মধ্যে বোধ হয় অস্বাভাবিক কিছু পেলেন।

তিনি লক্ষ্য করলেন, এই সপ্রতিভ যুবকের লজ্জা-সরম, ভয়-ডর যেন কিছুই নেই। স্পষ্ট কথা অদ্ভুত তেজস্বী ভাব।

ঈশ্বর সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, "মুখে তুমি মা মা কর ভগবানকে দেখেছ তুমি?"

নরেনের দিকে সিদ্ধপুরুষ ঠাকুর স্নেহ-করুণার দৃষ্টি মেলে খুব মিষ্টি করে বললেন, "দেখেছি বৈকি, যারা দেখতে চায়, তারা দেখতে পায়। তাঁর সঙ্গে খেলা করা যায়, কথা কওয়া যায়।" নরেনের মুখে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, তিনি বললেন, "ঈশ্বরকে দেখা যায়, কোথায় সে?"

ঠাকুর তার উত্তরে বলেন, "নীচে, উপরে, দক্ষিণে, উত্তরে, ভিতরে, বাইরে—যুবক সকলে তো তাঁকে দেখতে চায় না, তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও?"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, তাঁর ওপর নরেন্দ্রনাথের সামান্য একটু শ্রদ্ধা—

যুবক একটু আশ্চর্য্য বোধ করলেন! ঠাকুরের কথা শুনে, তার

মনে হল, তিনি অনেককে এই প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু এই রকম উত্তর শোনেন নি, তাই ঠাকুরের ওপর তার একটু শ্রদ্ধা দেখা গেল।

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ ও নগদ বিদায়ের সাধু হাজরা—

প্রতাপ হাজরা নামে একজন নগদ বিদায়ের সাধু দক্ষিণেশ্বরে আস্তানা গেড়েছে। ইনি জপ, তপ করেন। কিছু মুনাফা হবে, সংসারের অবস্থা ফিরবে। তা না হলে কি হবে পূজা অর্চ্চনায়? গদাধরঠাকুর সকলকে সাবধান করতেন, যে হাজরার কথা কেউ শুনবে না।

নরেন খুব ভাব দিয়ে ঠাকুরকে তাঁর ফরমায়েস মত গান গেয়ে শোনায়—"যো কুছ হ্যায়, সো তুহি হ্যায়" এই গান সে ঠাকুরকে শোনায় বটে কিন্তু হাজরার কথা তার মন্দ লাগে না। তাই তার সঙ্গেও মেলা মেশা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুই সেই!—

কথায় কথায় ঠাকুর নরেনকে বলেন, "ঈশ্বরকে জানতে চেয়েছিস—সহজ করে শুনতে চাইছিস—তবে শোন 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুই-ই সেই।" ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্র ও হাজরার ব্যঙ্গ!—

নরেন বারান্দায় এসে হাজরাকে বললেন, "অসম্ভব কথা! এ কখন হতেই পারে না!" হাজরা কটাক্ষ করলে—"কি বলে?" নরেন বলেন, "ঘটি, বাটি সমস্তই ঈশ্বর। এ মন্দ কি? আমি, আপনি, আমরাও না কি"…হাজরা হাসির রোল তুলে বললে, "পাগল আর কাকে বলে।" এই ব্যঙ্গ-হাসিতে নরেনও যোগ দিলে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর ও সমাধি—

এই কথা শুনেই ঠাকুরের ভাবান্তর হল। তিনি বালকের মতন হয়ে গেলেন। পরণের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, "কি বলছিস রে নরেন?" এই কথা বলে, তিনি হাসতে হাসতে নরেনকে ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

এ কি! নরেনের এ কি হল?

নরেন্দ্রনাথের এ কি হল !—

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে ছুঁয়ে দিতেই, নরেন্দ্রের কি যে হল, তা কে বলবে, চোখের সুমুখ থেকে তার একটা পর্দা উঠে গেল। নিচের দুই চোখ বুজে গিয়ে, জেগে উঠল ললাটে জ্ঞানের ত্রিনয়ন। চেয়ে দেখলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই! আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত সমস্ত কিছু ঈশ্বর। ঘোর লেগেছে ভেবে, নরেন চোখ বুজলে। কিন্তু চোখ বুজিয়ে অন্ধকারেও সেই ঈশ্বর। নরেন বাড়ি ফিরে গেল। বাড়ীতেও সেই একই ভাব। খেতে বসে মনে হল, জল, বাটি, ভাত, ডাল, সমস্ত কিছুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। পরিবেশন যিনি করছেন আর যিনি খাচ্ছেন, দুজনেই ঈশ্বর। চুপ করে বসে রইল। মা বললেন, "চুপ করে কেন? খা, নরেন।" মায়ের কথায় নরেন খেতে শুরু করলে। কিন্তু যে খাচ্ছে সে কে? আর যাকে খাচ্ছে তাই বা কে? ভোর হয়ে গেল—রাস্তায় বেরিয়েও ঘোর গেল না, সেই বিচিত্র অনুভূতি!

নরেন্দ্রনাথের আকুলতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত—

নরেন বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে হেদোর ধারে লোহার রেলিংয়ে মাথা ঠুকছে—নরেন বলে, "তুই কে? তুই কি ঈশ্বর?" গাড়ী প্রায় তার কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু তার মনে হয়েছে, গাড়ীও যা সেও তাই। দুই-ই, ঈশ্বরপূর্ণ। তাই রেলিংয়ে মাথা ঠুকে জানতে চায় সে কে? সেই কি ঈশ্বর? নরেন আকুল হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল, আমি কি পথে দাঁড়িয়ে রাজা দেখব—আমি কি তাঁকে আমার মধ্যে টেনে আনতে পারবে?

নরেনের আকুলতা দূর হল। তার মনে হতে লাগল, নিত্যেও যিনি লীলাতেও তিনি—সমস্তই একাকার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা এল—ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন, তাঁর পরম ভক্ত।

পিতার লোকান্তরে অসহায় নরেন্দ্রনাথ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এটর্নি

ছিলেন। কিন্তু দুস্থ আত্মীয় পালন করে, তিনি নিঃস্ব অবস্থায় হঠাৎ একদিন ছোট ছোট ছেলে, স্ত্রী রেখে মারা গেলেন। নরেনের সৌভাগ্যের আলো নিভে গেল। সে বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছে। কত আশা মনে। কিন্তু তার মা, ছোট ছোট ভাই, এদের খাওয়াবে কি? ওরা যে এখন তাঁর মুখের পানেই চেয়ে আছে। তাঁর বাবা রোজগার করেছেন। কিন্তু রেখে যান নি, বরং রেখে গেছেন তাঁর ওপর ঋণের বোঝা। কেউ নেই সাহায্য করবার। নরেন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন, কি করে কি করবেন, এই ভেবে।

দারুণ দুর্দ্দশায় বেকার নরেন্দ্রনাথ—

এখন নরেন্দ্রের পায়ে জুতা নেই, গায়ে একটা আস্ত জামা নেই। এ দরজা থেকে ও দরজা, এ অফিস থেকে ও অফিস, ঘুরে বেড়াতে লাগল শুধু একটা চাকরীর জন্যে। সমস্ত জায়গাতে হবে না, জায়গা নেই। মাথা ঠুকে নিজেই শুধু আঘাত পায়। নৈরাশ্যের অন্ধকার তাকে ক্রমে ক্রমে ঘিরে ফেলে। বন্ধুরা তার কথায় কান দেয় না। ঠাকুরও নরেনের জন্যে বহু পরিচিত লোককে বলেন, কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয় না। নরেন দুঃখে কষ্টে পড়েও মায়ের নাম গান করেন :—

"সব দুঃখ দূর করলে দরশ দিয়ে,
সপ্ত লোক ভোলে শোক তোমারে পাইয়ে।"

নরেনের মুখে এই গান শুনে ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল।

ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা মাতা ভুবনেশ্বরীর বস্ত্র-প্রার্থনা—

পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে, মাতা ভুবনেশ্বরী ছেলের সুমুখে ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পেলেন। তাঁর পরণে পূজার চেলিখানি শত ছিন্ন হয়ে গেছে। হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কয়েকটি কথা, "নরেন আমায় একটি চেলি কিনে দিতে পারিস?"

কোথায় পাবে নরেন মায়ের চেলি কেনার টাকা?

সে ত বেকার, তাই ম্লানমুখে মায়ের সুমুখ থেকে চলে গেল, মায়ের কথার জবাব দিতে পারলে না একটিও।

শ্রীরামকৃষ্ণকে মাড়োয়ারীর বস্ত্র, মিছরি প্রদান—

সেইদিনই বিকানীর থেকে এক মাড়োয়ারী একটি মিশ্রির বা মিছরির থালা ও তার ওপর একটি গরদের কাপড় রেখে, ঠাকুরকে দেওয়ায়, তিনি খুব আনন্দ করলেন। মাড়োয়ারীও কাপড় সহ মিছরির থালা নামিয়ে রেখে প্রণাম করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দান ও তেজস্বী নরেন্দ্রের প্রত্যাখ্যান—

দুদিন পরে নরেন দক্ষিণেশ্বরে এলে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিছরি ও গরদের কাপড় তাঁকে দিতে, তিনি হেসে বললেন, "নেংটি নেই, দরবারে যেতে চায়। ছোট ছেলেকে মিছরি দিয়ে ভোলাবেন। আমি মিছরি কি করব ?"

ঠাকুর বললেন, "এই গরদখানা মাকে গিয়ে দে, তাঁর আহ্নিকের কাপড় চেলি ছিঁড়ে গেছে।"

নরেন ঠাকুরের কথা শুনে চমকে উঠে বললেন, "তা আপনি জানলেন কি করে ?"

—"ওরে আমি জানতে পারি. আমার কানে এসে লাগে। শোন্ নিয়ে যা, তোর নিজের জন্যে নয়, তোর মায়ের জন্যে।"

নরেন বললে, "মার জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষে করব কেন ?"

"ভিক্ষে!" এই কথায় অবাক্ হয়ে ঠাকুর তাঁকে প্রশ্ন করলেন।

—"তা ছাড়া কি ? মা আমার কাছে চেয়েছেন। যখন উপার্জ্জন করতে পারব, তখন কিনে দেব। আপনার কাছে ভিক্ষে করতে যাব কেন ?"

ঠাকুর প্রসন্ন মুখে নরেনের তেজ দেখে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "এই না হলে নরেন, আমরা নর আর তুই ইন্দ্র।"

নরেন চলে গেলে, ঠাকুর তার অসাক্ষাতে রামলালকে ডেকে মিছরি, কাপড় ভুবনেশ্বরীর কাছে পৌঁছে দিতে বললেন। ঠাকুরের আদেশ মত কাপড় পৌঁছে গেল। ভুবনেশ্বরী অবাক্ হয়ে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অহং ও অভিমানশূন্য, ঠাকুর আনন্দময় !—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন বা বিবেকানন্দকে গরদের কাপড় আর

মিছরি দিতে গিয়ে তার কাছ থেকে অনেক কথা শুনলেন, যা অপরে শুনলে তার রাগ হত বা অভিমান হত। কিন্তু ঠাকুরের তো অহং নেই—অভিমান নেই—ক্রোধও, একটুও নেই। ঠাকুর আনন্দময়! তাই এত কথা শুনেও, তিনি প্রসন্ন মুখে হাসতে লাগলেন। তিনি শুধু উপদেশ মুখে দিতেন না, কাজে সেইগুলো করতেন। তাই তাঁর ক্রোধ নেই—অপমান, মান-অভিমান কিছুই নেই। অহং ভাব এলেই এগুলো আসবে। তাই তাঁর কোন কিছু নেই। আছে শুধু আনন্দ! কিন্তু তাঁর এই আনন্দ ব্রহ্মানন্দ। ঠাকুর এক পণ্ডিতের সঙ্গে কথা কইতে কইতে তাঁকে বললেন, "আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ।" বিষয়ানন্দ হচ্ছে কামিনী-কাঞ্চনের আনন্দ। ঈশ্বরের গুণগান, ভজনানন্দ আর ভগবানের দর্শনে কেবল যে আনন্দ, তারই নাম ব্রহ্মানন্দ। এই রকম নানা প্রশ্ন ও তার উত্তর দিয়ে বোঝাতে বোঝাতে তিনি কেশব সেনকে যা বলেছিলেন, তা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, যে "আমি ত্যাগ না করলে হবে না। এই 'অহং' মানেই আমি। এই নিয়েই যত কিছু।" তাই কেশব সেন ঠাকুরকে বললেন, "তাহলে মশাই টল্ টল্ থাকে না!" তখন তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কাঁচা আমি—বজ্জাত আমি—ত্যাগ করতে বলছি। কিন্তু পাকা আমি—বালকের আমি—ঈশ্বরের দাস আমি—বিদ্যায় আমি এতে দোষ নেই।" তারপর তিনি আবার বললেন।

"সংসারীর আমি, কাঁচা আমি, একটা মোটা লাঠির মত। সচ্চিদানন্দ সাগরের জল ঐ লাঠি যেন দুই ভাগ করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের দাস আমি—বালকের আমি জলের ওপর রেখার মত। জলের ওপর যেন একটি রেখা দেখা যাচ্ছে, এই রেখার দুইদিকে জল। বস্তুতঃ এক জলই দেখা যাচ্ছে। শঙ্করাচার্য, 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য।"

আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, আনন্দ কেমন ?—

ঠাকুর বলছেন, কামিনী-কাঞ্চনের মায়া—এর ভেতর অনেক

দিন থাকলে, হুঁশ চলে যায়। মনে (আনন্দ) হয়, বেশ আছি। মেথরের গুয়ের ভাঁড় বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে বললেন, "কামিনী-কাঞ্চনের এই মায়া সরিয়ে যে তাঁকে দেখতে চায়, সেই তাঁকে দেখতে পায়। যেমন একজন একটি পানায় ঢাকা পুকুরের পানা সরিয়ে, স্ফটিকের মত জল দেখতে পেয়ে, সে তাই পান করলে। সচ্চিদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা, যে সরিয়ে জল খায়, সেই পায়।"

ঠাকুর আবার বলছেন, "একবার দেখি বরষায় যেমন পৃথিবী জরে থাকে—সেই রকম এই চৈতন্য জগত জরে রয়েছে। কিন্তু এত তো দেখা হচ্ছে কিন্তু আমার কোন অভিমান হয় না।" ঠাকুরের কথায় মণি হেসে বললে, "আপনার আবার অভিমান!"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির কথায় তখুনি বললেন, "মাইরি বলছি আমার অভিমান হয় না।"

মণি গ্রীসের এক জ্ঞানী লোকের কথা এখানে উল্লেখ করলেন। তিনি মানে জ্ঞানী বলেছিলেন, লোকে বলে তাঁর জ্ঞান হয়েছে কিন্তু তিনি বলেন, তিনি কিছু জানেন না—লোকগুলোই অজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনে বললেন, "আমি কি জানি, যে এত লোক আমার কাছে আসে!"

মণি বললে, "আপনার সব কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যায় আপনি বলেছিলেন, গীতা গীতা বলতে বলতে ত্যাগী ত্যাগী হয়ে যায়।"

নবদ্বীপ গোস্বামী বলেন, "তাগী মানেও যা, ত্যাগী মানেও তাই।" তগ্ ধাতু একটা আছে আর তাই থেকেই ত্যাগী হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এখন আবার বলেন, "আমার সঙ্গে কি কোন সাধু বা পণ্ডিতের মেলে?" পরে তিনি এই এত ধাতুরূপটুপ (ব্যাকরণের আইন*) থেকে সরে এসে বলেন, "সত্যতে থাকবে তা হলেই ঈশ্বর লাভ হবে—হাঁ এটি কিন্তু আন্তরিক বলতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরের কি পরিচয় এবং ধর্ম কি ও কেমন ?—

খিলাৎবাবুর বাড়ীতে ঠাকুর বললেন, "আমার ধর্ম ঠিক ও অপরের ধর্ম ভুল এ ভাল নয়। ঈশ্বর এক বৈ দুই নয়। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ডাকে, কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্মা। পুকুরের জলকে কেউ বলে ওয়াটার, কেউ বলে পানি—কিন্তু বস্তু এক।"

ভক্ত বলতে কি বোঝায় ও ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ কি—

এক বৈষ্ণব বললেন, "মশাই ঈশ্বরকে ভাবই বা কেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষার জন্যে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, "জীবন্মুক্ত কে? উত্তম ভক্ত কে? ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ কি? এই সমস্ত বোধ যদি থাকে, তবে সে জীবন্মুক্ত। কিন্তু সকলের এটি বিশ্বাস নেই, মুখে কেবল বলে। ঈশ্বর আছে, তাঁর ইচ্ছায় সমস্ত হচ্ছে, বিষয়ীরা শুনে রাখে, বিশ্বাস করে না। আবার ভক্তের থাক্ থাক্ আছে। উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, অধম ভক্ত। গীতায় এসব আছে। ভগবানকে যে বিশ্বাস করে সেই ভক্ত। কিন্তু এই বিশ্বাস কার কেমন আর তারই নানাপ্রকার মতের জন্যেই, নানা থাক্ থাক্ হয়ে উঁচু, মাঝামাঝি ও নীচু ভক্ত বলে স্থির হয়েছে। উত্তম ভক্ত বলেন, ঈশ্বর ঐ আকাশ। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে চৈতন্য-রূপে—প্রাণরূপে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বর নিজে সবকিছু হয়েছেন। তাই যা কিছু দেখি তা ঈশ্বরেরই এক একটি রূপ। তিনি মায়া, জীব জগৎ, এই সব হয়েছেন—তিনি ছাড়া কিছুই নেই।" বৈষ্ণবভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "এই রকম অবস্থা কি কারু হয়?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "তাঁকে দর্শন না করলে এইরূপ অবস্থা হয় না। কিন্তু দর্শন করলে তার লক্ষণ আছে। কখন সে উন্মাদবৎ—খুব কাঁদে, হাসে, নাচে গায়। কখন বালকবৎ—পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা। সরল, উদার, অহঙ্কার নেই। কোন জিনিসে আসক্তি নেই। কোন গুণের বশ নয় সদা আনন্দময়। কখন পিশাচবৎ—শুচি

অশুচি ভেদবুদ্ধি থাকে না। আচার অনাচার নেই। আবার কখনও বা জড়বৎ কি যেন দেখছে! তাই কোনরূপ কর্ম করতে পারে না—কোনরূপ চেষ্টা করতে পারে না।" বৈষ্ণবভক্ত ভাবলেন, ঠাকুর কি নিজের অবস্থার কথা ইঙ্গিত করছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবভক্তকে বললেন, "তুমি আর তোমরা জ্ঞান আমি আর আমরা অজ্ঞান। যে জ্ঞান সে বলে, ঈশ্বর সেথায়—অনেক দূরে। কিন্তু যে জ্ঞানী, সে জানে ঈশ্বর হেথায় হোথায়—অতি নিকটে, হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে!"

শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্র সম্পর্কে প্রশ্ন—

ঠাকুর নরেন্দ্রকে খুব ভালবাসেন, তবু হেসে মণিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা নরেন্দ্র কেমন?" মণি ঠাকুরের প্রশ্নে বললে, "আজ্ঞে খুব ভাল।" শ্রীরামকৃষ্ণ মণির কথায় খুব খুশী হয়ে বললেন, "দেখ. যেমন বিদ্বে, তেমনি বুদ্ধি, আবার গাইতে বাজাতে জানে।"

ঈশ্বর প্রকৃত কি ও পাপ-পুণ্য কি?—

মণি ঠাকুরকে বললে, "আপনি বলছেন, যে পাপ করে, সেই পাপী হয়ে যায় আর উঠতে পারে না—আমি ঈশ্বরের ছেলে, এ বিশ্বাস থাকলে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মণির এই প্রশ্নে বললেন, "হ্যাঁ বিশ্বাস থাকা চাই!" তারপর মণি বললে, আমায় তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে শেষে সার কথা বললেন, "ঈশ্বরই বস্তু, আর সমস্ত (যা কিছু দেখা যায়) অবস্তু।"

এর পর ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একটি ত্রিশ বছরের যুবক এনট্রান্স ও এফ, এ, পরীক্ষায় যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল, সেই যুবকটির নাম শ্রীশ। সে এখন এম, এ, বি, এল, পাশ করে ওকালতি করছে। এর পরিচয় মণি ঠাকুরকে দিলে, তিনি শ্রীশ কি করেন জিজ্ঞাসা করে বলেন, "এমন লোকও ওকালতি করে?" তারপর বলেন, "তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?" বলে তিনি নিজেই বলেন, "সংসারে আসক্ত হয়ে থাকা কেমন?"

শ্রীশ—"কিন্তু কাজের গতিকে সংসারে অন্যায় কত করতে হয়। কেউ পাপ করছে, কেউ করছে পুণ্যকাজ।" এসব কি আগের কর্মের ফল তাই করতেই হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "যতদিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে লাভ হলে সব যায়। তখন পাপপুণ্যের পার হয়ে যায়।"

'ফুল দেখা যায় ফল হবার জন্য।' "সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন? যতদিন ঈশ্বরের নাম করতে করতে রোমাঞ্চ আর চোখে জল না আসে। এ সকল অবস্থা ঈশ্বর লাভের লক্ষণ। ঈশ্বর শুদ্ধা-ভক্তি লাভের কারণ। তাঁকে জানলে পাপ পার হয়।"

"প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয় মাথায় রেখেছি,
আমি কালী ব্রহ্ম, জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

তিনি গানের শেষে বললেন, "তাঁর দিকে যত এগুবে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দেবেন। সুকর্মে সুফল, কুকর্মে কুফলই ফলে তাই।"

অভ্যাস যোগ কি ?—

শ্রীশ বললে, "সংসারে থাকতে থাকতে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কেন অভ্যাস যোগ—যেমন ছুতোরের মেয়েরা চিড়ে বেচে আর কত দিক সামলে কাজ করে শোন। ঢেঁকির পাট পড়ছে, হাতে ধান টেনে দিচ্ছে আর এক হাতে ছেলেকে কোলে করে মাই দিচ্ছে। আবার খদ্দেরের সঙ্গে দামের হিসেব করে কথা বলছে। এরই নাম অভ্যাস যোগ। পনের আনা ঢেঁকির পাটের দিকে আর এক আনা অন্য দিকে। তেমনি সংসারে থেকে পনের আনা ভগবানকে আর এক আনা সংসারে। তা না হলে সর্ব্বনাশ! কলের হাতে পড়তে হবে। এক আনায় অন্যায় কর্ম কর!"

সংসার ও ঈশ্বর—

জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে তো জ্ঞান লাভ করতে হবে। সংসাররূপ জলে, মনরূপ দুধ রাখলে, মিশে যাবে।

তাই মনরূপ দুধকে দই পেতে, নির্জ্জনে মন্থন করে, মাখন তুলে, সংসাররূপ জলে রাখতে হয়।

ঈশ্বর দর্শনের সাধনা ও আনন্দ—

সাধনার জন্যে প্রথমাবস্থায় নির্জ্জনে থাকার বড় দরকার। চারা অশ্বত্থগাছকে বেড়া দিয়ে, ছাগল গরুর হাত থেকে বাঁচাতে হয়। তারপর গুঁড়ি মোটা হলে, তাতে হাতী বেঁধে রেখে দিলেও কিছু হয় না। কাঠে আগুন দিয়ে, তবে ভাত রান্না হয়। সিদ্ধি খেলে নেশা হয়। ভাত খেলে গায়ে বল হয়। সিদ্ধি মুখে বললে, নেশা হয় না, খেলে তবে আনন্দ হয়। ভগবানকে দর্শন করলে শান্তি। আলাপ করলে, তবে তো আনন্দ লাভ হবে। এই আনন্দের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ভক্তের ঈশ্বর দর্শনে যে আনন্দ। তাই শ্রেষ্ঠ—ব্রহ্মানন্দ।

ঈশ্বর করুণাময়—

শ্রীশ বললে, "তাঁকে ডাকার সময় পাওয়া যায় না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তা বটে সময় না হলে কিছু হয় না। একটি ছেলে, তার মাকে বলেছিল, হাগা পেলে তাকে ঘুম থেকে তুলে দিতে। তাই মা তাকে বলেছিলেন, হাগাই তোমায় তুলবে। আমায় তুলতে হবে না।"

যখন যা দেবার তা তাঁর ঠিক করা আছে। যেমন সরা মাপ করে শাশুড়ী বৌয়েদের ভাত দেয়। তাই একদিন সরাটা ভেঙ্গে যেতে, বৌয়েরা আহ্লাদ করেছিল। তখন শাশুড়ী বৌয়েদের বললেন, "নাচো কোঁদো বৌমা আমার হাতের আট্‌কেল (আন্দাজ) আছে।" শ্রীশকে তিনি বললেন, "কি করবে তাঁর পদে সমস্ত সমর্পণ কর। তিনি যা ভাল হয় করুন।"

সাধক ও সাধনা—

সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু সাধক দু' রকম। যেমন বাঁদরের ছানা আর বিড়ালের ছানা। বানরের ছানা মাকে জোর করে আঁকড়ে থাকে। সেই রকম সাধককে এত জপ, এত ধ্যান, এত তপস্যা করতে

হবে, তবেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে ধরতে চায়। বিড়াল ছানা মাকে ধরতে পারে না, পড়ে থেকে, শুধু মিউ মিউ করে ডাকে। মা তাকে মুখে করে, এখানে রাখে, ওখানে রাখে। সে নিজে ধরতে জানে না। সেই রকম, কোন সাধক হিসেব করে কোন কাজ করে না। এত জপ, এত ধ্যান, কিছুই না করে, কেবল ব্যাকুল হয়ে, কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তার কান্না শুনে, থাকতে না পেরে, এসে দেখা দেন।

ঈশ্বর ও নাস্তিকবাদ—

নরেন্দ্রের বাবা মারা যাবার পর সংসারের খুব দুঃখ কষ্ট, তাই ঈশ্বর কেন নরেন্দ্রকে দয়া করছেন না বলে, যেন অভিমান ভরে নরেন্দ্রের ওপর দৃষ্টি করলেন।

নরেন্দ্র বললে, "আমি নাস্তিকবাদ পড়ছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বোধ হয় নরেন্দ্রের এই নাস্তিকবাদ পড়ছি কথাটা বলার কি উদ্দেশ্য তা তিনি বুঝতে পারলেন। তাই তাঁকে বললেন, "দুটো আছে, অস্তি আর নাস্তি। অস্তিটাই নাও না কেন?"

নরেন্দ্র বললেন, "ঈশ্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তিনি তো ভক্তকে দেখবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এ সংসার তাঁর মায়া—মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না—যেমন ভীষ্মদেব যখন শরশয্যায়, তখন তিনি অষ্টবসুর এক বসু হয়েও মায়ায় কাঁদছেন কেন, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন, "ঈশ্বরের কাজ কিছু বোঝা যায় না।" শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ভীষ্ম মায়ায় কাঁদছেন না।" ভীষ্ম নিজেও এখন বললেন তাই। তিনি বললেন, "পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ অথচ তাঁদের বিপদের শেষ নেই, এই ভেবেই কাঁদছি আমি। তাঁর কাজ বোঝার উপায় নেই।" শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর ভীষ্মের কথা থেকে বুঝিয়ে দিলেন।

শুদ্ধ আত্মা সুমেরুবৎ—

পরমাত্মা যাঁকে বেদে শুদ্ধ আত্মা বলে তিনিই কেবল একমাত্র

অটল সুমেরুবৎ নির্লিপ্ত আর সুখ দুঃখের অতীত। 'তাঁর মায়ার কাজে অনেক গোলমাল, এটির পর ওটি, এটি থেকে ওটি হবে, ওসব বলবার জো নেই।

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, "পূর্ব্ব জন্মে দান-টান করলে তবে ধন হয়, তা হলে আমাদের দান-টান করা উচিত?" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "যার টাকা আছে তার দান করা উচিত।" ত্রৈলোক্যকে বললেন, "জয়গোপাল সেনের টাকা থাকলেও খুব হিসেবী (কৃপণ), টাকা কে ভোগ করবে তার ঠিক নেই। সেদিন সে এসেছিল। তার গাড়ীতে ভাঙ্গা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া, মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল ফেরৎ দ্বারবান আর এখানে এনেছিল দুই পচা ডালিম!" সকলে এই কথা শুনে হেসে উঠল। ত্রৈলোক্য গান গাইছিলেন, "চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দলহরী।"

গানটা শেষ হতে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যকে বললেন, "ঐ গানটা গাও তো গা—আমায় দে মা পাগল করে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের পণ্ডিতকে দিব্যজ্ঞান দান—

এক পণ্ডিত ঠাকুরবাড়ী দেখে, ঠাকুরের ঘরে ফিরছেন। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারন্দা থেকে বললেন, "তুমি একটু জল খাও।"

পণ্ডিত বললেন, "আমি সন্ধ্যা করি নি।"

এই কথা শুনেই, ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে গেয়ে উঠলেন :—

"গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কে বা চায়,
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়।
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়,
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়।
পূজা হোম জপ যজ্ঞ আর কিছু না মনে লয়,
মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়।"

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে আবার বললেন, "কতদিন সন্ধ্যা? যতদিন ওঁ বলতে মন লীন না হয়।"

পণ্ডিত বললেন, "তবে জল খাই, তারপর সন্ধ্যা করব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আমি তোমায় বাধা দেব না। সময় না হলে ত্যাগ ভাল নয়। ফুল পাকলে ফল আপনি হয়। কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লা ধরে টানাটানি ভাল নয়। ও রকম করে ভাঙ্গলে গাছ খারাপ হয়ে যায়।"

পণ্ডিত সন্ধ্যা করে জল খেলেন। এইবার ভূধরের বড় ভাই বললেন, "আমাদের উপায় কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তোমরা মমুক্ষু, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। সংসারে নষ্ট-স্ত্রীর মত থাকবে।

নষ্ট-স্ত্রী বাড়ীর সব কাজ করে কিন্তু তাঁর মন উপপতির ওপর রাতদিন পড়ে থাকে। সংসারে কাজ কর কিন্তু মন সর্ব্বদা ঈশ্বরের ওপর রাখবে।"

ঈশ্বর কল্পতরু—

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ঈশ্বর কল্পতরু তাঁর কাছে যে যা চাইবে, সে তাই পাবে। ভক্তিযোগ আর জ্ঞানযোগ একই পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তিপথ, সহজ জ্ঞান, বিচার পথ খুব কঠিন। তাঁকে পেতে হলে, একটা ভাব দরকার। বীরভাব, সখীভাব, দাসীভাব, আর সন্তানভাব। আমি অনেক দিন দাসীভাবে ছিলাম। বলতাম আমি আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীর দাসী।"

সাধনা ও সিদ্ধ—

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কারু সাধনা না করে ঈশ্বর লাভ হয়—তাদের বলে নিত্যসিদ্ধ। জপ-তপাদি সাধনা করে ঈশ্বর লাভ হলে, তাদের বলে সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ কৃপাসিদ্ধ—যেমন হাজার বছর আগের ঘরে, এক মুহূর্তে আলো হয়ে যায়। আবার হঠাৎ সিদ্ধ—যেমন গরীবের ছেলে বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে, বাবু মেয়ে দিলে—সেই সঙ্গে ঘর-বাড়ী দাস-দাসী সব হয়ে আর আছে স্বপ্নসিদ্ধ—স্বপ্নে দর্শন হয়।"*

রণ ভক্ত ও সাধন শিক্ষা—

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁতলে কোন কষ্ট

হয় না। পাথরে পেরেকের গোড়া ভেঙ্গে যায়, পাথরের কিছু হয় না। এমন অনেক লোক আছে, হাজার ঈশ্বরের কথা শুনুক, কোনমতে চৈতন্য হবে না—যেমন কুমীরের গায়ে টোপ লাগান যায় না। মানে কুমীরের পিঠে তরবারীর কোপ শক্ত চামড়ার জন্যে লাগে না।"

পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, "কুমীরের পেটে বর্শা মারলে হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতের কথা শোনার পর বললেন, "গুচ্ছের শাস্ত্র পড়লে কি হবে ফেলোজফি (Philogophy) লম্বা লম্বা কথা বললে কি হবে। বান মারা শিক্ষা করতে গেলে আগে কলাগাছ তাগ্ করতে হয়, তারপর শরগাছ—তারপর সলতে—তারপর উড়ে যাচ্ছে যে পাখী। তাই আগে সাকারে মনস্থির করতে হয়। আবার ত্রিগুণাতীত ভক্ত আছে যেমন নারদাদি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার অবতার সম্বন্ধে বলছেন, "যারা নেতি নেতি জ্ঞান বিচার করছে—"তারা অবতার মানে না।"

হাজরা ঠাকুরের ভক্ত, বেশ বলে, ভক্তের জন্যেই অবতার—

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার সম্বন্ধে আরো বললেন, "জ্ঞানীর জন্যে অবতার নয়। তারা তো সোঽহং হয়ে বসে আছে।"

তারপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতকে মোটামুটি অল্প করে বললেন, "শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নেই। ন্যাংটা আমায় শেখাতো গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ দশবার গীতা গীতা বলতে বলতে ত্যাগী হয়ে যায়। ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদো আর বিবেক-বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্ব্বত্যাগ করতে পারে, তা হলে সাক্ষাৎকার হবে।"

মানের গোড়ায় ছাই দিলে মান বাড়ে—

একজন জ্ঞানী বলেছিলেন, মানের গোড়ায় ছাই দিলে তবেই সেই মানগাছ বাড়ে। মানুষের মান-সম্মান নানা রকম নিয়ে তবেই তার অহংকার। সেই অহং বোধ ত্যাগ করতে হবে। যদি নিজেকে বড় করতে চাও, তবে তোমার মানের গোড়ায় ছাই দিতেই হবে। মান-সম্মান ভোগীর জন্যে, তাই এতে বড় হওয়া যায় না।

আর বড় না হলে, মানে ত্যাগী না হলে ঠাকুরও বলেছেন, যিনি অতি ক্ষুদ্র—যিনি অতি বিরাট—যিনি উপরে, নীচে, চতুর্দ্দিকে সর্ব্বভূতে বিরাজ করছেন, সেই ঈশ্বরকে অনুভব—সেই ঈশ্বরকে দর্শন হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্নদা—

শিব গুহের বাড়ীর ছেলে অন্নদা গুহ একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন, "তুমি তো নরেনের বন্ধু ?" উৎসুক হয়েই বললেন, "জানতো ওর বাবা মারা গেছে।" অন্নদা মাথা হেঁট করলে।

নরেনের আত্মসম্মানে আঘাত—

ঠাকুর আবার বললেন, "ওদের এখন বড় কষ্ট, বন্ধুরা সাহায্য কিছু করে, তো বেশ হয়।" অন্নদা চলে গেলেন। নরেন এখন ঠাকুরকে খুব কড়া করে বললেন, "কেন ওর কাছে আপনি ওসব কথা বলতে গেলেন।"

ঠাকুর বললেন, "তাতে কি হয়েছে ?"

নরেন বললেন,—"তার মানে, আমাদের দুঃখ-দৈন্যের কথা যার তার কাছে বলে বেড়াবেন ? আমার কি একটা মান নেই ? আমি কি ভিখিরী ?" ঠাকুর নরেনের কাছে বকুনি খেয়ে কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, "ওরে তুই ভিখিরী হবি কেন, আমি ভিখিরী হব। আমি দ্বারে দ্বারে তোর জন্যে ভিক্ষে করব।" ঠাকুরের যেন বড় অভিমান হয়েছে মায়ের ওপর।

ত্রৈলোক্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

নরেনের কিছু হিল্লে হোল না দেখে, তাই তিনি ত্রৈলোক্যকে বললেন, "দুঃখই ভোগ করছে।" এই বলেই যেন একটু থামলেন। তারপর বললেন, "তা কি করা যায়, ঈশ্বর কখন সুখে, কখন দুঃখে রাখেন।"

ত্রৈলোক্য একটু হতাশ হয়েই প্রশ্ন করলে, "তাঁর দয়া হবে না নরেনের ওপর ?"

নরেন্দ্রের জন্যে প্রার্থনা—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার বললেন, "মা ওকে মায়ায় বদ্ধ কর, তা না হলে ও সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।"

ঠাকুর কি চান, এ কথা কেউ জানে না। নরেনের দুঃখে তিনি দুঃখ করেন, কণ্ঠ তাঁর ভারী হয়ে আসে, অথচ মার কাছে তাঁর একি প্রার্থনা তা সহজে কে বুঝতে পারে!

শ্রীরামকৃষ্ণকে হৃদয়ের অনুরোধ—

শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় নরেনের দুঃখ কি ঘোচে না? এই প্রশ্ন হতে পারে, হওয়াও সম্ভব কারণ কিছুদিন আগের কথা—হৃদয় ঠাকুরকে পীড়াপীড়ি করে বলে, "তন্ত্রে তোমার সিদ্ধি হল অথচ চুপচাপ বসে থাকবে? মার কাছ থেকে ক্ষমতা-টমতা চাও, না হলে কি করে বুঝব তুমি একটা বড় সাধু হয়েছ।"

অষ্টসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ কি করলেন—কি বললেন?—

ঠাকুর হৃদয়কে বললেন, "ক্ষমতা নিয়ে কি হবে? মাকে দেখতে পাচ্ছি, টেনে আনতে পারছি কাছে, এই কি যথেষ্ট নয়?"

গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণের অষ্টসিদ্ধির বিকাশ হয়েছে তাই কি এবার প্রয়োগ করবেন নাকি? সকলকে থ' বানিয়ে দেবেন ক্ষমতা দেখিয়ে! মার কাছে চক্ষের নিমিষে জিজ্ঞাসা করে ফিরে এলেন, সিদ্ধাই ঘৃণা আবর্জ্জনা। যদি একবার ঐ প্রলোভনে পা দাও, তবে মাটি হয়ে যাবে তপস্যার ফল। দেখতে দেখতে দেউলে হয়ে যাবে। হৃদয় শেষে জিজ্ঞাসা করে, তবে কি চাইবে মায়ের কাছে? ঠাকুর বললেন, প্রহ্লাদের যেমন ছিল ভালবাসা, ভক্তি ঠিক তেমনি। শুধু কৃপা চাইব—বলব আমাকে ভক্তি দাও—শুদ্ধা ভক্তি—অহেতুকী ভক্তি।

দক্ষিণেশ্বরে ভৈরবীর দুই শিষ্য চন্দ্র আর গিরিজার উপস্থিতি—

ভৈরবীর দুই শিষ্য চন্দ্র আর গিরিজা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। তারা এখন নানা রকম ভেল্কীবাজী সিদ্ধাই নিয়ে ব্যস্ত।

চন্দ্রের সিদ্ধাই—

চন্দ্রের গুটিকা সিদ্ধি হয়েছিল। তার মন্ত্রঃপূত গুটিকার ক্ষমতায়, সে অদৃশ্য হয়ে, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারত। তার ইচ্ছা হল, ঐ সম্ভ্রান্ত পর্দ্দানসীন সুন্দরী মেয়েটির তেতলার ঘরে গেলে কেমন হয়? সিদ্ধাইয়ের তেজ দেখাতে গিয়ে, চন্দ্র শেষে ধনী কন্যাতে আসক্ত হয়ে পড়ল। ঋতুর হয়ে গেল নিঃশেষ। সিদ্ধাই নিয়েই এত চোটপাট তখন তা আর রইল না।

গিরিজার সিদ্ধাই—

ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গিরিজা শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন। ঈশ্বরের কথা কইতে কইতে রাত হয়ে গেছে, লণ্ঠন আনেন নি, অন্ধকারে ঠাকুর আসতে গিয়ে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে যান। এক পা চলতে চলতেই, তাঁর দিক্-ভ্রম হয়, এখন উপায়?

গিরিজার সিদ্ধাই হয়েছে, সে পিঠ থেকে আলো বার করতে পারে। কালীবাড়ির দিকে, সে তাই পিঠ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটা আলোর ছটা তার পিঠ থেকে বেরিয়ে মন্দিরের ফটক্ পর্যন্ত আলোয় আলো হয়ে গেল।, ঠাকুর সেই আলোয় চলে এলেন।

সিদ্ধাই প্রয়োজন না ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রয়োজন? চন্দ্র ও গিরিজার সিদ্ধাই হয়েছে কিন্তু তারা এতে কি পেয়েছে? কিছুই পায়নি। কিন্তু ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ শুধু নয়, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলে, ঈশ্বর তার বোঝা কমিয়ে দেন। তার মঙ্গল করেন, তাকে রক্ষা করেন।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছিলেন। এমন সময় নারায়ণ তাড়াতাড়ি কোথায় চলে গিয়ে, আবার তখুনি ফিরে এলেন। লক্ষ্মী নারায়ণকে বললেন, "এর মধ্যে ফিরে এলেন যে?" নারায়ণ তার উত্তরে বললেন, "এক ভক্ত ধোপার কাপড় মাড়াতে, তারা তাকে লাঠি মারতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি গিয়ে দেখি ভক্ত ইট তুলেছে।"

ভক্ত যদি ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করত, তবে তিনি

তাকে রক্ষা করতেন। কিন্তু সে তো নিজেই এর জন্যে প্রস্তুত, তাই ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ প্রত্যেক ভক্তের প্রয়োজন।

এক পয়সার সিদ্ধাই—

দুই ভাই ছিল—একজন হয়ে গেল সন্ন্যাসী আর একজন হল সংসারী। অনেক দিন পরে, সন্ন্যাসী-দাদা ফিরে এসে, তিনি তপস্যায় কি রকম সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাই দেখাতে গিয়ে জলের ওপর দিয়ে, পায়ে হেঁটে অপর পারে গেলেন। কিন্তু ছোট ভাই এক পয়সা দিয়ে, নৌকা করে পার হয়ে এসে বললে, "এতদিন কষ্ট করে তুমি যা করলে, আমিও ঠিক তাই—অর্থাৎ মাত্র এক পয়সা দিয়ে পারের নৌকা ভাড়া করলুম। তোমার ঐ সিদ্ধাইয়ের মূল্য তাহলে মাত্র এক পয়সা।"

সিদ্ধাইয়ে ভগবান পাওয়া যায় কি ?—

সিদ্ধাই লাভ করে যদি হাতীকে মর বললেই সে মরে যায়, আর বাঁচ বললেই যদি সে বেঁচে ওঠে, তবে তাতে আপনার নিজের কি এসে গেল! ওতে কি জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই হয়, না ওতে তাঁকে পাওয়া যায়? না, তা পাওয়া যায় না—ও শুধু ভেল্কীবাজী।

অভাবী নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

একদিন ঠাকুর নরেনকে ডেকে, পঞ্চবটীর নির্জ্জনে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধির আবির্ভূত আছে। কিন্তু ও আমি কোনদিন প্রয়োগ করিনি, করবও না। তোকে ওসব দিতে চাই। নরেন অবাক্ হয়ে বললে, "আমাকে?" "হাঁ তুই ছাড়া আর কে আছে, তোকে অনেক কাজ, অনেক ধর্ম্ম প্রচার করতে হবে। তোরই ওসব দরকার। তুই ছাড়া কারু সাধ্যও নেই এত শক্তি ধারণ করে, বল নিবি?"

নরেন এক মুহূর্ত্ত ভেবে বললে, "ঐ সমস্ত শক্তি আমাকে ঈশ্বর লাভে সাহায্য করবে?"

ঠাকুর কি ভাবলেন, তারপর বললেন, "না।"

দৃঢ়চেতা নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

নরেন এই কথায় বললে, "তবে আমার দরকার নেই।" তার ভাবে ভঙ্গিতে ফুটে উঠল, অনাসক্তির দৃঢ়তা, তাই আবার বললে, "যা দিয়ে আমার ঈশ্বর লাভ হবে না—শুধু লোকমান্য হবে, তা দিয়ে কি করব ?"

ঠাকুর নরেনের কথা শুনে, প্রসন্ন হয়ে হাসতে লাগলেন।

নরেন্দ্রের অদ্ভুত প্রশ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর—

এরপর একদিন নরেন নিজেই ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন, "ধ্যানে বসলে অনেক দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছি, দূরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কোন্ বাড়ীতে কে কি বলছে, কে কি করছে, উঠে গিয়ে দেখি আর শুনি সত্যি। এ আবার কি নতুন খেলা ?"

নরেনের কথা শুনে ঠাকুর বললেন, "এসমস্ত সিদ্ধাই তোকে ভোলাতে এসেছে। তুই সিদ্ধাই নিবি কেন ? তুই ভগবানকে নিবি। ঈশ্বর লাভে বাধা সৃষ্টি করতে এসেছে। তুই ধ্যানসিদ্ধ হবি। দিনকতক ধ্যান বন্ধ রাখ। দেখবি ও সমস্ত আসবে না। তুই পাবি, নিত্যকালের এগিয়ে যাবার পথ।

নরেন্দ্রের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা—

নরেন এই সমস্ত ক্ষমতা লাভ করেও সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যতায় অস্থির হয়ে পড়ল।

ঠাকুর নরেনের ওপরে সমাধির লক্ষণ বুঝে, মায়ের কাছে মনে মনে প্রর্থনা করেছিলেন, "ওকে মায়ায় বদ্ধ কর, তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে ও দেহত্যাগ করবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনায় মায়ায় বদ্ধ নরেন্দ্রনাথ—

কিসের সংসার, কে কার, কিন্তু নরেন এ কথা নিশ্চয় জেনেও, নিজে মা, ভাই, বোন, এদের নিয়ে, অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে লাগল আর ভাবতে লাগল, এদের না খাওয়াতে পারলে, ঠাকুর থেকে আর কি লাভ ? তার ভালবাসার কি মূল্য ? এটর্ণির

অফিসে খাটা-খাটুনি ও ক'খানা বইয়ের অনুবাদ করে যা রোজগার করলে, তাতে জল গরম করবার মত অর্থও মিলল না।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রের অনুরোধ—

এবার নরেন এসে ঠাকুরকে বললে, "মার তো অনেক প্রতাপ। মার কাছে আপনার খাতিরও আছে, তাই মাকে বলে একটু ব্যবস্থা করিয়ে দিন। আপনার মাকে একটিবার বলুন।" ঠাকুর অবাক্ হয়ে চেয়ে বললেন, "কি বলব?" "আপনার মাকে সুপারিশ করে, আমার একটা স্থায়ী চাকরী যাতে হয় তাই করুন। মা, ভাই, বোনের, কষ্ট আর দেখতে পারি না।" স্নিগ্ধচোখে ঠাকুর বললেন, "আমার মা তোর কে?" "পুত্তলিক প্রস্তর-প্রতিমা—আমার কে না কে, তাতে কী আসে যায়। আপনার তো সব। টাকাকড়ি যাতে হয়, ওদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে বলুন আপনার মাকে!" নরেন এই কথাগুলি, ঠাকুরকে মাথা হেঁট করেই বললে।

নরেন্দ্রের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর ও নির্দ্দেশ—

ঠাকুর বললেন, "ওরে ওসব বলতে পারি না!" নরেন মরিয়া হয়ে বললেন, "আপনাকে বলতেই হবে! না হলে, কিছুতেই ছাড়ব না!"

ঠাকুর ছল্‌ছল্‌ চোখে বললেন, "কতবার বলছি, নরেনের দুঃখ দূর কর মা, নরেনকে টাকা দে মা!"

নরেন বললে, "বেশ করেছেন, আজ আর একবার বলুন!" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তুই বল! মায়ের কাছে বসে ভাল করে মা বলে ডাক!"

নরেন বললে, "আমার ডাক আসে না। তারই জন্যে কি কিছু সুরাহা হয় না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তবে আজ মঙ্গলবার কালীঘরে রাত্রিতে গিয়ে মাকে প্রণাম কর। তারপর যা চাইবি মায়ের কাছে, মা দিয়ে দেবেন, লুট করেও মায়ের ভাণ্ডার শেষ করতে পারবি না! নরেন শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথা শুনে, অবাক্ হয়ে বলেন, "সত্যি!"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "তুই পরখ করেই দেখ্।"

নরেন ভাবলে, তবে আর ভয় নেই। তারপর সে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগল—আকুল হয়ে—অতি আগ্রহে।

কত সহজ সমাধান—শুধু প্রণাম আর প্রার্থনা—শুধু স্বীকৃতি আর সমর্পণ।

মঙ্গলবার রাত্রির একপ্রহর কেটে গেল।

ঠাকুর এসে নরেন্দ্রকে বললেন, "যা এবার শ্রীমন্দিরে। প্রাণ ভরে প্রণাম কর। তারপর চা প্রাণ ভরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশ ও নরেন্দ্রের প্রার্থনা—

নরেন যেন নেশা করেছে। পা তার টলতে লাগল। কী সে দেখবে, প্রস্তরময়ী প্রাণময়ী হয়ে উঠবেন। জড়পুত্তলি হয়ে উঠবেন সুভাষিণী।

মন্দিরে কেউ নেই। শুধু নরেন আর ভবতারিণী।

কী দেখলে নরেন তার দুটি চোখ মেলে? সে দেখলে, প্রেম ও প্রসন্নতায় নিত্য নির্ঝরিণীর মত মা বিরাজ করছেন। তাঁর কাছে অভাব অভিযোগ শোক দুঃখ কিছুই নেই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ, কিন্তু এই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির কাছে দাঁড়িয়ে নরেন কী প্রার্থনা করবে।

নরেন ভক্তি-বিহ্বল হৃদয়ে বললে, "মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।"

তন্ময় চিত্তে নরেন ফিরে এল।

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কি রে চেয়েছিলি?"

অসহায়ের মত নরেন উত্তর দিলে, "পারলুম না সব ভুল হয়ে গেল।"

ঠাকুর তাকে আবার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলে। নরেন মায়ের কাছে গিয়ে, যেন কি রকম হয়ে যায়। প্রার্থনা করে, "মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।"

নরেন ফিরে এলে ঠাকুর চঞ্চল হয়ে বললেন, "কি রে চেয়েছিলি?"

নরেন বললে, "না এল না মুখ দিয়ে।"

ঠাকুর বললেন, "এ আনাড়ি! একেবারে আকাট!" নরেন বললে, "পারলুম না বলতে—চাইবার সময় গোলমাল হয়ে গেল—যা ভেবেছিলুম তা বলা হোল না।" ঠাকুর আবার তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বললেন, "যা আর একবার চেষ্টা করে দেখ্!"

নরেন মায়ের কাছে এল। মায়ের অপরূপ মূর্ত্তি যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়, সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপা জগজ্জননীর কাছে বললে, "মা আর কিছু চাই না! আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও!"

নরেন ফিরে এল ঠাকুরের কাছে। তিনি খুব ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে চাইলি এবার?"

নরেন বললে, "চাইতে লজ্জা করল!"

নরেন্দ্রনাথকে প্রসন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ—

ঠাকুর নরেনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আনন্দে হাসতে হাসতে বললেন, "মা বলে দিয়েছেন, তোদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব হবে না!"

উদাস নরেনের গান শেখার ইচ্ছা এবং ঠাকুরের শিক্ষাদান—

নরেনের ও সমস্ত আগের কথার আর আলাপ আলোচনায় ইচ্ছা ও আগ্রহ নেই। সে বললে, "আমায় মার গান শিখিয়ে দিন!"

ঠাকুর বললেন, "কোন্ গানটা শিখবি?"

নরেন বললে, "মা ত্বং হি তারা সেই গানটা!"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে গানটা শিখিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার অনেকদিন আগের কথা—

ঠাকুর যখন যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। তাই এই নরেনেরই জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। নরেনকে ঠাকুরের চাই—কিন্তু কোথা সে? সে এখনও আসছে না কেন? ঠাকুর নরেনের দেখা পেলেন, তাকে চিনতে পারলেন, কিন্তু নরেন পারলে না।

বিলাতী আদব-কায়দা-দোরস্ত শিক্ষিত যুবক ঠাকুরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলে না, ছাড়তেও পারলে না। নানা প্রশ্ন করতে করতে, ঠাকুরকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন। তাই অন্য ভক্তরা রাগ করলে, তিনি চুপি চুপি তাদের বলেছেন, "তোরা চুপ কর—নরেনকে তোরা কিছু বলিস নি, ও মহাদেব।" ঠাকুর জানেন, নরেন কে! ঠাকুর জানেন, নরেনের কি কাজ করতে হবে, কেন সে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। তাই ঠাকুর নরেনকে আস্তে আস্তে যেমনটি চেয়েছিলেন, তেমনি তৈরী করে নিতে লাগলেন—ধীরে ধীরে নরেনও ঠাকুরের পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রের মতই আর এক ভক্ত পেলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একজন ভক্ত হলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর লোককে সাধুরা কি তার প্রিয় ভক্ত বলে কোলে টেনে নেয়? তাকে কি তার পাপের বোঝা নিজে নামিয়ে নিয়ে, অশান্ত হৃদয়ে শান্তি প্রলেপ মাখিয়ে দেন?

এ কথার উত্তরে বলতেই হয়, হ্যাঁ দেন! যদি যেমন গুরু তার তেমন শিষ্য হয়, তবে গুরুই, সেই শিষ্যের পাপ ধুয়ে দিয়ে, তাকে আলোর পথে নিয়ে যান।

কে এই ভক্ত? কি তার নাম? আর তার কাজই বা কি?—

এই ভক্তের নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি কাজের মধ্যে নাটক লেখেন, অভিনয় করেন আর মদ খান। তাই গিরিশ ঘোষ মাতাল হলেও, চরিত্রহীন হলেও, ঠাকুরের কৃপায় নরেনের মতই হয়ে উঠতে লাগেন এক প্রধান ভক্ত, যা সকলেই বললে, আর মেনে নিলে।

ভাবুক পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী ও শ্রীরামকৃষ্ণের থিয়েটার দেখার ইচ্ছা—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আমি থিয়েটার দেখতে যাব।" সকলেই অবাক্ হয়ে গেলেন। ঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ চৈতন্যলীলা দেখব।" শ্রীরামকৃষ্ণের হঠাৎ সখ আর সাধ হয়েছে।

ওদিকে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাঁর পুত্র পদরত্নকে বললেন, "কলকাতায় যা তো—ওরে কী শুনছি—সত্যিই কি থিয়েটারে, সেখানে গৌর এসেছেন নাকি রে ?"

পদরত্ন কলকাতায় থিয়েটার দেখে, ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। শেষে গিরিশকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন, "তোমার মনোবাঞ্ছা সফল হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশ ঘোষ—

পদরত্নের সেই আশীর্ব্বাদ সফল হল। পাল্‌কি করে গৌর নিজে এসেছে থিয়েটারে।

কেন কে জানে, গিরিশ নিজে গেল গাড়ীর কাছে। . ঠাকুর তখন গাড়ী থেকে নামছেন মাত্র। তিনি গিরিশকে দেখে, নত হয়ে নমস্কার করতেই, গিরিশ নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন।

আবার তখুনি ঠাকুর নমস্কার করলেন। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে পারবে কেন—শেষে ঠাকুরই নমস্কারে জিতলেন।

নিমাইয়ের অভিনয় দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি—

ওপরের বক্সে ঠাকুরকে বসিয়ে এক পাখাওয়ালা তাঁকে হাওয়া করতে লাগল। তারপর নিমাইয়ের অভিনয় দেখে, ঠাকুর সমাধিতে ডুবে গেলেন—আবার জীবভূমিতে ফিরে এলেন, আবার সমাধিস্থ হলেন। এই অভিনয় পরিচালনা ও নাটকের রচনা করেছেন গিরিশ ঘোষ। এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখে, ঠাকুর ভাবে ডুবে গেলেন, লেখক ধন্য হল। লেখা তার সার্থক হল।

এ সেই পূর্ব্বপরিচিত ভৈরব—

ঠাকুরের মনে হল যেন গিরিশকে অনেক আগে দেখেছেন। অনেক আগে তাঁর সঙ্গে আলাপ। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম সাধনার সময়, কালীঘরে বসে তিনি দেখেছিলেন, একটি উলঙ্গ বালক কোমরে রূপার পেটি, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা। এক হাতে মদের ভাঁড় আর অন্য হাতে সুধাপাত্র। ঠাকুর হাঁক দিলেন "তুই কে ?" সে বললে, "আমি ভৈরব।" "তা এখানে কেন ?" "আপনার কাজ

করতে এসেছি।" সেই ভৈরবই যে এই গিরিশ। মানে ঠাকুরের পরম ভক্ত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

অভিনয়ে সাধুর অংশে নরেন—

ব্রহ্মসমাজে চৈতন্য-নাটকে সাধু সেজেছিলেন নরেন। অভিনয়ের সময় ঠাকুর তাঁকে চিনতে পারলেন না। কেশব সেন নরেনকে ডেকে দিলেন। ঠাকুর তাকে দেখে আনন্দে বললেন, "মা তোকে ঠিক এই বেশেই আমায় একদিন দেখিয়েছিলেন। এখন ঠিক মিলে গেছে।"

অভিনয়ে চৈতন্যের অংশে বিনোদিনী—

অভিনয়ের শেষে চৈতন্য এসে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে। ঠাকুরকে বলা হল, "এই পার্ট যে করে, সে রোজ গঙ্গাস্নান, হবিষ্য করে নামে। মানে সকাল থেকে মেয়ে-অভিনেত্রীটি দেহে ও মনে, স্নান, আহার সমস্ত দিক থেকেই, এই অভিনয়টি যাতে জীবন্ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাই পরিচালকের নির্দ্দেশ মত কাজ করেন। এই মেয়েটি কে? যিনি চৈতন্য অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে, দর্শককে নিজের আন্তরিকতা, বহু শ্রম ও সংযমের ফলে একেবারে অভিভূত করেছিলেন আর পরে নিজেও ধন্য হয়েছিলেন। এই অভিনেত্রীর নাম বিনোদিনী।

সাষ্টাঙ্গ হয়ে বিনোদিনী ঠাকুরকে প্রণাম করলে। ঠাকুর তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন, "মা—তোমার চৈতন্য হোক!" ঠাকুর তাকে অনেক আশীর্বাদ করে শেষে বললেন, "হৃদয়েই সর্ব্বভূতের প্রতিষ্ঠা। হৃদয়ই সম্রাট। হৃদয়ই পরমব্রহ্ম। চৈতন্যমন্ত্রে তাকে জাগাও। মলয়-স্পর্শে, সুগন্ধানন্দ চন্দন হয়ে যাও!"

বিনোদিনী মনে মনে বললে, "হলাম গণিকা, তবু তোমার গণনাতে গণ্য হলাম। আর কিছুই চাই না, গণ্য হয়েই ধন্য হলাম!"

কোন্ পথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—

ঈশ্বরকে লাভ করার অনন্ত মত—অনন্ত পথ। কিন্তু একটি

কথা আছে। কলিতে নারদীয় ভক্তি—এই বিধান। এই পথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি থাকলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ, মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার তা হয়েছে, তার বস্তু লাভ অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ হয়েছে।

গুরু অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান—

ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময়! গুরুই এই পথের পথপ্রদর্শক। দেখা যায় "গু" অর্থে অন্ধকার আর "রু" অর্থে আলো। দুই বর্ণের মিলনেই হয়েছে গুরু। অর্থাৎ যিনি অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছেন, পণ্ডিত মহিমাচরণ গুরু মানেন না। তিনি বেদান্ত চর্চ্চা করেন ও সর্বদাই বিচার করেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গুরু-চরিত্রের দিকে দেখার দরকার নেই। যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" ঠাকুর উপদেশ দিতে দিতে বললেন, "ভক্তেরা 'আমি' রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না। ল্যাংটা উপদেশ দিত, মন বুদ্ধিতে লয় কর, বুদ্ধি আত্মাতে লয় কর, তবে স্বরূপে থাকবে। কিন্তু 'আমি' থাকবেই থাকবে, এইটা সহজে যায় না। উপরে, নীচে, ডাইনে, বামে জলে পরিপূর্ণ। সেই জলের মধ্যে জলপূর্ণ স্তম্ভ আছে। ভিতরে বাইরে জল কিন্তু তবুও স্তম্ভটি আছে। 'আমি-রূপ' স্তম্ভ।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টার, বাবুরাম ও নারায়ণ প্রভৃতিকে নিয়ে, ষ্টার থিয়েটারে প্রহ্লাদ-চরিত্র দেখতে এসে, গিরিশকে এই 'আমি' নিয়ে উপদেশ দিতে থাকেন। গিরিশ ঘোষের সঙ্গে তারপরও নানা কথায় ঠাকুর উপদেশ দিয়ে, গিরিশের মনের ময়লা ধুয়ে দিয়ে সেখানে জ্বেলে দিলেন জ্ঞানের প্রদীপ। গিরিশ বুঝলেন, ঠাকুর সামান্য নয়। তাই গিরিশ আস্তে আস্তে ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে, জানতে চাইলে মুক্তির উপায়।

গিরিশের সুখ্যাতি—

ঠাকুর রামকৃষ্ণ গিরিশের লেখার সুখ্যাতি করে বললেন, "বাঃ! তুমি বেশ সব লিখেছ!"

গিরিশ বললেন, মশাই ধারণা কই, শুধু লিখে গেছি। এই কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "না তোমার ধারণা আছে। সেইদিন তো তোমায় বললাম, ভিতরে ভক্তি না থাকলে ভাল চিত্র আঁকা যায় না।"

গিরিশ—"মনে হয় থিয়েটারগুলো আর করা কেন ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"না ওতে লোকশিক্ষা হবে।"

থিয়েটারে প্রহ্লাদের চরিত্র দেখে, ঠাকুরের বারবার ভাবে অবস্থান্তর ও শেষে ঈশ্বর সম্বন্ধে মতামত—

থিয়েটার আরম্ভ হলে, ঠাকুরের প্রহ্লাদকে পাঠশালায় দেখে, "প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদ" বলে, সমাধিস্থ হলেন। প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের তলায় ও অগ্নিকুণ্ডে দেবার সময় খুব কাঁদতে লাগলেন। গোলোকে নারায়ণ প্রহ্লাদের জন্যে ভাবছেন দেখে, আবার তিনি সমাধিস্থ হলেন।

গিরিশ পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন দেখলেন ?"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করলেন, "দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ তিনিই সব হয়েছেন।"

গিরিশের উন্নতির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের সঙ্গে কথা কইতে কইতে বললেন, "যার ভগবান দর্শন হয়, তার কখন পাগলের ন্যায়, কখন পিশাচের ন্যায়, শুচি, অশুচি, ভেদ জ্ঞান নেই। কখন জড়ের ন্যায়। কেননা সে অন্তরে বাইরে ঈশ্বর দর্শন করে, অবাক্ হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি করে, বালকের ন্যায় আঁট-সাঁট নেই। বালক যেমন কাপড় বগলে করে বেড়ায়! তবে বালকের 'আমি' এতে দোষ নেই।" বালকের এতে দোষ নেই শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে বেশ জোর দিয়েই বলছেন, "এতে তার বরং উপকার হয়, যেমন হিঞ্চে শাক খেলে অসুখ হয় না উপকার হয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। মিষ্টিতে অসুখ করে কিন্তু মিছরিতে কফ দোষ করে না।"

গিরিশ হেসে বললে, "সবই তিনি, তবু একটু আমি থাকে, কফ দোষ করে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, "ওতে হানি নেই। আমি একটি, তুমি একটি হলে, আনন্দ ভোগ করা যায়, সে সেবক ভাব।" গিরিশ বললে, "মশাই ঠিক বুঝেছি তিনিই সব করছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ—বললেন, "আমি বলি, মা আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি জড়, তুমি চেতয়িতা, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি। যারা অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন।"

গিরিশ—"মশাই, আমি আর কি করছি আর কর্ম্মই বা কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"না গো কর্ম্ম ভাল। জমি পাট করা হলে যা, রুইবে তাই জন্মাবে। তাই কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করতে হয়।"

পরের হিতার্থে কর্ম ও লোকশিক্ষা—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে ভাল করে বুঝিয়ে বললেন যে, "পরমহংস দুই প্রকার—জ্ঞানী পরমহংস ও প্রেমী পরমহংস, যিনি জ্ঞানী তিনি আত্মসার—আমার হলেই হল। আর যিনি প্রেমী যেমন শুকদেবাদি ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে, মুখটি পুঁছে ফেলে আর কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকুয়া খুঁড়বার সময় ঝুড়ি কোদাল আনে, খুঁড়া হয়ে গেলে রেখে দেয়, যদি কারুর দরকার লাগে। গিরিশকে বললেন, তুমিও পরের জন্যে রাখবে।"

গিরিশ—"আপনি তবে আশীর্ব্বাদ করুন!"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তুমি মার নামে বিশ্বাস করো, হয়ে যাবে!"

গিরিশ—"আমি যে পাপী!"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"যে পাপ সর্ব্বদাই করে, সে শালাই পাপী হয়ে যায়।"

গিরিশ—"মশাই আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশুদ্ধ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয়। না একেবারে দপ্ করে আলো হয়?"

গিরিশ—"আপনি আশীর্ব্বাদ করলেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তোমার যদি আন্তরিকতা হয়, আমি কি বলব। আমি খাই-দাই তাঁর নাম করি।"

গিরিশ—"আন্তরিকতা নেই। কিন্তু ঐটুকু দিয়ে যাবেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমি কি? নারদ, শুকদেব এরা হতেন।"

গিরিশ—"নারদাদি তো আর দেখতে পাচ্ছি না। সাক্ষাৎ যা পাচ্ছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, "আচ্ছা বিশ্বাস!"

গিরিশ—"একটি সাধ অহেতুকী ভক্তি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"অহেতুকী ভক্তি, ঈশ্বর কোটির হয়, জীব কোটির হয় না।"

সকলে চুপ করে আছেন, ঠাকুর আনমনে গান ধরলেন :—

"শ্যাম ধন কি সবাই পায়, কালী ধন কি সবাই পায়।
অবোধ মন বোঝে না একি দায়॥"

ঠিক কি অবস্থায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে বললেন, "তীব্র বৈরাগ্য হলে, তাঁকে পাওয়া যায়। জলের ভেতর কাউকে ডুবিয়ে রাখলে, যেমন তখন তার প্রাণ আটু-পাটু করে, তেমনি প্রাণের ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যে এই অবস্থা হলে, তাঁকে লাভ হবে। আর এক সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি তিন রকমের টান—যেমন বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান। ঠিক এমনি ভালবাসা, দিতে পারলেই, তাঁর দেখা পাওয়া যায়। ডাকার মত ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারলে তাঁকে দেখা দিতেই হবে।" এই রকম নানা জ্ঞানের কথায়, গিরিশ ভাবে আহা। বলে ওঠায় তিনি বললেন, "সংসারে বৈরাগ্য বললে, সংসারীর সংসার হবে না কেন? তবে বিবেক-বৈরাগ্য চাই। উপরে উপরে ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে।" এই বলে ঠাকুর আবার গান গাইতে লাগলেন—

"ডুব ডুব, ডুব-সাগরে, আমার মন,
তলাতল পাতাল, খুঁজলে পাবি রে, প্রেম রত্ন ধন।"

গিরিশের মুক্তির উপায়—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান শেষ করে বললেন, "কামাদি কুমীরের ভয় আছে।" অর্থাৎ ঠাকুর বলছেন, ডুব দিয়েও রক্ষা নেই। সাবধান হতে হবে। কিন্তু গিরিশবাবু তাঁর কথায় বললেন, "যমের আমার ভয় নেই।" তাই তার কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "না কুমীরের ভয়— তাই বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হলুদ মেখে ডুব দিতে হয়।" তার মানে কুমীর তা হলে ধরবে না। গিরিশ ঠাকুরকে বললে, "এ পাপীর কি হবে ?"

ঠাকুর উর্দ্ধ-দৃষ্টি করে, করুণ সুরে গান ধরলেন—

"ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হরি।
ভাবিলে ভব ভাবনা যায় রে"—

এই গান শেষ করে, কিছু প্রশ্নের উত্তর আর উপদেশ দিয়ে, শেষে মুক্তির একটি কথায় উপায় বলতে গিয়ে বললেন, "তাঁকে আম্-মোক্তারী দাও, তিনি যা করার করুন।"

গিরিশ, নটীর দল ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

ঠাকুর কালীমন্দিরে নয়, নাটমন্দিরেও নয়, নাট্যালয়ের ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। গিরিশের উপদেশ মত এখানে নটীরা তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে, আবার কেউ পায়ে হাত দিয়ে, প্রণাম করলে। ঠাকুর করুণা-মাখা কথায়, মা থাক্ থাক্! মা, থাক্ থাক্ বললেন। ভক্তরা অবাক্ হয়ে তাই দেখলে। নটীরা চলে গেল। তারা নমস্কার করে চলে গেলে, ঠাকুর ভক্তদের বললেন, "সবই তিনি এক এক রূপে।" পরে ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে গাড়ীতে উঠে সমাধি-মগ্ন হলেন। গাড়ী দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করল।

ভক্ত নরেন ও নরেন্দ্র—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ছোট খাটে বসে আছেন। বাবুরাম, ছোট নরেন, পল্টু, হরিপদ, মোহিনীমোহন—ভক্তরা মেঝেতে বসে আছেন। ঠাকুর ছোক্‌রা ভক্তদের দেখে, আনন্দে বিভোর হচ্ছিলেন। রাখাল এখন দক্ষিণেশ্বরে থাকে না। বৃন্দাবন থেকে

ফিরে এসে বাড়ীতে থাকে। ছোট নরেন আর নরেন্দ্র দুজনেই ছোক্‌রা ভক্ত। কিন্তু নরেন্দ্রের ওপর ঠাকুরের যত ব্যাকুলতা হয়েছিল, নরেনের ওপর তত হয়নি।

গিরিশ ও নরেন্দ্র—

ঠাকুরের গিরিশ ও নরেন্দ্র দুজনেই ভক্ত। কিন্তু দুজনের মত এক নয়। গিরিশ ঘোষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বললে, নরেন্দ্র তার সঙ্গে তর্ক করে, কিন্তু শেষে হেরে যায়। একথা ঠাকুর শুনেও, জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের জামাইয়ের ভাইকে, নরেন্দ্র কেমন, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বল্লেন, নরেন্দ্র খুব বুদ্ধিমান ছোক্‌রা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেন, ইান খুব ভাল লোক কারণ তিনি নরেন্দ্রের সুখ্যাতি করেছেন। কেন তাঁর তার্কিক নরেন্দ্রের ওপর অন্তরের এই ভালবাসা, তা তখন না জানতে পারলেও, পরে সকলেই বুঝেছিল আর জানতেও পেয়েছিল।

ছোট নরেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

ভক্তদের ভেতর ছোট নরেনের দিকে চেয়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে সমাধিস্থ হলেন—পরে সমাধি ভাঙ্গলে তিনি বললেন, "তোর হবে, আসিস এক একবার। তুই কি ভালবাসিস, জ্ঞান না ভক্তি?"

ছোট নরেন বললে, "শুধু ভক্তি!"

ঠাকুর ভক্তির ব্যাখ্যা করে, তার জামা খুলতে বললেন। তারপর সে জামা খুলতে, ঠাকুর তাকে বললেন, "বেশ বুকের আয়তন, তবে মাঝে মাঝে আসিস।"

অন্য ভক্তদের পরীক্ষা ও তার ফলাফল—

পল্টু তাঁর ভক্ত, কিন্তু তিনি তাকে বললেন, "তোরও হবে, তবে একটু দেরীতে।" তারপর বাবুরামকে বললেন, "তোকে টানছি না কেন, শেষে একটা হাঙ্গামা হবে।"

মোহিনীমোহনকে বললেন, "তুমি তো আছই। একটু বাকী আছে, সেইটুকু গেলে, কাজকর্ম, সংসারে থাকে না। সব যাওয়া কি ভাল?"

ব্রাহ্মণ-যুবককে ঠাকুর শেষে বললেন, "তুমি জ্ঞানচর্চ্চা ছাড়—ভক্তি নাও—ভক্তিই সার। বিশ্বাস কর—নির্ভর কর—তা হলে নিজের কিছু করতে হবে না। মা কালী সব করবেন।" ঠাকুর শুদ্ধাত্মা হতে ইঙ্গিত করছেন।

শুদ্ধাত্মা কি ?—

শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত—প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, জন্ম-মৃত্যু নেই—অজর অমর সুমেরুবৎ।

যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে সে জীবন্মুক্ত—সে কি বুঝতে পারে, যে আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহবুদ্ধি আর থাকে না। দুটিই আলাদা—যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে, তার শাঁস আলাদা আর খোলা আলাদা হয়ে যায়। আর কাঁচা সুপারী বা কাঁচা বাদামও এই রকম। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান হলে, বিষয়-রস শুকিয়ে যায়।

ধর্ম্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে—

শ্রীরামকৃষ্ণ মেঝেতে মাদুর পেতে ভক্তদের নিয়ে বসেছিলেন। তিনি তাঁর পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিতে বললেন। তারপর সহাস্যে মাষ্টারকে আবার বললেন, "এর পদসেবার অনেক মানে আছে।" পরে আবার নিজের হৃদয়ে হাত রেখে বললেন, "এর ভেতর যদি কিছু থাকে (পদসেবা করলে) অজ্ঞান, অবিদ্যা, একেবারে চলে যায়।" হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হলেন, যেন কি গুহ্যকথা বলবেন। তিনি মাষ্টারকে বললেন, "এখানে অপর লোক কেউ নেই। সেদিন হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি—দেহটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এল। এসে বললেন, আমি যুগে যুগে অবতার, তখন ভাবলাম মনের খেয়ালে এই সব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিলেন।"

ভক্তরা অবাক্ হয়ে শুনছে। কেউ কেউ ভাবছে—সচ্চিদানন্দ

ভগবান কি রামকৃষ্ণ রূপ ধারণ করে আমাদের কাছে বসে আছেন? ভগবান কি আবার অবতীর্ণ হয়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে আবার বললেন, "দেখলাম সম্পূর্ণ আবির্ভাব তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য!"

স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা হল সোনা—

শ্রীরামকৃষ্ণ যাদের হবে, তাদের বলছেন, "আয়—ওরে—আয়, আমার কাছে আয়!" স্পর্শমণির স্পর্শে সত্যিই লোহা সোনা হয়। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশ ঘোষের সাক্ষাৎ হবার পর থেকেই, তাঁর ভাবান্তর হয়েছে। তিনি ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করেন, বাড়ীতে সর্বদাই ঠাকুরেরই কথা লয়ে থাকেন আর সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন, তাই কত কি দেখেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশের এই ভাবান্তরের কথা শুনে বলেন, "তা হতে পারে—গঙ্গার কাছে গেলে অনেক জিনিস দেখা যায়। নৌকা, জাহাজ—কত কি।"

হেড্-মাষ্টার ও বিশালাক্ষীর দ'—

বেলঘরের তারক তার বন্ধুকে সঙ্গে করে এখানে আসে, তার বয়স আন্দাজ কুড়ি বছর। বিয়ে করেছে, বাসা বৌবাজারে। তাকে তার বাবা এখানে আসতে বারণ করেন। তাই ঠাকুর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তারক এখানে আসে এটা কি খারাপ?"

বন্ধু বললে, "তা আপনি জানেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি হেড্ মাষ্টার।" তারপর সাবধান করে বলেন, "কামিনী-কাঞ্চন থেকে সাবধান। মেয়েমানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর ওঠবার জো নেই। 'বিশালাক্ষীর দ', যে পড়েছে সে উঠতে পারবে না। তাই এখানে এক একবার আসবি!"

মহাজনের কথা ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—

একদিন দেবেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গেলে, ঠাকুর তাকে বললেন, একদিন তোমার বাড়ীতে যাব।

দেবেন্দ্র, "বললে আমি তো তাই বলবার জন্যে এসেছি। এই রবিবারে যেতে হবে।"

ঠাকুর বললেন, "তোমার আয় কম, লোকে বলে না?" কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁর কথায় হেসে বললেন, "কম হলেই বা—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ধার করেও ঘৃত খাওয়া চাই!" ঠাকুর এই কথা শুনে হাসতে লাগলেন। হাসি আর থামে না।

নন্দ বসুর বাড়ীতে নানা দেবদেবীর ছবি ও শ্রীরামকৃষ্ণ –

বাগবাজারে নন্দ বসুর বাড়ী এসে, ঠাকুর নানা ছবি দেখে, ভাবে বিভোর হয়ে পড়লেন। প্রথমে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্ত্তি, হনুমানের মাথায় হাত দিয়ে রামের আশীর্বাদ, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছেন, বামন অবতার, নরসিংহ মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে বৎসগণ চরাচ্ছেন, শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনা-পুলিন, ধূমাবতী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, তারা, কালী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার ছবি দেখে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এ সমস্ত উগ্রমূর্ত্তি বাড়ীতে রাখলে পূজা দিতে হয়। আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে তাই রেখেছেন। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন করে ঠাকুর ভাবে "বাঃ! বাঃ!" বললেন, তারপর রাইরাজা—দোলের ছবি—গ্লাসকেসের ভেতর বীণাপাণির ছবি, সমস্ত দেখে খুব আনন্দ করলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণকে নন্দ বসু বসতে বললেন। তাঁর কথায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "পটগুলি বড় বড়।" তুমি বেশ হিন্দু। নন্দ বসু বললেন, "ইংরাজী ছবিও আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "সে সব অমন নয়। তোমার ইংরাজীতে তেমন ঝোঁক নেই। তিনি আবার বললেন, উগ্র ছবি রাখা ভাল নয়। রাখলে ভোগ দিতে হয়!"

পশুপতি বসু—হেসে বললেন, "তিনি যতদিন চালাবেন ততদিন চলবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তা বটে, ঈশ্বরে মন রাখা ভাল, তাঁকে ভুলে থাকা ভাল নয়!"

নন্দ বসু—"তাতে মন হয় কৈ ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তাঁর কৃপা হলেই হয়।"

নন্দ বসু—"তাঁর কৃপা কৈ হয় ? তাঁর কৃপা করার শক্তি আছে ?"

নন্দ বসু ও পশুপতি বসুর প্রশ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ—

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "বুঝেছি তোমার পণ্ডিতদের মত, যেমন কর্ম করবে, তেমনি ফল পাবে। ও গুলো ছেড়ে দাও, ঈশ্বরের শরণাগত হলে কর্ম ক্ষয় হয়। আমি ফুল হাতে করে বলেছিলুম, মা এই নাও তোমার পাপ—এই নাও তোমার পুণ্য—আমি কিছু চাই না। তুমি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও!"

নন্দ বসু বললেন, "তিনি আইন ছাড়া করতে পারেন ?"

ঠাকুর বললেন, "তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন। তিনি আইন করেছেন, তিনি বদলাতেও পারেন। তবে ভোগের তোমার ইচ্ছা আছে, তাই এই কথা বলছ। এক মত আছে, ভোগে শান্তি না হলে চৈতন্য হয় না। তবে কামিনী-কাঞ্চনের সুখ ক্ষণেক, এই আছে এই নেই! কামিনী-কাঞ্চনের ভেতর আছে কি ? আমড়া আঁটি আর চামড়া খেলে অম্লশূল হয়। সন্দেশ গিলে ফেললে আর নেই। বেশী ঐশ্বর্য হলে, ঈশ্বরকে ভুলে যায়। কামিনী-কাঞ্চন একপ্রকার মদ—মাতালের লঘুগুরু জ্ঞান থাকে না।"

নন্দ বসু—"তা বটে।"

পশুপতি বসু—"আচ্ছা মশাই সুর্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক এই সমস্তগুলো কি সত্যি ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"জানি না বাপু! অত হিসাবে কি দরকার! আম খাও, কত আমগাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটী পাতা, এ হিসাবে আমার কি দরকার ? আমি আম খেতে এসেছি খেয়ে যাই। চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে, তবে ওসব হাব্‌জা গোব্‌জা বিষয় জানতে ইচ্ছে হয় না। ঈশ্বরে মন রাখো চৈতন্য হবে!"

পশুপতি বসু হেসে বললেন, "আমাদের ঈশ্বর-যোগ ক্ষণিক। তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তা হোক ক্ষণকাল, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হলেই মুক্ত।"

পরলোক কি ও পাপের কি শাস্তি হয় ?—

শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুকে বললেন, "পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করছ ?"

"গীতার মত মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হয়। ভরত রাজা হরিণ, হরিণ করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। তাই হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। তাই জপ, ধ্যান, পূজা, এসব রাতদিন অভ্যাস করতে হয় তা হলে মৃত্যু-কালে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। কেশব সেনও এই প্রশ্ন করেছিল, আমি বলেছিলুম, "এসবে কি দরকার ? তারপর আবার বললুম, না যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয় ততক্ষণ সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করতে হবে।"

"কুমারেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকতে দেয়, ছাগল, গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে যায়, তা হলে তৈরী লাল হাঁড়িগুলা ফেলে দেয়। তারপর কাঁচাগুলা কিন্তু আবার নিয়ে, কাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।"

জ্ঞান ও ভক্তি—

শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুকে আরো বললেন, "জ্ঞান-পথ একটা আছে। জ্ঞানীর মতে সব জিনিসেই ব্রহ্মজ্ঞান করে লওয়া যায়। ভক্তিপথে একটু ভেদবুদ্ধি হয়।"

"যে সংসার-ত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে আর বাহাদুরী কি ? সংসারে থেকে যে ডাকে সেই ধন্য! সেই ব্যক্তি বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে তাঁকে দেখে, একটা ভাব আশ্রয় করে তবে তাঁকে ডাকতে হয়। হনুমানের হচ্ছে জ্ঞান-ভক্তি আর নারদের শুদ্ধা-ভক্তি।"

মায়া ও শক্তি—

শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন, রাম

হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমায় কি ভাবে অর্চনা কর ?"

হনুমান বললেন, "কখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, আবার কখন দেখি, তুমি প্রভু, আমি দাস। আর রাম যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি—আর আমিই তুমি।"

রাম নারদকে বললেন, "বর নাও।" নারদ বললেন, "রাম এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা-ভক্তি হয় আর যেন তোমার মোহিনী-মায়ায় মুগ্ধ না হই।"

নন্দ বসু শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলে, "সকল মানুষের শক্তি কি সমান ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করলেন, "সকলের শক্তি কি সমান হতে পারে ? বিভুরূপে তিনি সব ভূতে এক হয়ে আছেন বটে কিন্তু শক্তি বিশেষে। বিদ্যাসাগরও এই প্রশ্ন করেছিল। তাই তাকে বলেছিলাম, শক্তি যদি ভিন্ন না হয় তবে। তোমায় মানে গণে কেন ? তোমার মাথায় কি দুটো শিং বেরিয়েছে ? ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে উঠে পড়লেন। পশুপতি বসু তাঁদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

মহাভাব কি ? সংসার করায় লাভ না লোক্‌সান ?—

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ও মাষ্টার প্রভৃতিকে বলছেন, "এই মহাভাবে আনন্দ যেমন, যন্ত্রণাও তেমন। দেহমনকে তোলপাড় করে। যেমন একটা হাতী কুঁড়েঘরে ঢুকে তোলপাড় করে। ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি সামান্য নয়। রূপ সনাতন এই অবস্থা ভোগ করেছেন। তিনি যে গাছের তলায় থাকতেন, সেই গাছের পাতা পর্যন্ত ঝল্‌সে যেত। আমার এই অবস্থায় বাম্‌নী আমায় ধরে স্নান করিয়ে আনত। আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না। গাছ পাঁচ ডালের ও এক ডালের হয়। আমি একটা নিয়ে আছি। আমার এই অবস্থা নজিরের জন্যে। তোমরা সংসার কর, অনাসক্ত হয়ে। পাঁকাল মাছের মত। কলঙ্ক-সাগরে সাঁতার কেটো কিন্তু যেন কাদা গায়ে না লাগে।"

গিরিশ হেসে বললে, "আপনারও তো বিয়ে হয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথায় বললেন, "সংস্কারের জন্যে বিয়ে করতে হয়। কিন্তু সংসার কেমন করে হবে, গলায় পৈতে থাকে না, খুলে পড়ে যায়, সামলাতে পারি না। শুকদেবেরও বিয়ে হয়েছিল। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল। কামিনী-কাঞ্চনই সংস্কার—ঈশ্বর ভুলিয়ে দেয়। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার কর। তা হলে এই সংসারেরই নাম হবে, বিদ্যার সংসার। মেয়েদের মোহিনী শক্তি অবিদ্যারূপিণী। পুরুষগুলোকে বোকা অপদার্থ করে দেয়। এই সংসার নিয়ে সকলে ভাল আছে। আমার কিন্তু ওসব কিছু ভাল লাগে না—মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আর কিছুই জানি না।"

মায়ের এই একান্ত আশ্রিত সহজ সরল বালক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যিই মা ছাড়া আর কিছু জানেন না। তাই তো তাঁর কাছে কত জ্ঞানী, গুণী কত ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ একে একে আসছেন। তাঁর উপদেশ শোনার জন্য, প্রাণে শান্তি পাবার জন্য, দক্ষিণেশ্বরে কিম্বা কলকাতায় তিনি গেলে, সেইখানে। যেমন মধুর লোভে কোথা থেকে মৌমাছি উড়ে আসে—যেমন পিঁপড়ে কোথা থেকে ছুটে আসে মিষ্টির সন্ধানে—ঠিক তেমনি করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এরা উপদেশ এসে শোনে, শান্তি পায়। জীবনে সংসারে সংসারী হয়ে, যারা জমা খরচের খাতায় কিছুই সঞ্চয় করতে পারেনি, লাভের বদলে লোক্সানই হয়েছে, এখানে তারা কিছু লাভ করে, হৃদয়ের শুধু ভক্তিতে।

কাপ্তেন—পণ্ডিতজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

ইংরেজ ফৌজে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সুবেদারের কাজ করতেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেও পূজার সময় পূজা করতেন, একহাতে তরবারী আর বন্দুক নিয়ে। এই বীর ধার্ম্মিক কাপ্তেন ভদ্রলোকের ছেলে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেক কথা বলে আর শুনে, শেষে বাঙ্গালীদের নিন্দা করে বলেছিলেন, "বাঙ্গালীরা নির্ব্বোধ। কাছে মাণিক রয়েছে চিনলে না।"

এক পণ্ডিতজীর সঙ্গে নানা কথা কয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাতে কিছু হয়েছে ?" তাতে পণ্ডিত বললেন, "বাজার মন্দা রোজগার নেহি।" শ্রীরামকৃষ্ণ দুঃখ করে মাষ্টারকে বললেন, "এই পণ্ডিত রাত দিন টাকা-টাকা করছে, তা না হলে বাড়ীর সেগুলির পেট চলে না। তাই এর দ্বারে ওর দ্বারে যেতে হয়। মন একাগ্র করে তাই ঈশ্বর চিন্তা করবে কখন ?"

গিরিশ ও ত্রৈলোক্যের মতানৈক্য—

গিরিশ বললে, "আপনি অবতার মানেন ?"

ত্রৈলোক্য—"ভক্তেতেই ভগবানের আবির্ভাব বা অবতীর্ণ হয়, অনন্ত শক্তির manifestation হয় না, হতে পারে না।" বাদানুবাদ হচ্ছিল। গিরিশ বললে, "ছেলেদের ব্রহ্ম গোপাল বলে সেবা আর মহাপুরুষকে ঈশ্বর বলে, কি পূজা করতে পারা যায় না ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের কথার মীমাংসা করার জন্যে অবতার সম্বন্ধে বুঝিয়ে বললেন, "অবতারাদি ঈশ্বর কোটি কোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্ছে। তারা কখনই সংসারে বন্দী হয় না। সংসারী লোকেদের, অহঙ্কার আমি, যেন চতুর্দ্দিকে পাঁচিল। মাথার ওপর ছাদ, বাইরের কোন জিনিস দেখা যায় না। মোটা আমি, অবতারাদি আমি, পাতলা আমি, ঐ আমির ভেতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্ব্বদা দেখা যায়। যেমন পাঁচিলে ফোকর থাকলে, ওপাশের মানে অন্য দিকের মানুষ, মাঠ, সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে আনাগোনা পর্যন্ত হয়। অবতারাদি আমি ঐ ফোকরওয়ালা এক একটা পাঁচিল। পাঁচিলের ঐধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়—এর মানে দেহ ধারণ করলেও সর্ব্বদা যোগেতেই থাকে। আবার ইচ্ছে করলে, বড় ফোকর হলে আনাগোনা করতে পারে (তাই) সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে।"

ভক্তরা অবাক্ হয়ে, অবতার-তত্ত্বের কথা যা শুনছে, তা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমস্ত লক্ষণই ছিল।

সংসার—সার না অসার ?—

ত্রৈলোক্য কেশব-চরিতে লিখেছিলেন, ঠাকুর সংসার সম্বন্ধে এখন তিনি তাঁর মত পরিবর্ত্তন করেছেন। তাই গিরিশ ও ত্রৈলোক্য ঠাকুরের কাছে এই সংসার সম্বন্ধে তর্ক করায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যের লেখার প্রতিবাদ করে বললেন, "ভগবানের আনন্দ লাভ করলে, সংসার আলুনি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।" ত্রৈলোক্য বললে, "সংসার যারা করবে তাদের কথা আমি বলছি—যারা ত্যাগী তাদের কথা বলছি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ও সব তোমাদের কি কথা। যারা সংসার ধর্ম্ম করছে তারা একবার ভগবানের আনন্দ পেলে, তাদের আর কিছু ভাল লাগবে না।" তারপর তিনি আবার বললেন, "মানুষ তু'দিক রাখতে চায়—তু'আনার মদ খেলে মানুষ তু'দিক রাখতে পারে কারণ সামান্য নেশা হয়। কিন্তু বেশী মদ খেলে কি আর তু'দিক রাখা যায়!"

গিরিশ ত্রৈলোক্যকে এইবার বললে, "আপনি যা লিখেছেন, তাহলে ও কথা ঠিক নয়।"

ত্রৈলোক্য—"কেন, সংসারে ধর্ম্ম হয়, উনি কি মানেন না?" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "জ্ঞান লাভ করে থাকতে হয়। তখন কলঙ্ক-সাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক না লাগে গায়। তখন পাঁকাল মাছের মত থাকতে পারে। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার, সে বিদ্যার সংসার।"

গিরিশ—"প্রেমই ঈশ্বরের সারাংশ। ঐ প্রেমের কাছে কোন শক্তি কি দাঁড়াতে পারে?"

ত্রৈলোক্য—"যাঁর শক্তি তিনি মনে করলে হয়, সবই ঈশ্বরের শক্তি!"

গিরিশ—"সব তাঁর শক্তি বটে—কিন্তু অবিদ্যা শক্তি।"

ত্রৈলোক্য—"অবিদ্যা বলে কি একটা জিনিস আছে না কি? অবিদ্যা একটি অভাব। যেমন অন্ধকারে আলোর অভাব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"মদ খেলে নেশা হয়। কিন্তু শুঁড়ির দোকানে কত

মদ আছে তার হিসাবের কি প্রয়োজন—অনন্ত শক্তির খবরে আমাদের কাজ কি? ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার খুব ভাল করে তাঁর ভক্তদের ও ত্রৈলোক্যকে বুঝিয়ে বলছেন, "তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? যদি গঙ্গা স্নান করি তা হলে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কি ছুঁয়ে যেতে হবে? সচ্চিদানন্দ সাগর তার ভেতর আমি ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দু'ভাগ জল। ঘটের ভেতর এক ভাগ—বাইরে এক ভাগ। ঘট ভেঙ্গে গেলে, এক জল তাও বলবার জো নেই, কে বলবে। পাতকুয়ার ব্যাঙ পৃথিবী দেখেনি, তাই সে বিশ্বাস করবে না যে পৃথিবী আছে। ভগবানের আনন্দের সন্ধান পায়নি তাই সংসারী সংসার, সংসার করছে। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে সকলে কি ধরতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রকে কেউ বলে সাধু, কেউ বলে মানুষ, কেউ বলে অবতার। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ না পেলে, সে আনন্দের কথা বুঝতে পারে না।" তিনি একটি গল্প এই জন্যে বললেন, "যার যেমন পুঁজি সে তেমন দর দেয়। বেগুনওয়ালা একটা হীরের দাম দিতে চাইলে, সেই হীরের বদলে নয় সের বেগুন। এক কাপড়ওয়ালা আবার সেই হীরের মূল্য নয়শত টাকা—আর জহুরী একবার হীরেটা দেখেই, এক লাখ টাকা দিতে চাইলে। ছাদ থাকলে কি সূর্য দেখা যায়? কামিনী-কাঞ্চন রূপ ছাদ তুলে না ফেললে, সূর্যকে কি করে দেখা যায়! সংসারী লোক তাই যেন ঘরের ভেতর বন্দী।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে সংসার ও সংসারী হয়ে মানুষ কি পায়—আর তার ধর্ম উপার্জ্জনের উপায় কি। তাকে কি রকম অবস্থায় থাকতে হবে। এই সমস্ত উপদেশের পর এখন শুধু সংসার কথাটি যদি ভাগ করা যায়, তাহলে দেখা যায় প্রথম সং তারপর সার। ঠাকুর আমি নিয়ে অনেক বলেছেন, তাই মানুষ প্রত্যেকে সেই 'আমি' স্বয়ং সং সেজে সার শব্দের আগে যোগ হয়ে সংসারে সংসারী। মানুষ সং সেজেছে—কেউ হয়েছে কর্ত্তা, কেউ হয়েছে গিন্নি, কেউ হয়েছে ছেলে, কেউ হয়েছে মেয়ে। তারপর এই

থেকেই, ও আমার আত্মীয়, সে আমার আত্মীয়। এই যেখানেই 'আমি' এল, ঠিক সেখানেই এল, মায়া আর মোহ। আমার সুখে আনন্দ। দুঃখে কষ্ট। আমার নিজের আর আত্মীয়-স্বজনের সুখ, দুঃখে প্রত্যেক সংসারীই আনন্দ ও কষ্ট অনুভব করবেই। তাই ব্যাকরণের প্রথম পুরুষ 'আমি' তুলে নিয়ে বর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ' যোগ কর কারণ প্রথম পুরুষ ও প্রথম অক্ষর একই। তাই যেমন আমি এলেই পরের পর সব আসে, তেমনি 'অ'-এর পর আসে, পরপর অন্য স্বরবর্ণ। তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ। তাই 'সার' কথার আগে 'অ' যোগ হয়ে হল অসার। এখন যদি এই 'সং' আর 'অ' দুটিই তুলে মানুষ ফেলে দিতে পারে, তাহলেই সে 'সার' পাবে। কিন্তু কোথায় ফেলে দিতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাকে এই দুটি ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে। আর সেখানে ফেলে দিতে হবে তোমার নিজের মনকে। জনক ঋষি সংসারী ছিলেন। সমস্তই তাঁর ছিল। সমস্ত কাজকর্মই তিনি করতেন, তবুও কিন্তু তিনি সংসারী হয়েও, হয়েছিলেন ঋষি-শ্রেষ্ঠ বা মহর্ষি-জনক।

ঈশ্বর-সত্ত্বগুণ-রজগুণ-তমোগুণ ও কামনা—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, মাষ্টার, ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাবু, দ্বিজ, বিনোদ এদের নিয়ে বসে আছেন। তিনি নরেন্দ্রকে বললেন, "সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, রজঃ ও তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি, ছুঁচের ভিতর সুতো পরাচ্ছ—কিন্তু সুতোর ভেতর একটু আঁশ থাকলে আর ছুঁচের ভেতর সুতো প্রবেশ করে না। কামনা থাকলে, যত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধি লাভ হয় না। তবে ঈশ্বরের দয়া হলে একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করতে পারবে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তা হলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।"

নরেন্দ্রের প্রমাণের চাহিদা—

শ্রীরামকৃষ্ণের সুমুখে নরেন্দ্রাদির বিচার।

নরেন্দ্র বলছেন, "Proof (প্রমাণ) না হলে কেমন করে বিশ্বাস

করি যে ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।" গিরিশ এই কথায় বললেন, "বিশ্বাসই Sufficient Proof (যথেষ্ট প্রমাণ)।" এই কথার পর একজন ভক্ত বললেন, "বহির্জগৎ আছে তা কি দার্শনিকরা প্রমাণ করতে পেরেছে? তবে বলেছে Irresistible belief বিশ্বাস।" এই কথার পর আবার গিরিশ নরেন্দ্রকে বললেন, "ঈশ্বর মানুষের রূপে এলেও তাঁকে হয়ত বলবে, তুমি মিথ্যা বলছ—তুমি মিথ্যাবাদী ভণ্ড।" তারপর কথা উঠল দেবতারা অমর। তাতে নরেন্দ্র বললে, "তার প্রমাণ কই?"

গিরিশ—"তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না।"

নরেন্দ্র—"অমর Past ages এতে ছিল—প্রুফ চাই।"

মণি পল্টুকে কি বলছিল। তাই পল্টু নরেন্দ্রের প্রতি হেসে বললে, "অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার হেসে বললেন, "নরেন্দ্র উকিলের ছেলে। পল্টু ডেপুটির ছেলে।" এই কথা শুনে সকলে হাসতে লাগলেন।

যোগীন বললে, "নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।"

তার মানে যোগীন বলতে চায়, নরেন্দ্রের ওপর ঠাকুরের খুব ভালবাসা, তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, "একদিন বলেছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ জলও খায়। তখন মাকে বললুম, মা সব কথা কি মিথ্যে হয়ে গেল? ভারী ভাবনা হল। একদিন নরেন্দ্র এসেছে ঘরের ভেতর। কতকগুলি পাখী উড়ছিল দেখে বলে উঠল, ঐ চাতক! ঐ চাতক! দেখি কতকগুলো চাম্‌চিকে, সেই থেকে ওর কথা আর লই না।"

ঈশ্বরের রূপ দর্শন কি মনের ভুল?—

শ্রীরামকৃষ্ণকে যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, "তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ ও মনের ভুল।" তখন অবাক্ হয়ে বললাম, "কথা কয় যে রে!"

নরেন্দ্র বললে, "ও অমন হয়।" তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, "মা একি হল, এসব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে!"

তখন দেখিয়ে দিলে—চৈতন্য—অখণ্ড! চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, "এসব কথা মেলে কেমন করে, যদি মিথ্যে হবে?" তখন বলেছিলাম, "শালা তুই আমার অবিশ্বাস করে দিছ্‌লি। তুই আর আসিস্ নাই।"

নানা মুনির নানা মত ও সন্দিগ্ধ কৌতূহলী নরেন্দ্র—

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে যখন এই সমস্ত, মানে ঠাকুর যখন যা দেখেন, ও সমস্ত মনের ভুল এই কথা বলেন, তখন নরেনের বয়স মাত্র বাইশ বছর চার মাস হবে।

গিরিশ ও মাষ্টারকে নরেন্দ্র বললে, "শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন করে করি।" মহানির্ব্বাণতন্ত্র একবার বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হলে নরক হবে, আবার বলে, পার্ব্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নেই। মনুসংহিতায় মনু লিখেছেন, মনুরই কথা। মোজেসা লিখেছেন, পেণ্ট্যরা টিউক তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছেন।

সাংখ্যদর্শন বলেছেন, "ঈশরা সিদ্ধঃ।" ঈশ্বর আছেন এ প্রমাণ করার জো নেই।" নরেন্দ্র ভাল করে জানার জন্য আবার বলে, "বেদ মানতে হয়—বেদ নিত্য—তা বলে, এই সব নেই বলছি না—বুঝতে পারছি না—বুঝিয়ে দাও! শাস্ত্রের অর্থ যার যা মানে এসেছে তাই করেছি। এখন কোন্‌টা লব? হোয়াইট লাইট (শ্বেত আলো) রেড মিডিয়াম এর (লাল কাঁচের) মধ্য দিয়ে এলে লাল দেখায়। গ্রীণ মিডিয়াম-এর মধ্যে দিয়ে এলে গ্রীণ দেখায়।"

যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্রের কথা শুনে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের কাছে কেঁদেছিলেন। তারপর নরেন্দ্রকে আসতে বারণ করে দিয়েছিলেন। ঠাকুরের কান্না মায়ের প্রাণে বেজেছিল। তাই ঘোর নাস্তিক নরেন্দ্রকে মা ধাক্কা দিলেন এমন ভাবে, যে কেউ

বুঝতে পারলে না—এমন কি নরেন্দ্র নিজে পর্যন্ত। তা না হলে কেন সে ঠাকুরকে বলেছিল, "তুমি যা দেখ ও মনের ভুল।" অর্থাৎ একেবারে সত্য নয়। কিন্তু পরেই আবার কেন তার মনে, নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে, আর ঈশ্বর ও তাঁর বাণী সম্বন্ধে দ্বিমত দেখা দিলে, কে এসে তার মনে প্রশ্ন করে বুঝতে চাইলে, "এসব নেই বলছি না। বুঝতে পারছি না বুঝিয়ে দাও।"

মায়ের কৃপায় নাস্তিক হল আস্তিক—

নরেন্দ্রের এই যে ঈশ্বরকে বুঝতে চাওয়ার প্রশ্নের উত্তর এক ভক্ত প্রথম দিলেন—তিনি বললেন, "গীতায় ভগবান বলেছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের কথা সমর্থন করে বললেন, "গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাক, একখানি ছোট গীতা থাকবে।"

এই ভক্ত তখন সাহস পেয়ে বললেন, "গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—" নরেন্দ্রের মনে এখনও নাস্তিকতা বাদ যায় নি তাই ঠিক সিংহ যেমন গর্জ্জে ওঠে, সাপ যেমন ফোঁস করে ওঠে, ঠিক তেমনি করেই বলে উঠল, "শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন না ইয়ে বলেছেন।"

এখন অবস্থাটা যেমন অনেক সময় মাছ ডাঙ্গায় এসেও, আবার এক লাফে পুকুরের জলে গিয়ে পড়ে ডুব দেয়—ঠিক তেমনি নরেন্দ্রের মাছরূপ মন, আস্তিকরূপ ডাঙ্গায় এসেও, আবার নাস্তিক রূপ পুকুরের জলে ডুব দিয়েছে।

ভক্তের কথায় নরেন্দ্রের উক্তি শুনে, ঠাকুর অবাক্ হয়ে বললেন, "এ সব বেশ কথা হচ্ছে। শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ আছে যেমন শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু নিতে হয়। যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মেলে। চিঠির কথা আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে, কিছুই লই না।"

নরেন্দ্রের মাছরূপ মন পুকুরের তলায় পাঁকের মধ্যে, আশ্রয় নেয় নি। সে সামান্য জলের তলায় ঘোরা-ফেরা করছিল। তাই

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের শক্তিবলে, একবার জলে হাত দিয়েই, তাকে ধরে ফেললেন।

নরেন্দ্র এইবার বললে, "ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলেই হল। তারপর তিনি কোথায় ঝুলছেন বা কি করছেন, এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—অনন্ত অবতার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, আর অনন্ত অবতার এই কথা নরেন্দ্রের মুখে শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হাত জোড় করে নমস্কার করে ভাবে "আহা!" কথাটি উচ্চারণ করলেন।

মণি ভবনাথকে কি বলায় সে বললে, "হাতি যখন দেখিনি তখন সে ছুঁচের ভেতর দিয়ে যেতে পারে কি না কেমন করে জানব? ঈশ্বরকে জানি না অথচ তিনি মানুষ হয়ে অবতার হতে পারেন কিনা, কেমন করে বিচারের দ্বারা বুঝব!"

ঈশ্বর কি যাদুকর?—

ঈশ্বর সম্বন্ধে ঠাকুর যে কথা এইবার বললেন, তাতে মনে হয়, তিনি কি যাদুকর? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "সবই সম্ভব। তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দেন। বাজীকর গলার ভেতর ছুরি বসিয়ে দেয় আবার বার করে। ইট-পাট্‌কেল খেয়ে ফেলে।" ঠাকুরের এই কথা বলার উপস্থিত কারণে নরেন্দ্রের যে ভাবান্তর হল তা সকলে বুঝতে পারলে।

নরেন্দ্রের মনে ভক্তিরসের বন্যা এল—

নাস্তিক নরেন্দ্র যে শুধু আস্তিক হলেন, তাই নয়। তাঁর সেই সিংহের মত গর্জ্জন ও সাপের মত ফোঁস্ করে ওঠা বন্ধ হল। সিংহকে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সাহায্যে, সাপকে ইসের মূল দ্রব্যগুণে যেমন বশ করা হয়, তেমনি মা যেন নিজে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনায় নরেন্দ্রের হৃদয়ে ভক্তিরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। তাই হঠাৎ তাঁর ভাবান্তর হবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কয়েকজন ভক্ত গিরিশ, মাষ্টার, পূর্ণ, পল্টু, ভবনাথ ইত্যাদি সকলকে একের পর একটি করে ভাবে বিভোর হয়ে, কতকগুলি ভক্তিমূলক

গান গেয়ে শোনাতে লাগলেন ও শেষে নারায়ণের অনুরোধে, আবার গাইলেন—

"এস মা এস মা ও হৃদয়রমা, পরাণ পুতলী গো,
হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো।
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে,
জান মা জননী কি দুঃখ পেয়ে।
একবার হৃদয় কমল বিকাশ করিয়ে,
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী!"

শেষে নিজের মনে আবার গাইতে লাগলেন—

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি,
তাই যোগী ধ্যানে ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে উত্তরাস্য হয়ে, দেওয়ালে ঠেসান অবস্থায় পা ঝুলিয়ে তাকিয়ার ওপর বসে ভাবাবিষ্ট হয়ে, পরে সমাধিস্থ হলেন।

সমাধি ভাঙ্গার পর তিনি নানা কথা বলার পর বলেছিলেন, "ঈশ্বরেতে বিদ্যা অবিদ্যা দুই আছে। বিদ্যা মায়া ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। অবিদ্যা মায়া ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাৎ করে লয়ে যায়। বিদ্যার খেলা জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য এইসব আশ্রয় করলে ঈশ্বরের কাছে পৌছান যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বর—

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের পর পর উপদেশ দিয়ে বোঝাচ্ছেন আর এক ধাপ উঠলেই ব্রহ্মজ্ঞান। এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্ছে—ঠিক দেখছি, তিনিই সব হয়েছেন। ত্যজ্য গ্রাহ্য থাকে না। কারুর ওপর রাগ করবার জো থাকে না—গাড়ি করে যাচ্ছি (এই সময়) বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা—দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম। মা কালীর পূজা বা ভোগ দিতে না পারায়, খাজাঞ্চীর কুবাক্যে কেবল হাসতে লাগলাম, একটুও রাগ হল না।

ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গো? মনের নাশ না হলে হয় না। গুরু শিষ্যকে বলছেন, "তুমি আমায় মন দাও, আমি তোমায় জ্ঞান দিচ্ছি।" ন্যাংটা বলতো "আরে মন বিলাতে নাহি!" শ্রীরামকৃষ্ণ ভাল করে এই সম্বন্ধে আবার বুঝিয়ে বলছেন, "ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা মনের নাশ হলেই হয়। মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে তার মধ্যে সূর্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে। কয়টা সূর্য দেখা যাচ্ছে?"

ভক্ত—"দশটা প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। আর একটা সত্যসূর্য তো আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"মনে কর, একটা ভেঙ্গে দিলে, কটা সূর্য দেখা যাবে?"

ভক্ত—"নয়টা, একটা সত্যসূর্য তো আছেই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আচ্ছা নয়টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া গেল, কটা সূর্য দেখা যাবে?"

ভক্ত—"একটা প্রতিবিম্ব সূর্য। একটা সত্যসূর্য তো আছেই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"শেষ ঘট ভাঙ্গলে কি থাকে—" গিরিশকে জিজ্ঞাসা করলেন?

গিরিশ—"আজ্ঞে ঐ সত্যসূর্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"না! কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই আছে। প্রতিবিম্ব সূর্য না থাকলে, সত্যসূর্য আছে কি করে জানবে? সমাধিস্থ হলে অহং তত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না।" এর পর বলরামবাবুর বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের অবস্থায় সেই একই কথা আরো ছোট করে ভক্তদের বলছেন, "আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে, তারই হবেই হবে, মানে তাঁকে লাভ হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই কিছুই চায় না, তারই হবে।"

ভুবনমোহিনী মায়া ও জীবের উদ্ধার—

"এই পৃথিবীতে ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলে মুগ্ধ। ঈশ্বর শ্রীরামচন্দ্র মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, সীতার জন্যে কেঁদে কেঁদে তিনি

বেড়িয়েছিলেন।" পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। তবে একটি কথা আছে, ঈশ্বর মনে করলেই মুক্ত হন।

"ঈশ্বরকোটী—যেমন অবতারাদি মনে করলেই, মুক্ত হতে পারেন।"

গিরিশ—"জীব যদি আষ্টে-পৃষ্টে বদ্ধ হয়, তখন তার উপায়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তবে গুরুরূপ হয়ে, ঈশ্বর স্বয়ং যদি মায়া-পাশ ছেদন করেন, তাহলে আর ভয় নেই।" ঠাকুর ইঙ্গিতে বললেন, "তিনি নিজে জীবের মায়া-পাশ ছেদন করতে দেহ ধারণ করে, গুরুরূপ হয়ে এসেছেন।"

জন্ম-মৃত্যু তত্ত্ব—

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বললেন, "কি জান ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। জীব, জগৎ, বাড়ী, ঘর, দ্বার, ছেলেপিলে এসব বাজীকরের ভেল্‌কি। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌। ঢাকা খুলে দেখ কতগুলো পাখী। আবার পাখীগুলো আকাশে উড়েও গেল! কিন্তু বাজীকরই সত্য আর সব অনিত্য! এই আছে এই নাই।"

"কৈলাসে শিব বসে আছেন। এমন সময় একটা ভারী শব্দ হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুর কিসের শব্দ হল?" শিব বললেন, "রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ।"

খানিক পরে আবার একটা ভয়ানক শব্দ হল।

নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, "এবার কিসের শব্দ?"

শিব হেসে বললেন, "এবার রাবণ বধ হল।"

জন্ম-মৃত্যু ভেল্‌কির মত, এই আছে এই নাই। ঈশ্বরই সত্য আর সব মিথ্যা। জলই সত্য আর ভুড়ভুড়ি এই আছে এই নাই। ভুড়ভুড়ি জলেই মিলিয়ে যায়—যে জলে উৎপত্তি সেই জলেই লয়।

ঈশ্বর যেন মহা সমুদ্র, জীবরা যেন ভুড়ভুড়ি। যে জলে জন্ম, সেই জলেই লয়। ছেলেমেয়ে—যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে পাঁচ-ছটা ছোট ভুড়ভুড়ি।

জীবের শোক—

পৃথিবীতে জীব মাত্রই মায়ায় মুগ্ধ। তাই একের জন্যে যখন অন্যজন মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, তার আপনজনের জন্য সুখে আনন্দ পায়, তেমনি তার দুঃখে পায় অশান্তি কষ্ট। প্রায় সমস্ত জীবজন্তুই এই মায়ার বাঁধনে কম বেশী সুখ দুঃখ ভোগ করে। তবে ইতর পশু-পাখীর খুব অল্প অস্থায়ী। কিন্তু মানুষ এই মায়ায় বদ্ধ বেশী, আর এটা ভোগ করেও বেশী। মানুষ খুব বেশী আপন আপন করে আর মায়ায় পড়ে। তাই মানুষ জন্মালে আনন্দ আর মৃত্যুতে পায় দুঃখ। বিচ্ছেদ থেকেই বিরহ—মৃত্যু থেকেই শোক ভোগ করে। শ্রীরামচন্দ্র তাই পঞ্চভৌতিক দেহধারণ করে, নিজেকে সেই ঈশ্বর বলে ভুলে গিয়ে, মায়ায় মুগ্ধ হন—আর সীতার জন্যে শোক করে কাঁদলেন বারবারই, "হা সীতা! হা সীতা! তোমার বিচ্ছেদ অসহ্য! তুমি কোথায়?" এমনি নানা কাথায় শোক প্রকাশ করে।

আপনজন—

শ্রীরামকৃষ্ণের ছেলেবেলার অতি প্রিয়বন্ধু রাম মল্লিক বিয়ে করে। কিন্তু ছেলেপিলে না হওয়ায় ভাইপোকে মানুষ করে মায়ায় বদ্ধ হয়। তারপর সেই ভাইপোর বিয়োগে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব শোক পায় ও বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এই শোকের সান্ত্বনা লাভের জন্যে যখন আসে, তখন বাগবাজারের এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একমাত্র মেয়ে চণ্ডীর বিয়োগে সেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শান্তির জন্যে ছুটে আসে। তাদের দুজনকেই ঠাকুর বলেছিলেন, "ঈশ্বরই সত্য, তাঁর উপর কিরূপে (প্রকৃত) ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এই চেষ্টা কর, শোক করে কি হবে?" তিনি যেন এই কথা বলতে চাইলেন যে, "তোমার ভাইপো আর তোমার চণ্ডী আপনজন নয়।" তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মাকেই ব্রহ্ম বলেছেন আর রামপ্রসাদ ও আরো অনেক মহা জ্ঞানী ভক্ত তাঁদের উপদেশ আর নানা গানে মাকে ব্রহ্মময়ী বলে সম্বোধন করেছেন। এখানে তাই এই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম—ঈশ্বরী বা

ব্রহ্মময়ী মা'ই সকল মানুষের একমাত্র সুখে দুঃখে শান্তিদায়িনী আপনজন।

বুদ্ধদেব ও যুগবতার—

রাজার ঘরে জন্ম নিয়ে শাক্যসিংহ ঘোর সংসারে সংসারী হলেন। তাঁর পিতা তাঁকে সুখের সাগরে ডুবিয়ে রাখলেন। তিনি সুন্দরী বধূ পেলেন, পুত্রও হল। কিন্তু তিনি সংসারে সংসারী হতে জন্মান নি, তাই হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটল, যে তাঁর মনের পরিবর্ত্তন হল। তিনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও শোক-দুঃখের হাত থেকে, জীবের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হলেন ও সাধনা করে সিদ্ধিলাভের পর অহিংসা পরম ধর্ম প্রচার করলেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি সেই যুগে হিংসার হাত থেকে, তাঁর বহুদিনের সাধনা-লব্ধ অহিংসা-মন্ত্রের প্রচারে, রক্ষা করেছেন অনেক নিরুপায় দুর্বল জীবকে। তিনি সত্যই দয়ার অবতার ছিলেন। ইতিহাস, বৌদ্ধ-শাস্ত্র, বৌদ্ধমন্দির ও যেখানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সেই সমস্ত স্থান দেখলে, শাস্ত্র পড়লে যতটুকু জানা যায় তা কেবল ঐ অহিংসা পরম ধর্ম। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছিলেন, তা থেকে জানা যায়, বুদ্ধদেব ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনেই অবতার। এক ঈশ্বরই যদি যুগে যুগে অবতার হন, তা হলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বুদ্ধ একই। নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া থেকে সবে ফিরেছেন। তিনি সেখানে বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন করেছেন ও মূর্ত্তির সামনে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন। যে বৃক্ষের স্থানে বুদ্ধদেব তপস্যা করে নির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটি নূতন বৃক্ষ হয়েছে তাও দর্শন করেছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের প্রতি সহাস্যে বললেন, "ওখানে (অর্থাৎ নরেন্দ্র বুদ্ধগয়ায়) গিছ্‌লো।"

মাষ্টার—"বুদ্ধদেবের কি মত ? অর্থাৎ বুদ্ধদেব কি নাস্তিক ?"

নরেন্দ্র—"তিনি তপস্যায় কি পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন নি। তাই সকলে বলে, তিনি নাস্তিক।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তার কথার মধ্যে ইঙ্গিত করে বলেন, "নাস্তিক

কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারেন নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধ স্বরূপকে চিন্তা করে, তাই হওয়া।"

নরেন্দ্র—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এদের তিন শ্রেণী আছে বদ্ধ, অর্হৎ আর বোধিসত্ত্ব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"এ তাঁরই খেলা—নূতন একটা লীলা। নাস্তিক কেন হতে যাবেন, যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।"

নরেন্দ্র—মাষ্টারের প্রতি যে অবস্থায় Contradictions meet. যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে শীতল জল তৈয়ারী হয়। সেই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়েই, হাইড্রোজেন ব্লো পাইপে জলন্ত অত্যুষ্ণ অগ্নিশিখা উৎপন্ন হয়। সে অবস্থায় কর্ম ও কর্মত্যাগ দুই সম্ভব। এইখানে নরেন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কথা হয় ও তিনি বলেন, "আমিই সেই।"

সেই ঈশ্বর—সেই অবতার—সেই আমি—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তবে ভক্তের আমি আছে।" ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন, "আমি যা প্রত্যক্ষ করলুম তা বুঝেছিস?" এই কথার উত্তরে নরেন্দ্র প্রথম বলেন, "বুঝেছি।"

ঠাকুর তাঁকে কি বুঝেছিস জিজ্ঞাসা করলে, তখন তিনি বলেন, "ভাল শোনেন নি।" এই কথায় ঠাকুর আবার বলেন, "হৃদয়ে যিনি আছেন, সেই ঈশ্বর এক ব্যক্তি।"

নরেন্দ্র বললে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোঽহং।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে আমি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছেন, ভক্ত আমি, দাস আমি ইত্যাদি। তাই এখানে সেই কথা থেকে ভক্তের আমি আছে, এই কথাই বলে, ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। এখানে একটি লক্ষ্য করা যেতে পারে, যে নরেন্দ্র কেন বুদ্ধগয়ায় গিয়ে, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সামনে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন? গভীর ধ্যানে তিনি কি অনুভব করেছিলেন? এ সমস্ত কিছুই বলেন নি। তিনি শুধু বলেছিলেন, সেখানে যে

বৃক্ষের স্থানে বুদ্ধদেব তপস্যা করে নির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন, সেখানে একটি নূতন গাছ হয়েছে দেখেছেন। এখন এই নূতন গাছ হয়েছে, শুধু এইটুকুই উল্লেখ করেছেন আর কিছু বলেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনে মাষ্টারকে খুব হেসে ছোট করে বলেছিলেন, নরেন্দ্র বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিল। ভাল করে দেখে বুঝে নিতে নরেন্দ্র সেখানে গিয়েছিল, একথা তিনি মুখে না বলে, শুধু হেসে বলেছিলেন, "নরেন্দ্র গিছ্‌ল।" তিনি হেসেছিলেন এই জন্যে যে নরেন্দ্র ভাল করে বুঝে নিতে গিয়েছিল এই কথাই বেশ মনে হয়। কিন্তু দুজনেই সে কথা মুখে বলেন নি।

একজন আর একজনকে তুলে নিতে পারে—

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের ভাল করে বোঝাবার জন্যে বললেন, "ছাদ তো দেখা যায় কিন্তু ছাদে ওঠা বড় শক্ত!"

নরেন্দ্র বললেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত ভক্তদের বললেন, "তবে কেউ কেউ উঠে থাকে, আর একজনকে দড়ি ফেলে দিয়ে তুলে নিতেও পারে।"

এখানে একজন অর্থে গুরু বা মহাপুরুষ আর একজন অর্থে শিষ্য। তাই গুরু শিষ্য বা ভক্তকে তুলে নিতে পারে। কিন্তু কেমন করে? দড়ির সাহায্যে। তাই দড়ি কি? এই দড়ি আর কিছুই নয়, শিষ্য বা ভক্তের ঈশ্বরকে পাবার একান্ত ব্যাকুলতা দেখলে।

গুরু বা মহাপুরুষ যিনি ছাদে উঠেছেন মানে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে বুঝেছেন, দেখেছেন, পেয়েছেন। তিনি নিজে তাঁর কৃপা-রূপ দড়ির সাহায্যে একান্ত ঈশ্বরানুরাগী শিষ্য বা ভক্তকে তুলে নিতে পারেন।

হৃষিকেশের সাধু ও শ্রীরামকৃষ্ণের বিবিধ সমাধি—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বললেন, "হৃষিকেশের এক সাধু আমাকে বলেছিলেন, কি আশ্চর্য! তোমার পাঁচ প্রকার সমাধি দেখলাম, কখন কপিবৎ—দেহবৃক্ষে বানরের ন্যায় মহাবায়ু যেন এ ডাল থেকে ও ডালে লাফ্‌ দিয়ে উঠে আর সমাধি হয়।"

কখন মীনবৎ—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ করে

যায় আর সুখে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর চলতে থাকে আর সমাধি হয়।

কখন পিপীলিকাবৎ—মহাবায়ু পিঁপড়ের মত একটু একটু করে ভিতরে উঠতে থাকে তারপর সহস্রারে বায়ু উঠলে সমাধি হয়।

কখন বা তির্যকবৎ—অর্থাৎ মহাবায়ুর গতি সর্পের ন্যায় এঁকা-বেঁকা, তারপর সহস্রারে গিয়ে সমাধি।

রাখাল (ভক্তদের প্রতি) "থাক্! আর কথায় কথায় অনেক কথা হয়ে গেল, অসুখ করবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যীশুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি—

নন্দ বসুর বাড়ী থেকে ঠাকুর তাঁর প্রতিশ্রুতি মত বাগবাজারে চণ্ডীর মা শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে এলেন। কিন্তু ঠাকুরের আসতে দেরী দেখে, তিনি তখন ঠাকুরের খোঁজে গিয়েছিলেন। তাই তিনি এসে দেখেন, ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর বসে আছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে, এত তাঁর আনন্দ হল যে, সে সকলকে বলতে লাগল, "ওরে তোরা সকলে দেখে যা কে এসেছে—এক মুটে লটারীতে এক টাকায় এক লাখ টাকা পেয়ে, তার এত আনন্দ হল যে সে সেই আনন্দে মরে গেল। তাই ব্রাহ্মণী আবার বললে, তোমরা সকলে আমায় আশীর্ব্বাদ কর, তা না হলে আমিও সত্যি সত্যি মরে যাব!" এই সময় ব্রাহ্মণীর বোন এসে বলেছিল, "দিদি এস না, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হয়!"

ঠাকুর এইখানে এদের নিবেদিত একটু সুজি খেয়ে বলেছিলেন, "আহা! এই এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্লাদ!" মণি ঠাকুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, সে ঠাকুরকে বললে, "কি আশ্চর্য্য! যীশুখৃষ্টের সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল, তারাও দুটি মেয়েমানুষ ভক্ত। তারাও দুই ভগ্নী মার্থা আর মেরী!"

ঠাকুর তাদের গল্প শুনতে চাইলেন।

মণি বললে, "দুই ভক্ত বোনের ভেতর একজন যীশুর খাবার ব্যবস্থা করছেন, তাই সে তাঁর কাছে এসে বললে, "দেখুন দিদির কি

অন্যায়, উনি এখানে বসে আছেন আর আমি সব একলা উদ্যোগ করছি।"

এই কথায় যীশু বলেছিলেন, "তোমার দিদিই ধন্য! মনুষ্য জীবনে প্রয়োজন (ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভালবাসা) তা ওঁর হয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আচ্ছা এই সব দেখে তোমার কি মনে হয়?"

মণি বললে, "আমার মনে হয় যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি একই ব্যক্তি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের শরীরের ওপর আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন. "ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।"

মণি আপনি সেদিন বুঝিয়ে দিলেন ধূ ধূ করছে মাঠ আর তার ভেতর গোল ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে মাঠ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "সে ফাঁকটি কি?"

মণি উত্তর করলে, "সেই ফাঁকটি আপনি।" আবার পরে মণি বললে, "আপনি বলেছিলেন যদু মল্লিকের বাড়ীতে যীশুর ছবি দেখে আপনার ভাব-সমাধি হয়। আপনি দেখেছিলেন, যীশুর মূর্ত্তি, ছবি থেকে এসে, আপনার ভেতর মিশে গেল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "এই যে গলায় এইটা হয়েছে, এর হয়তো কিছু মানে আছে। সব লোকের কাছে হাল্‌কামী করি, না হলে যেখানে সেখানে নাচা গাওয়া হয়ে যেত।" ঠাকুর পরে আবার বললেন, "মানুষের ভিতর তিনি অবতীর্ণ হয়ে লীলা করেন।" ঠাকুরের কথায় বারবার জানা যায়, ঈশ্বর যুগে যুগে মানুষের ভেতর অবতার হয়ে জন্ম নিয়েছেন। তাই জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে ঠাকুরের মতের সঙ্গে মিলে যায় কিছু কিছু আরো জ্ঞানী সাধক মহাপুরুষদের মতের সঙ্গে একেবারে ঠিক।

অলৌকিক ঘটনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা আছে যা

অনেকে সত্য বলে মানতে চায় না। কিন্তু আমি জানি, শুনেছি ও দেখেছি এই রকম অলৌকিক কথা খুব সত্যি।

ঠাকুরের কথিত গিরিজা ও চন্দ্রের সিদ্ধাই এ এক অলৌকিক ঘটনা। এই রকম অনেক অলৌকিক ঘটনা যাতে কেউ অবিশ্বাস না করেন, তারই প্রমাণস্বরূপ এই সমস্ত নানা ভাবের, নানা অলৌকিক ঘটনা যা সাধারণের কাছে গল্পের মত মনে হলেও, শপথ করে বলতে পারা যায়, আসলে এ সমস্ত নিছক সত্যি কথা।

সাধুমা ও মহাতীর্থ কালীঘাট—

আমাদের কাছে সাধুমা এক ঘটনার কথা বলছেন :—ঘটনাটার সময় তখন তাঁর বয়স আন্দাজ বছর দশ হবে। সকালে জলখাবার নিয়ে মায়ের ওপর রাগ বা অভিমান গোছ হাওয়ায়, তিনি তাদের বাড়ীর প্রায় পাশে মা কালীর মন্দিরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

খুব সকাল, তাই বেশী লোকজন মোটেই ছিল না। যা ছিল তাও যে যার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। ঠিক এই সময় এক অতি অদ্ভুত ঘটনা তার চোখের সামনে ঘটে গেল।

বালিকা সাধুমা দেখলে, যেখানে পাঁঠা বলির হাড়িকাঠ আছে, ঠিক সেখানে—একটি বছর বার তেরর মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আহা! কি সুন্দর তার মুখখানি, এমন সুশ্রী সুন্দর মুখ সাধুমা এর আগে আর কখনও যেন দেখেননি। তিনি আমাদের বললেন, দেখ সেই মুখ এমন কি তার কপালের টিপ্‌টি পর্যন্ত আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আহা! কেন ঐ মেয়েটি অমন করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে? এই ভাবতে না ভাবতে, পাশের যে বুড় শিবের মন্দির আছে, তার ভেতর থেকে দুজন কালো বলিষ্ঠ লোক মাথায় ঝাঁকড়া বাবরী কাটা চুল, গায়ে বেণীয়ান আর মাল-কোঁচা করে কাপড় পরা লোক দুটি মেয়েটির কাছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। একজনের হাতে একখানা বড় খাঁড়া রয়েছে। তাই অন্যজন চট্ করে মেয়েটিকে ধরে হাড়িকাঠে পুরে দিলে। কি আশ্চর্য! ওঃ! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু মেয়েটি কোন শব্দ করলে না। কোন

বাধাও এদের দিলে না। তাই যার হাতে খাঁড়া সে এক কোপে মেয়েটির মাথা কেটে, সেই রক্তাক্ত মাথা হাতে নিলে আর অন্যজন দেহটা নিজের কাঁধে নিয়ে, আবার সেই বুড় শিবের মন্দিরেই চলে গেল। এই ব্যাপার আর কেউ দেখলে কিনা সে সম্বন্ধে তাঁর হুঁশ নেই। তবে বোধ হয় ওরা এইবার তারও ওই মেয়েটির মত অবস্থা করবে এটা নিশ্চই! তাই ভেবে, (বালিকা সাধুমা) সে আর একটুও না দেরী করে কাঁদতে কাঁদতে এসে ঘটনাটা বাড়ীর সকলকে বললে। কিন্তু এত কাঁদা আর এত বলা সত্বেও তার কথা কেউ বিশ্বাস করে পাশেই একবার মন্দিরে গেলেন না বরং শেষে বললেন, ওর মাথাটায় জল ঢেলে স্নান করিয়ে দাও! সমস্তই ঈশ্বরের লীলা, এ লীলা বোঝা ভার।

সাধুমার অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। সংসার করে, কয়েকটি ছেলেমেয়ের ভেতর একটি মাত্র মেয়ে শেষে বড় হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটির বিয়ে হবার কিছুকাল পরে সেও মারা যায় ও সাধুমা শ্রীমতী নলিনীবালা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হয়ে কাশীধামে চলে যান। তাই তাঁর এই ঘটনার কথা কি অবিশ্বাস করা যায়? যায় না—কারণ কত পরে এই সন্দেহজনক ঘটনার কথা, তিনি কাশীনিবাসী তাঁর মহাজ্ঞানী ও সাধক গুরুদেবকে বলায়, তিনি শুধু বলেন, "হয়তো কোন এক সময়, পূর্ব্ব জন্মে তুমি ওখানে মহাতীর্থ কালীঘাটের ঠিক ওইখানেই ছিলে আর ওই ঘটনা ঠিক তোমারই সামনে ঘটেছিল।" এর উত্তরে কিন্তু তবু আমার মনে হয়, কথাটা ঠিক হলেও, এমনটি হোল কেন? আর কেন ঐ সুন্দরী সুশ্রী মেয়েটীকে ওরা হত্যা করলে? এটার উত্তর এও হতে পারে তো মানুষ দেবীকে বলি উৎসর্গ করে—কিন্তু মা তো সর্ব ভূতে—তবে? তাই মনে হয় দেবী নিজে জীবের মধ্যে থেকেও বার বার খড়গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে, কালের কোলে ঢলে পড়ে, তারপর তারাই নিয়ে যায় মহাকালের মন্দিরে। জীবের জন্ম আর মত্যু উৎপত্তি আর লয়। এই ভাবেই তারা পশু জন্ম থেকে পায় মুক্তি।

মা কিন্তু জগজ্জননী শক্তিময়ী। তাই শক্তি থেকেই সৃষ্টি আর তারপরই প্রত্যেক জীবই কাল-প্রভাবে চলে যায় সেই অনাদি অনন্ত, সেই অতি শান্ত—অতি অশান্ত—রুদ্র-মহেশ্বরের মন্দিরে।

সাধুমা ও আলিপুরের বাগান—

সাধুমাও আর একটি কথা বলেছিলেন। একদিন বাড়ীর প্রায় বড়রা আলিপুরের বাগান দেখতে গেল। কিন্তু তাঁকে আর কয়েক-জন, যারা ছোট অথচ খেলাধূলা করে ভুলে থাকতে পারে, তাদের নিয়ে না যাওয়ায়, তার মনে বেশ কষ্ট হল। তাই তিনি আর তার সমবয়সী মামা, বয়স দুজনেরই বছর আট হবে—তারা বাগবাজারের ঈশ্বরধাম বাড়ীর ছাদে খেলা করছিলেন। সাধুমা নলিনীর এই মামা, আমাদের ক্ষুদু দাদা। যিনি যৌবনেই সংসারে সংসারী হলেন না, হলেন সন্ন্যাসী। এগিয়ে গেলেন সারের দিকে—শরণ নিলেন যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণের। মন্ত্র নিলেন, স্বামী অভেদানন্দের কাছ থেকে, নাম হল ওঁঙ্কারেশ্বরানন্দ। ওঁঙ্কারেশ্বরানন্দ মনে-প্রাণে সাধন-ভজন করে সিদ্ধ হলেন। কত দুঃখী—কত তাপী—তাঁর মন্ত্রশিষ্য হয়ে কৃতার্থ হলেন। তিনি কয়েকটি আশ্রম স্থাপনা করলেন। শিক্ষার জন্যে মহারাজ ওঁঙ্কারেশ্বরানন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন উচ্চ বিদ্যালয়। ওই তো তাঁর মত আরো কত জ্ঞানী-গুণী শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সাধু হয়ে, ভক্তি-রস-সুধা অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন! জ্বেলে দিচ্ছেন, অন্ধকারে জ্ঞানের প্রদীপ! জানাচ্ছে আহ্বান! এক হয়ে গাইছেন—ভক্তিভরে মধুর কণ্ঠে—

জয় রামকৃষ্ণ চরণ শরণ,
ভজ রে মন-মধুপ মোর!
কণ্টকে আবৃত বিষয় কেতকী,
থেকো না থেকো না তাহে বিভোর।

এই ডাক এই আবাহন-সঙ্গীত, কারো পৌঁছয় কানে আর কারো পৌঁছয় প্রাণে। কানে যাদের পৌঁছয়, তাদের ঐ পর্যন্ত। কিন্তু যাদের প্রাণে পৌঁছয়, তারাই হয় ধন্য!

বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশ, দেবেন্দ্র ইত্যাদি এই রকম আরো কত ভক্ত ছিলেন। তাই বাগবাজারের এই ছেলেটিও ঠাকুরের কাছে মনে হয় শরণ নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই দিন—যে দিন তাঁরা খেলা করছিলেন? তারা তো তুজনেই অবোধ সরল বালক বালিকা, মামা আর ভাগ্নী। তাই নলিনী হঠাৎ বললেন, দেখ দেখ আকাশে ঐ আকাশে আলিপুরের বাগান উঠেছে। তার মানে বোধ হয়, আর তুঃখ করো না! তোমাদের ওরা নিয়ে যায় নি, তাই ঈশ্বর আকাশে কৃপা করে সেই বাগান সৃষ্টি করেছেন। প্রাণ ভরে দেখ কি সুন্দর বাগান! ভাল ভাল লাল, শাদা, নীল, গোলাপী ফুল সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ডালে ডালে ফুটে আছে। আর এর ভেতর নলিনী সে দিন না চিনলেও, ছিলেন নলিনীর কাশীর গুরুদেব, আরো জনকতক মহাপুরুষ। আর ছিলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ সাধুজীবনের ইঙ্গিত হয়ে জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রত্যক্ষদর্শন, দিব্যদর্শন ও স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ও জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন কথায় এই প্রত্যক্ষদর্শন, দিব্যদর্শন ও স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা এই গ্রন্থে * তারকা চিহ্নিত করা আছে। কিন্তু কিছু কিছু লোক এই সমস্ত কথা একেবারে বিশ্বাস করেন না। বিশেষ করে যাঁরা অনেক পড়াশুনা করেছেন, পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে বিদ্বান্ বলে, কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে ছাপ্ মানে ডিগ্রী পেয়েছেন, এই রকম লোকের কথা যে এ সমস্ত মিথ্যা বা চোখের ভুল। অবশ্য এই কথা নরেন্দ্রও শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "ও সমস্ত যা দেখ তা তোমার মনের ভুল।" কিন্তু তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "সে কি রে, মা যে কথা কয়!" তারপর তিনি মাকে বলে, নাস্তিক নরেন্দ্রকে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করালেন। নরেন্দ্র দর্শন করলেন, সমস্ত সত্যি। তারপর দিব্যদর্শন ও স্বপ্নদর্শন যা চন্দ্রমণি, ক্ষুদিরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ বহু ঘটনার কথায় বলেছেন। শিবমন্দিরে ঘুর্ণায়মান জ্যোতি। তাঁর

পাশে একজন বিরাট পুরুষ শুয়ে আছেন ও নানা রকম। ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখলেন, ধানের ক্ষেতে রঘুবীর শিলা। গদাধর পুত্ররূপে জন্মাবেন স্বপ্নে একথাও ক্ষুদিরামকে বলেছিলেন। মথুরমোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে কখন দেখছেন মহাদেব, কখন দেখছেন কালী। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের শরীর থেকে এক সন্ন্যাসী ও বিকটদর্শন বেরিয়ে দুজনের দ্বন্দ্ব। মহাপ্রভু চৈতন্য ও নিতাইয়ের আবির্ভাব ইত্যাদি কত রকম। তাই এইগুলি যদিও সেই সময়ের ভক্ত লেখকদের লেখা থেকে সংগ্রহ কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্ত্তীকালের ওই ধরণের ঘটনায়, ঠাকুর এখনও জড়িত আছেন ও এগুলিও ঠিক তাঁর কথার সঙ্গে মিলে যায়। তাই সেই রকম সত্যি ঘটনার উল্লেখ করেছি ও আরো কিছু নিজের শোনা ও দেখার কথা লিখেছি। সাধুমা ও মহাতীর্থ কালীঘাট এবং আকাশে আলিপুরের বাগান উঠেছে, এগুলি প্রত্যক্ষদর্শন।

গুরু যদি কৃপা করেন—

টালা নিবাসী ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংসারী হয়েও গুরু করেছিলেন এক মহাশক্তিসাধক সন্ন্যাসীকে। এই সন্ন্যাসী ছিলেন তখন বারাসাতে আমডাঙ্গায় মা করুণাময়ীর প্রধান মোহন্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যে ছাদে উঠেছে সে ইচ্ছে করলে দড়ি দিয়ে আর একজনকে ছাদে তুলে নিতে পারেন। তাই ছাদে যদি গুরু উঠে থাকেন, তবে তিনি উপযুক্ত শিষ্য পেলে তাঁকে নিশ্চয় কৃপা করেন ও ছাদে তুলে নেন। ঈশান চট্টোপাধ্যায়ের সাধনার কথা বিশেষ করে, কিছু জানা নেই। কারণ তিনি এ সমস্ত কথা কাউকে বলতেন না। তবে এইটুকু জানা আছে, তিনি করুণাময়ীর মন্দিরের মোহন্ত মহারাজের বহু সন্ন্যাসী শিষ্যদের চেয়েও প্রিয় ছিলেন। কিন্তু কেন তা জানি না। মোহন্ত মহারাজ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাই তিনি দিব্যদৃষ্টিতে বোধহয় দেখেছিলেন ঈশানচন্দ্রের পূর্ব্বজন্মের সাধনা ও সিদ্ধি তাঁর দ্বারাই হবে। তাই তাঁর শিষ্যদের ভেতর ঈশানচন্দ্র সংসারী হয়েও একমাত্র পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনা করতেন। আর তাই সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে এটা কারো

কারো ঈর্ষা ও দুঃখের কারণ হলেও মোহন্ত মহারাজকে কেউ বেশী কিছু মুখে না বলে ভাবে প্রকাশ করত। তারা বলতো, "ঈশানবাবু গুরুকে যাদু করেছেন।" ঈশানবাবু মা করুণাময়ীর কৃপা পেয়েছিলেন তাই তাঁর সেই সাধনার রেশ, মানে পরবর্ত্তীকালে রক্তের ভেতর দিয়ে এখনও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ঈশানচন্দ্রের চারটি ছেলের ভেতর আমার পিতা শিবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিশেষ ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন। প্রথম জীবন থেকে তিনি ছিলেন সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত ও অকাতরে একমাত্র দানই ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম্ম ও ব্রত।

শিবকৃষ্ণের প্রথম জীবনেই জগন্মাতার দর্শন—

অম্বিকা ভাইঝি হলেও প্রায় তখন শিবকৃষ্ণের সমবয়সী। বিয়ে হয়ে গেছে। মাত্র একটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু অম্বিকার দেহ যেন শুকিয়ে যেতে লাগল। শেষে নানা ডাক্তার ওষুধে কোন ফল না হাওয়ায়, সে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সকলেই ভাবছে অথচ ডাক্তারও ওষুধ দিচ্ছে কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। শিবকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখলেন, মা কালী এসে বলছেন, "ছাখ্ এই ছাখ্, এই গাছটা—এই গাছটার নাম এই…তুই এর শেকড়টা অম্বিকাকে পরিয়ে দে, ভাল হয়ে যাবে—ওর ওষুধ ডাক্তার দিতে পারবে না।" আর ভাবে যেন তিনি বলেছিলেন, "ওর ওই ছেলে সংসারী হবে না, হবে সন্ন্যাসী!"

দেবীবাক্য মিথ্যা হয় না—

পিতৃদেব শিবকৃষ্ণ তাঁর নিজের এই স্বপ্ন ঠিক বিশ্বাস করলেন না আর অম্বিকাকে সেই গাছের শেকড়টি পরিয়ে দেওয়াও হল না। ফলে যা হবার তাই হোল। ছোট ছেলেটিকে রেখে অম্বিকা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেল।

অম্বিকার ছেলেটি বড় হল। নাম তার বিনোদ। একটা পাশ করে কলেজে পড়তে পড়তে কিন্তু তার পড়া বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ কলেজে কেন তার লেখাপড়া বন্ধ হল আর কেন সে পরে সংসার ত্যাগ করে, হলেন সন্ন্যাসী ঠিক না জানলেও শুধু জানি তিনি

আমার পিতার খুব ভক্ত ছিলেন। বিনোদ পিতার নাতি সম্পর্কে হলেও, তাকে তিনি বিনোদ নামের বদলে বিনো বলেই ডাকতেন। তাই আমার শৈশবে আমি হঠাৎ একদিন এক গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীকে দেখলুম, কি সুন্দর! আজও আমার মনে আছে। কাকার ঘরে বসে তিনি চোখ বুজে ভাবে বিভোর হয়ে গান গাইছিলেন—

চিন্তয় মম মানস হরি,
চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অপরূপ ভাতি' মোহন মূরতি,
হরি ভকত' হৃদয় রঞ্জন।

নামটা এঁর শুনেছিলুম বিনোদ। বাবার নাতি সেই বিনোদদা বা বিনো তখন একজন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সন্ন্যাসী। যিনি আমাদের মত সকলের সঙ্গে সংসারে দিনের পর দিন থাকতেন। কিন্তু সংসার ছেড়ে চলে গেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রমে। মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী যোগ-বিনোদের কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছেন। তাঁর নাম হয়েছেযোগবিলাস। সন্ন্যাসী হয়ে পরে, ইনি সিমুলতলায় সেখানকার দরিদ্রদের বিনা পয়সায় ঔষধ দিতেন আর ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। এর কিছুদিন পরে তিনি লাঠিপাহাড়ে তাঁর নিজস্ব আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথম কার আদর্শ বা সূত্র ধরে এই পথে আসেন জানি না। তবে মনে হয় তাঁর এই পথের আদর্শ আমার জ্যাঠাইমার ভাই অর্থাৎ আমাদের সম্পর্কে মামা ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বারজন অন্তরঙ্গের একজন—মহাজ্ঞানী বিদ্বান্ ও ভক্ত স্বামী প্রেমানন্দ ভারতী।

মানুষ আয়নার কাছে গিয়ে নিজের মুখ দেখালে, তবেই দেখতে পায়। তেমনি যদি তুমি ভাল হতে চাও তবে তোমাকে ভাল আদর্শের সুমুখে যেতে হবে। আর তাঁরই সূত্র ধরে সেই মহান্ ব্যক্তির আদর্শকে অনুকরণ করতে হবে। তুমি দেখতে পাবে ভবিষ্যৎ

জীবনের উন্নতি—পাবে অন্ধকারে আলোর সন্ধান। দেবীর আরো একটা স্বপ্নাদেশের কথা মিলে গেল। প্রায় চল্লিশ বছর পরে আমার বড় বৌদির তৃতীয় ছেলে হবার পর, ঠিক সেই অম্বিকার মত প্রায় এক বছর ভুগে যখন তাকে শ্যামবাজারের বেশ নামকরা বড় ডাক্তার বিপিন ঘোষ বললেন, আর ওষুধে কোন ফল হচ্ছে না, তোমরা অন্য চেষ্টা কর, গোছ কথা। তাই শুনে আমার পিতা দেবীর আদেশ মত সেই গাছটি আনিয়ে তার শিকড় ধারণের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। শিকড় ধারণ করে দেখতে দেখতে, তারপর থেকে রোগিনী এক মাসের মধ্যে, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। এই ওষুধ তারপর কত জীবন রক্ষা করেছে। এখনও এই ওষুধ সকলকে দেওয়া হয়, আর রোগ যতই কঠিন হোক তার সুব্যবস্থা হয়ে, প্রত্যেকে সুস্থ হয়। তাই স্বপ্ন সত্যি আর দেবীবাক্যও মিথ্যা হয় না, এ থেকে ভাল করে আর কি বেশী প্রমাণ দেওয়া সম্ভব।

ঈশ্বর অনন্ত—ভক্তবাঞ্ছাপূরণকারী—দিকে দিকে রূপে রূপে অপরূপ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন, সমস্ত মিলে যায়। তাঁর পরেও যা আমরা দেখেছি, শুনেছি, আশ্চর্য হয়ে মেনে নিয়েছি, সন্দেহ হলে বিচার করে দেখেছি, স্বপ্নদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শন ও দিব্যদর্শন এ সমস্ত কালভেদে ও পাত্র-পাত্রীভেদে সত্য মিথ্যা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রও এ কথা বিশ্বাস করে। কারণ হাতের রেখায় এই সাধু প্রকৃতির পাত্র-পাত্রীর ঐ সকল দর্শন লাভ হবে এই ইঙ্গিত থাকে। এই রকম রেখা যাঁর হাতে আছে তিনি তাঁর প্রিয় ও সাধক এটা জ্যোতিষগণ সহজেই বুঝতে পারেন। পিতা শিবকৃষ্ণ প্রথম জীবনে স্বপ্নে মায়ের দর্শন পান আর জীবনে বহুবার দিব্যদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শন ও স্বপ্নদর্শনে যা দেখেন তা পরে সত্য বলে প্রমাণ হয়।

একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন ও অনুভব করলেন, শূন্যপথে তিনি যেন এক কোন অজানা আকর্ষণে প্রবল গতিতে যেতে যেতে তাঁর গতি হঠাৎ মন্থর ও পরে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু এ কি! সমস্ত

আকাশভরা নয়নানন্দ মোহনমুরতি! আর এ কি মিষ্টিমধুর কণ্ঠস্বর! সত্যি এমন অতি সুন্দর অবর্ণনীয় রূপমাধুর্যে ভরা যুগলমূর্ত্তি কখনো দেখেন নি আর এমন আওয়াজ তো কখনো শোনেন নি। কিন্তু এই সমস্ত গুহ্যকথা প্রকাশ করা ঠিক উচিত নয়। তবুও করছি এই জন্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বহু গুহ্যকথা প্রকাশ করা উচিত নয় বলেছেন। কিন্তু সেই কথা প্রকাশ করে বলেছেন, এই সমস্ত সত্য বা অসত্য এই নিয়ে কোন আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। কারণ বিশ্বাস আর ভক্তি না থাকলে পৃথিবীতে তো জীবের মুক্তি হবে না বরং তাতে অবিশ্বাসে, অভক্তিতে পাপ এসে তার যদি কল্যাণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাই। এই ধরণের গুহ্যকথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকাশ করা উচিত নয় বলেও আস্তে বলেছেন। ইঙ্গিতে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সকলেই অবিশ্বাস করবে না, সকলেই অভক্তি করবে না, তাহলেও তিনি চুপি চুপি বলেছেন মানে, খুব সাবধান হয়ে, খুব সতর্ক হয়ে বলেছেন, তারপর আরো সাবধান, আরো সতর্কতা যা মুখে প্রকাশ না করে শুধু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভগবান সম্বন্ধে মানুষ শুনুক, বুঝুক, কান থেকে প্রাণে এসে পৌঁছুক সেই ভগবানের কথা। উথ্‌লে উঠুক সুধার সমুদ্র, ভক্তিরসের বন্যা বহে যাক্ আর তাতে ধুয়ে-মুছে যাক্ যত আবর্জনা—যত কালিমা সারা দুনিয়ার মানুষের মন থেকে।

তাই জগতে সমস্ত ভাল কথা বিশ্বাস কর! সমস্ত জটিলতাকে সহজ সরল ভাবে গ্রহণ কর! ঈশ্বরকে জানবার চেষ্টা কর! সকলে ভক্তিভরে তাঁকে ডাক! তাঁকে অনবরত স্মরণ কর! নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোমার যে কোন সত্য মিথ্যা অজ্ঞান অজ্ঞতা মুছে দিয়ে, জটিলতা দূর করে, সহজ সরল ভাবে দেখা দেবেন। প্রহ্লাদের মত তুমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর। হিরণ্যকশিপুরূপ ক্ষমতাশালী অবিশ্বাসী পরাভব স্বীকার করবেই। তাঁর করুণায় চারিধার উদ্ভাসিত হবেই। অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটায়—আর সেই আলোর মাঝে প্রকাশিত হবেই হবে, সেই সকলের সকল দুঃখহারী আনন্দময় ঈশ্বর।

এ সেই আনন্দময় ঈশ্বরেরই বর্ণনা। তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি, তিনি কালী না শিব, তিনি রাধা না কৃষ্ণ, তিনি এক না বহু, তিনি স্থলে না জলে, তিনি অধঃতে না উর্দ্ধে, তিনি কি? তিনি কি? তিনি কোথায়? তিনি কোথায়? যখন ভক্তের অনবরত প্রাণে এইরকম তাঁকে লাভ করার জন্য ব্যাকুলতা, আর এই প্রশ্ন বারবার জাগবে, তখন সেই করুণাময়ের দর্শন হবেই হবে!

তাই পিতৃদেব সাধক শিবকৃষ্ণ যেন কিসের আকর্ষণে—যেন কার আকর্ষণে, চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনি প্রবল আকর্ষণে, শক্তিশালী রকেটের চাইতে প্রবল বেগে কোথায় আর কেন যেতে যেতে থেমে গিয়ে সেই যুগলমূর্ত্তি দর্শন করলেন তা তিনি পূর্বে কিছুই জানতেন না।

আহা! কি তাঁর মূর্ত্তি। সারা নীল আকাশ তাঁর দেহ। বিশ্বব্যাপী সে মূর্ত্তির তুলনা নেই, এত সুন্দর অপূর্ব্ব। আর আকাশের নক্ষত্রগুলো যুগলমূর্ত্তির কাপড়ের জরির গুলের মত ঝক্ ঝক্ করছে।

সেই মূর্ত্তি খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করলেন, "শিবকৃষ্ণ তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

পিতৃদেব শিবকৃষ্ণের হঠাৎ গতি থেমে যাওয়ায় আর এই মূর্ত্তির দর্শনে যে প্রাণের কি আনন্দ আর কি এক ভাব, যা সত্যি মুখে প্রকাশ করা যায় না। তাই তিনি অজানা অব্যক্তভাবে বিভোর হয়ে অনর্গল সংস্কৃততে সেই ভগবানের স্তব পাঠ করতে লাগলেন কিন্তু কি স্তব আর কার স্তব তা তিনি জানেন না। স্তব বন্ধ হয়ে গেল। যেন অনর্গল যাঁর স্তব করাচ্ছিলেন তখন। তিনিই যেন পিতৃদেবের স্তব বন্ধ করে কথা বলার শক্তি দিলেন। তাই তাঁর সেই কথার উত্তরে, তিনি ভক্তিতে গদগদ হয়ে বললেন, "বাবা আমি ইষ্টদর্শনে যাচ্ছি।" সেই বিরাট পুরুষ বললেন, "শিবকৃষ্ণ আমিই তোমার ইষ্ট।" পিতৃদেব একটু ইতস্ততঃ করে খুব আস্তে আস্তে বললেন, "না বাবা! আমার ইষ্ট যে অন্য।"

সেই মূর্ত্তি তখন অল্প হেসে বললেন, "না শিবকৃষ্ণ আমিই

তোমার ইষ্ট—ভক্ত আমায় যখন যে ভাবে ডাকে, আমি তাকে সেই ভাবে দেখা দিই।" সারা পৃথিবী যেন জোরে বোঁ-বোঁ করে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। পিতৃদেবের ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে যেন কি রকম তাঁর মনে হতে লাগল। তখনও মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী আস্তে আস্তে কাঁপছে—আর দূর থেকে যেন কেবল সেই মিষ্টি মধুমাখা কথা তখনও যেন তাঁর কানে ভেসে এসে বারবার বাজতে লাগল, "ভক্ত আমায় যখন যেভাবে ডাকে আমি তাকে তখন সেইভাবে দেখা দিই।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "মনকে যে রংয়ে ছোপাবে সে সেই রংয়ে ছুপবে, লালে ছোপালে লাল, নীলে ছোপালে নীল, হল্‌দেতে ছোপালে হলুদ আবার গোলাপীতে ছোপালে গোলাপী হয়। আর লাল, নীল, হল্‌দে, গোলাপী রকমারি কাঁচের মধ্য দিয়ে শাদা আলোকে দেখলে, সেই রংয়ের আলোই দেখবে।"

তাই সেই জ্যোতির্ম্ময়কে যেমন মন নিয়ে ডাকবে, যে মূর্ত্তিতে দেখতে চাইবে—ভক্তের বাঞ্ছা-পূরণকারী ঈশ্বর তখন তাকে সেই ভাবেই দেখা দেবেন। শিবের ওপর কখন তিনি শিবাণী আবার কৃষ্ণের পাশে তিনি রাধারাণী। কখন তিনি কৃষ্ণকালী আবার কখন তিনি রাধাকে পাশে নিয়ে যুগলমূর্ত্তিতে বনমালা গলে বনমালী। কখন তিনি পুরুষকে পদতলে দলিত করে লীলাময়ী শক্তি। আবার কখন তিনি প্রেমের নিবিড় বাহুর বেষ্টনে পুরুষের কবলায়িত প্রেমময়ী ভক্তি। তাই তিনি যে কি, বোঝা ভার! তিনি কি, তাই বলা বড় শক্ত। শাক্ত বলে, "শক্তি তিনি।" আবার শৈব বলে, "শিব তিনি।" বৈষ্ণব বলে, "বিষ্ণু তিনি।" আবার অদ্বৈতবাদীরা কোন আকার মানেন না। তারা বলেন, "তিনি নিরাকার জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম।" রামকৃষ্ণ বলেন, "তিনি মা ব্রহ্মময়ী।" তাই পিতৃদেব শিবকৃষ্ণকে সেই বিশ্বব্যাপী মূর্ত্তি বললেন,, "ভক্ত যে ভাবে আমায় দেখতে চায়, আমি তাকে সেইভাবে দেখা দিই!"

মৃত্যু-রহস্য রহস্যময় নয়, তাঁর শুধু খেলা—

জীবের জন্ম আর মৃত্যু—! আর তার ভেতরেই তাদের লীলা

খেলার সুরু ও শেষ। এই বিশ্বে সেই ঈশ্বরেরও খেলা চলছে। অনবরতই খেলার মত, এক হাতে তাঁর সৃষ্টি, অন্য হাতে ধ্বংস। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত, নাট্যকার ও শিল্পী গিরিশবাবু সামাজিক, ভক্তিমূলক অনেক নাটক রচনা করেছেন সত্য কিন্তু তিনি বোধ করি বারবার ভেবেছেন কি না জানি না, যে যাদের দেখার জন্যে ও যাদের নিয়ে নাটক লেখা তারাও তো এই বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে অনবরত অভিনয়ই করে চলেছে—কিন্তু তাদের পরিচালকের নির্দ্দেশ মত এ নাটকের রচনা ও পরিচালনা কে করছেন? নাট্যকারদের নাটকের অভিনয়ের সময় এক একটি দৃশ্যে, শিল্পীদের অভিনয়ের মত সিন পড়ছে, পট-পরিবর্ত্তন হচ্ছে। তারপর এক একটি অঙ্কে ড্রপ মানে যবনিকা পড়ছে, কনসার্ট (যন্ত্র সঙ্গীত) হচ্ছে। তারপর এইভাবে কোন নাটক নাট্যকার এক অঙ্কে, কোনটা দুই অঙ্কে, কোনটা তিন অঙ্কে, কোনটা চার অঙ্কে, আর কোনটা পাঁচ অঙ্কে শেষ করে, শেষে ড্রপ মানে শেষের যবনিকা ফেলেছেন। নাটক দেখে দর্শকরা হাসির নাটকে হেসে আর কান্নার নাটকে কেঁদে চলে গেছে। তারপর নাট্যকার ও পরিচালককে, কেউ ধন্যবাদ, কেউ গালাগাল দিয়েছে। নটনটীদের কেউ সুখ্যাতি করে চলে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য নটনটী আর এত দর্শক কে কোত্থেকে এল, কোথায় গেল, তার হিসেব তো নেই। তবে টিকিট কেনা-বেচার হিসেব আছে। টিকিট খুব বেশী বিক্রী হলে, সকলের আনন্দ আর কম বা অতি সামান্য হলে দুঃখু লোক্‌সান। তাই এত হৈ হৈ সোরগোল তারপর কোথা থেকে কে এল, কোথায় চলে গেল, তার কোন হিসেব নেই। তবে যারা ভাল গন্ধ মেখে আসে, তাদের নিজেদের গন্ধ কিছু রেখে ছড়িয়ে দিয়ে যায়। তাও অল্প সময়ের জন্যে। তাই কি ঠাকুরের ভক্ত (নাট্যসম্রাট) মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক মস্ত অথচ ছোট প্রশ্নে লিখেছিলেন—আসা আর যাওয়া সেটা কোথায়?

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।"

তারপর তিনি এই প্রশ্নের উত্তর ঠাকুরের কাছ থেকে যে সমস্ত উপদেশ পেয়েছিলেন তাই আর নিজের জ্ঞান ও মহাভাবে বিভোর হয়ে যা উপলব্ধি, বোধ হয় করেছিলেন—তাই শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্যা অথচ কবিতার মাধ্যমে লিখেছেন—এই জন্ম আর মৃত্যুরহস্য রহস্যময় নয়—তাঁর খেলা মাত্র। গিরিশ লিখেছেন :—

পঞ্চভূত লয়ে করে, মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগ বিয়োগ তাঁর ছেলেখেলা প্রায়।
একত্র বাঁধিলে সাধে, পঞ্চভূত হাসে কাঁদে,
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায় মিশায়।

আমার বড় পিসিমা শ্রীমতী তিনকড়ি দেবী একজন সুলেখিকা ছিলেন। তিনি তাঁর প্রিয় কন্যার মৃত্যুতে "বনলতা' নামে একটি কবিতার বইয়ে কোন এক কবিতায় লিখেছিলেন :—

"কোথা থেকে এসেছিলি, কোথায় বা চলে গেলি।
চিহ্ন শুধু রহিল রে, বজ্রসম হৃদি মাঝে।"

আমাদের সকলের অতি আদরের ছোট বোন পদ্মমুখী ছিল রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী। কিন্তু মাত্র সতের বছর বয়সে তার হঠাৎ ঠোঁটে একটি ফুসকুড়ি (ইরিসিপ্লাস) হল। এই রোগ ভোগের আট দিন পরে সে একটু ভালর দিকে এসেও সকলকে ছেড়ে বাধ্য হয়ে কোন নিরুদ্দেশের পথে চলে গেল। সকলে শোকের সাগরে ডুবে গেল কিন্তু সকলেই কাঁদতে কাঁদতে ওই একই প্রশ্ন করলে, কোথায়—কোথায় গেল? যে যত জ্ঞানী হোক সাধু হোক, একবারও তবু বলবেই, তাই তো—কোথায় গেল।

এই প্রশ্নের ঠিক উত্তরের জন্যে আমি সামান্য কিছু কিছু বই যাতে পরলোকের কথা আছে পড়েছিলুম। কিন্তু তখন এই সমস্ত পড়ে ঠিক আমার মনের মত উত্তর না পেয়ে, শেষে হতাশ হয়ে অশান্ত মনে চুপ করেছি। জেনেছি বুঝেছি এর কোন সন্ধানই কেউ ঠিক দিতে পারেনি।

আমাদের মেসোমশাই ভবানীপুর নিবাসী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। পদ্মমুখী তাঁর কাছ থেকেই

ধ্রুপদ গান শিখে বেঙ্গল মিউজিক্ ইত্যাদি বহু পরীক্ষায় সকলের প্রথম হয়ে, সোনার মেডেল পেয়েছে। এস্রাজ বাজনাতেও প্রথম হয়ে পুরস্কার পেয়েছে। তাই তার জন্যে তিনিও মনে মনে খুবই শোকার্ত্ত হলেও, তবু মুখে তিনি জোর করে আমায় বললেন, তোমার উত্তর আমি দিতে পারি—যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর ঠিক দাও। আমার মনে এত দুঃখেও, এই কথায় যেন আনন্দ হোল। ভাবলুম, মেসোমশাই শুধু সঙ্গীতাচার্যই তো নয়, তিনি সমস্ত শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত—তাই মেসোমশাই নিজেই ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথম বললেন, "আচ্ছা বলতো সে কোথা থেকে এসেছিল?" একটা ধাঁধাঁ লাগলো, তাই এই প্রশ্নের সঠিক কি উত্তর দেব, ভেবে না পেয়ে বলতেই হোল জানি না। তিনি তখন আরো একটু জোর দিয়ে বললেন, "তবে জানতে চাইছ কেন কোথায় গেল?" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে আবার বললেন, "সে কোথায় গেল জান, যেখান থেকে এসেছিল সে সেখানেই চলে গেল।" পরে তিনি রামপ্রসাদী গানের কটা লাইন বলে চুপ করলেন। তবে বেদশাস্ত্র যা বলছে তাই গানের ভেতর রামপ্রসাদও বলেছেন—

"বল না রে ভাই কি হয় ম'লে?
বেদের আভাষ, তুই ঘটাকাশ,
সেই ঘটের নাশকে মরণ বলে।"

বেদের কথা—বেদ চির সত্য! ঈশ্বরের বাণী! তা হলে?

এই তা হলের উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন—"সে সচ্চিদানন্দ সাগর থেকে বুড়বুড়ির মত উঠেছিল আবার সেই সচ্চিদানন্দ সাগরেই লয় হয়ে গেল।"

ঠাকুর বলেছেন, "একটা বড় বুড়বুড়ি তার পাশে এধারে ওধারে চার পাঁচটা ছোট, এইভাবে জীবের জন্ম আর মৃত্যু উৎপত্তি আর লয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা—

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কৃপা করে, কত জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন।

কত গল্প বলেছেন। কত অলৌকিক ঘটনার কথা সাধারণের মনে অসত্য মনে হলেও তিনি প্রমাণ করেছেন এই ঘটনা একেবারে নিছক সত্য। ঈশ্বরের কৃপা হলে, যেমন সবকিছু অসম্ভবও সম্ভব হয়, তেমনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপায় অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। তিনি তাঁর ভক্তকে কৃপা করে, তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছেন, সমস্ত দিক থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ায়. সতীর পতির সুমতি লাভ—

শ্যামপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে একটি স্ত্রীলোক এসেছেন। মুখখানি তার বড় করুণ। কি চাই? এই কথার উত্তরে সে বললে, স্বামী মাতাল উচ্ছৃঙ্খল সমস্ত রোজগার মদ খেয়ে নষ্ট করে। স্বামীর মন যাতে ভাল হয় এই প্রার্থনা। ঠাকুর তাকে নহবতে সারদার কাছে পাঠালেন। সতীর দুঃখে দুঃখী সারদা পূজার বেলপাতায় ঠাকুরের নাম লিখে দিলেন আর ঠাকুরেরই নাম জপ করতে বললেন। সতী স্ত্রী বার বছর সারদার এই আজ্ঞা পালন করলেন।

একদিন দানাকালী দক্ষিণেশ্বরে হঠাৎ তার স্ত্রীকে নিয়ে হাজির। তখন ঠাকুর তাকে বললেন, "বউটাকে বার বছর কষ্ট দিয়েছিস।" এ কথা ঠাকুর জানলেন কি করে, যে কালীপদ স্ত্রীকে দেখত না কেবল মদ খেত? অদ্ভুত পরিবর্তন। আজ সেই মাতাল কালীপদ ঠাকুরের দয়ায় স্ত্রীর প্রতি সদয় হয়েছে। এমন কি স্ত্রীকে নিয়ে সে হাজিরও হয়েছে ভক্ত হিসাবে।

কোথা থেকে আসে? কোথায় যায়? কেন আসে? কেন যায়?—

এই পৃথিবীতে জীবের জন্ম শুক্র আর শোণিতের সংমিশ্রণে—পরে জীব পায় তার পঞ্চভৌতিক দেহ ক্ষিতি (মাটি), অফ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বাতাস), বোম্ (শূন্য) থেকে। জীবের আরামতেই তার কর্মেরও আরম্ভ হয়। পরে তার কর্মশেষে কুকর্মে পড়ে থাকে, ছড়িয়ে থাকে দুর্গন্ধ আর সুকর্মের পড়ে থাকে সুগন্ধ। যাকে তার স্মৃতি বলা যেতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির পর থেকে এই

জীবের জীবন সেই আত্মা কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায় এই সমস্যা নিয়ে এর আলোচনা হয়েছে। সমস্তই প্রয়োজনে হয়। আসে আর যায়। প্রয়োজনেই এলেন, ভৈরবী যোগেশ্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভৈরবী সাধনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে স্ত্রীলোক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম গুরু, যে অদ্ভুত ভৈরবী সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণকে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শিখিয়ে পরীক্ষায় পাশ করালেন, কাল-প্রভাবে সেই ভৈরবীর শক্তি কোথায় গেল—তিনি গেলেন কোথায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদ খেতে চিনু শাঁখারী এসেছে। তার ভক্তি দেখে যোগেশ্বরী মহা খুশী। তাই ভক্তকে এঁটো পরিষ্কার করতে না দিয়ে তিনি নিজেই পরিষ্কার করতে গেলেন। হৃদয় তেড়ে এলো আর গাঁয়ের বামুনমেয়েরা হৃদয়ের দিকে হল। যোগেশ্বরী বললে, "চিনু ভক্ত। ভক্তদের আবার জাত কি ?" হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর লেগে গেল খুব ঝগড়া। যোগেশ্বরী শেষে ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরল।

হৃদয় বাঁশ নিয়ে মারতে এলো। তারপর বাঁশ রেখে ভৈরবীকে হঠাৎ ঢিল ছুঁড়ে মারায়, ভৈরবীর কান থেকে রক্ত পড়তে লাগল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেঁদে বললেন, "হৃদে তুই কি করলি ?" যোগেশ্বরীর যেন কি হল। উপরের দিকে তাকায় আর ভয় পায়। কয়েকদিন পরে যোগেশ্বরী কোথায় চলে গেল।

মুসলমানধর্ম শিক্ষা দিতে এলো মুসলমান গুরু। কিন্তু তিনি কি সেই যশোদানন্দন রাধিকারঞ্জন সেই গোবিন্দ ? প্রয়োজনে মুসলমান গুরু গোবিন্দরায় রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের তিনদিনের মুসলিম-ধর্মজীবনে এসে তাঁর সামনে দেখা দিলেন।

কোথা থেকে এলেন নাগাসন্ন্যাসী তোতাপুরী। আবার তাঁর কাজ শেষ হতে কোথায় তিনি চলে গেলেন, এ কথা কেউ জানে না। ভৈরবী আর তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণের দু'ধারে দু'জন গুরুর আসন আলো করে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু কালপ্রভাবে কোথায় তাঁরা গেলেন তা কেউ জানে না। প্রয়োজন শেষ হতেই তাঁদের শক্তি কাল হরণ করলে, তাঁরা চলে গেলেন, যেমন তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর অর্জ্জুনের শেষে

হয়েছিল—আর তাই যদুবংশ ধ্বংস হবার শেষের দিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই যাওয়া-আসা আর প্রবল-প্রতাপ সমস্তই জগতের যা কিছু একধারে জন্মাচ্ছে আর একধারে কোথায় চলে যাচ্ছে—এই কথা চিন্তা করছিলেন কিনা ঠিক জানা না। থাকলেও এই ধরনের একটা কথা চলিত আছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—তিনি অবতার। কিন্তু তাঁরও কালপ্রভাবে এই একই অবস্থা—তাঁর যদুবংশ ধীরে ধীরে কোথায়—কোথায় নির্মূল হয়ে গেল। বোধহয় এই চিন্তার সময় ব্যাধের সামান্য তীরে তিনিও চলে গেলেন এই পৃথিবী থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় অনেক কিছু দেখতেন—কখন কত কথা বলতেন—আবার কখন অবোধ শিশুর মত চুপ করে থাকতেন। যেন কিছুই বোঝেন না, জানেন না। আবার কখন বা কেঁদে অস্থির, নিজের জন্যে নয় ভক্তের জন্যে।

অন্তর-দৃষ্টি-সম্পন্ন অন্তর্যামী-শ্রীরামকৃষ্ণ—

কাশীপুরের মহিমাচরণ ঠাকুরকে ভক্তি করেন কিন্তু নিজেকে একটা মস্ত পণ্ডিত আর সাধক মনে করেন। পরেন গেরুয়া, রুদ্রাক্ষের মালা, পঞ্চবটী বনে বসে থাকেন, তারপর ঠাকুরের ঘরে বাঘছাল টাঙ্গিয়ে রেখে যান।

ঠাকুর বলেন, ও এখানে বাঘছালটা রেখে যায়, লোকে জিজ্ঞাসা করবে, জানতে চাইবে বলে। ওর তাহলে নাম হবে আর তাতেই হবে তৃপ্তি। ইংরাজী সংস্কৃততে পণ্ডিত, তাই পণ্ডিতমশাইয়ের মুখে খই ফোটে। নিজে একটা স্কুলও করেছেন। তার নাম দিয়েছেন প্রাচ্য আর্য-শিক্ষা-পরিষদ। ছেলের নাম রেখেছে মৃগাঙ্ক মৌলি পতিতুণ্ডি। হরিণের নাম রেখেছেন কপিঞ্জন। গুরুর নাম আগমাচার্য ডমরুবল্লভ।" তাই দক্ষিণেশ্বরে মহিমাচরণ প্রথম দিন যেতেই ঠাকুর তাঁকে বললেন, "একি এখানে জাহাজ কেন? ছোট-খাট জেলে ডিঙ্গি আসতে পারে, একেবারে জাহাজ এলো!"

ঠাকুর বাইরে সহজ সরল, মহিমাচরণের মত বড় বড় কোন কথা কন না। ভালও বাসেন না। তবে বিদ্বান্ পণ্ডিত যদি

কিছুর ব্যাখ্যা করতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যেত তা তিনি এক কথায় বলে বুঝিয়ে দেন। তাঁর বাইরে বাহ্য আড়ম্বর ছিল না, ছিল অন্তর্দৃষ্টি। সমস্তই তাই চট্ করে বুঝতে পারতেন, দেখতে পেতেন। আর দূরের কথা শুনতে আর জানতেও পারতেন। এমনকি ভবিষ্যতেও যা ঘটবে তাও তার অন্তরে এসে বাজত।

ভাইপো অক্ষয় বিষ্ণুমন্দিরের পূজারী হলেন। কিন্তু তার ভক্তি দেখে বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাই অন্তরের গুহ্যকথা প্রকাশ করে বললেন, "হৃদে লক্ষণ ভাল না ছোঁড়াটা বাঁচবে না।"

একবার ঠাকুর শ্বশুরবাড়ীতে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে বললেন, "আমি খাইনি ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।"

সেদিন অনেক লোকজন খেয়েছে কিছুই খাবার নেই, তাই মেয়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। কি হবে ঘরে কিছু নেই। ঠাকুর বললেন, "আছে ঘর খুঁজে দেখ।" খুঁজে পান্তাভাত হাঁড়িতে দেখতে পেলে, কিন্তু জামাইকে কি তা দেওয়া যায়। ঠাকুর বললেন, "তাই আন।"

সারদা বললেন, "আর কিছুই নেই।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "নিশ্চয় আছে!" সত্যি একটা মৌরলা মাছ আর কিছু তার কাই ছিল, তাই এনে দিলে।

ঠাকুর খুশি মনে তাই খেতে লাগলেন।

একদিন শাশুড়ীর দুঃখ শুনে ঠাকুর বললেন, "মা দুঃখ করছেন কেন, এরপর আপনার মেয়ে মা ডাক শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে উঠবে।" সেই ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। আজও কাউকে তাঁকে মা বলে ডাকতে শেখাতে হয় না। তাই মা সারদামণি ছোট বড় সকলের কাছে, জগৎমাতা হয়েই আছেন!

একবার কাঙ্গালী-ভোজনে এক পাগল এসেছে। কাঙ্গালীরাও তার অবস্থা দেখে নিজেদের ভেতর বসতে দেয় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে ঐ পাগলকে দেখে বুঝে নিলেন—তাই হৃদয়কে বললেন, "হৃদে ও পাগল নয়, জ্ঞানোন্মাদ!"

পাগল কাঙ্গালীদের এঁটো পাতা কুড়িয়ে খেতে লাগল।

হৃদয় পাগলের পিছু নিয়ে বলতে লাগল, "মহারাজ ভগবানকে কি করে পাব বলে দিন।" পাগল কোন উত্তর না দেওয়ায়, হৃদয় যখন নাছোড়বান্দা হয়ে পিছু পিছু যায় আর প্রশ্ন করে, তখন পাগল হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পচা নর্দমার জল দেখিয়ে বললেন, "গঙ্গা-জল আর পচা নর্দমার জল যেদিন তোর কাছে এক হবে!" হৃদয় তবু ছাড়ে না, বলে, "মহারাজ আমায় চেলা করুন।" পাগল "তবে রে শালা" বলে, ঢিল কুড়িয়ে নিলে—হৃদয় এইবার পালালো।

সুরেশ মিত্তির একজন দুর্ধর্ষ লোক। তিনি কেশব সেনের খোলের চামড়া কেটে দিয়ে, বিডন স্কোয়ারে বক্তৃতা করতে দেয় নি। সেই সুরেশ মিত্তির বললে, "ওহে রাম তোমার গুরুর কাছে নিয়ে চল। কেমন হংস একবার দেখে আসি।" রাম দত্ত বললেন, "আচ্ছা।" তিনি বললেন, "তোমার রামকৃষ্ণ যদি আমায় শান্তি না দিতে পারে তবে তার কান মলে দিয়ে আসব কিন্তু।" তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে ফিরে এসে বললেন, "কানমলা দিতে গিয়ে কানমলা খেয়ে এসেছি।"

আমায় ঠাকুর কৃপা করেছেন—

রাম দত্ত বললেন, "বিলে শোন একবার আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চল পরমহংস দেখে আসবি।" কিন্তু উত্তরে বিলে বললে, "এত বই পড়ে কোন কিনারা পেলাম না, এখন কিনারা করবে একটা মূর্খ কৈবর্ত্তদের পূজারী বামুন?"

রাম দত্ত বললেন, "একবার চল না"—শেষে বিলে বললে, "যদি রসগোল্লা না খাওয়াতে পারে, তবে কানমলে দিয়ে আসব।" কৈলাস বসুও রাম দত্তের অনুরোধে ঠাকুরকে দেখতে যেতে রাজী হলেন কিন্তু বললেন, "লোক ভাল হয় তো ভাল, না হলে কানমলে দিয়ে আসব।"

বিলে মানে নরেন্দ্রকে ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। অবিশ্বাসী নরেন ঠাকুরকে কিন্তু প্রথম থেকেই ঠাট্টা করে কথা কইতেন। পরে

শেষ পর্যন্ত, নিজেই নিজের আস্তে আস্তে কানমলে, ঠাকুরের ভক্ত হয়ে পড়লেন। কেশব, নরেন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর কয়েকজন ঠাকুরের কাছে বসেছিলেন। তারা চলে যেতে ঠাকুর বললেন, "জানিস কি দেখলাম? দেখলাম, কেশব একটা শক্তির উৎকর্ষে জগৎ বিখ্যাত হয়েছে। নরেনের ভেতর ওরকম আঠারোটা শক্তি আছে। কেশব ও বিজয়ের অন্তর জ্ঞানলোকে উজ্জ্বল। নরেনের ভেতর জ্ঞান-সূর্যের উদয় হয়েছে।"

এই কথা শুনে নরেন বললে, "কি বললেন, এসব কথা শুনলে লোকে আপনাকে পাগল বলবে। জগৎ বিখ্যাত কেশব সেন, বিজয় গোস্বামী আর একটা স্কুলের ছোঁড়া। এমন সমস্ত কথা আর বলবেন না।"

ঠাকুর বললেন, "কি করব রে, মা যে আমাকে ঐ রকম দেখালেন।" ঠাকুর বলছেন তাঁর অন্তর দৃষ্টি তা মায়েরই দেওয়া। মা তাঁকে দেখাচ্ছেন।

রাম দত্ত কৈলাস বসুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এলে, একজন লোক এসে বললে, "ঠাকুর আমাকে পাঠিয়েছেন, যে বাবুটি ঠাকুরের কান মলে দিতে চেয়েছেন, ঠাকুর তাঁকে ডাকছেন।" স্যার কৈলাস বসু স্তম্ভিত হলেন। সিমলার ঘরে বসে যে কথা হয়েছে, সে কথা ইনি জানলেন কেমন করে!

ঠাকুর অন্তর্যামী তাই বহু দূরের কথা শুনতে পান, জানতে পারেন। আবার কখন কখন ছেলেমানুষের মত কথা বলেন।

গিরিশ মাতাল হয়ে ঠাকুরকে বাপান্ত করলে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে এসে বললেন, "গিরিশ আজ আমায় যা তা বলেছে।" সবাই বললে, "তার কাছে যান কেন?" ওটা একটা পাষণ্ড। ঠাকুর একেবারে ছোট ছেলে যেমন বলে, ঠিক তেমনি ছেলেমানুষের মত বললেন, "তা বলে এমন করে গালাগাল করবে?"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে রাম দত্ত বললেন, "কেন খারাপ কি করেছে? আপনি যা বলান ও তাই বলেছে।"

ছোট ছেলেদের যেমন হঠাৎ মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হয় তেমনি ঠাকুরের পরিবর্ত্তন ও খুব আনন্দ হল। তিনি হেসে বললেন, "শোন শোন, রাম কি বলছে!" এই কথার পরই, তিনি উঠে দাঁড়ালেন কারণ তিনি নিজে ভুল করেছিলেন, তাই বুঝতে পেরে, ভুল শোধরাতে আবার তাঁকে যেতেই হবে। তাই তখুনি তিনি বললেন, "গাড়ি আনতে বল, আমি আবার যাব! রাম তুমিও সঙ্গে চল, নরেন তুইও আমার সঙ্গে আয়!"

"মারলে বলে কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে জগাই মাধাই মাতাল অবস্থায় গালা-গালমন্দ যথেষ্ট করে, শেষে কলসীর ভাঙ্গা কানা ছুঁড়ে মারলে। দর দর করে, শ্রীগৌরাঙ্গের কপাল থেকে লাল টক্‌টকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। এ যেন সেই শ্রীকৃষ্ণের আবির খেলা। গোপিনীরা রাঙ্গা আবীরের কুম্‌কুম্ ছুঁড়ে তাঁকে রাঙ্গা করে দিয়েছে, কিন্তু তবু প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে রঙ খেলছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ এগিয়ে চলেছেন জগাই মাধাইয়ের দিকে, প্রেমভরে প্রেম বিতরণের জন্যে মুখে মধুর সংকীর্ত্তন করতে করতে—পাপী কেউ থাকবে না, সমস্ত পাপ প্রেমের স্পর্শে ধুয়ে মুছে দিতেই হবে। তেমনি প্রেমিক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গিরিশের কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

একের পর এক করে, ক্রমে দলে দলে ভক্তের আগমন—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ক্রমে একের পর আর এক ও পরে দলে দলে লোক আসতে লাগল। কখন কখন তাঁদের উপরোধ তাঁকে রাখতে কলকাতায়ও যেতে হত। তিনি যীশুর কথা শুনে বলে-ছিলেন, "এই যে গলায় একটা হয়েছে, এর মানে আছে।" এর মানে তিনি যুগে যুগে যুগবতার। যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করার সময় ছবিতে দেখা যায় যে যীশুর হাতে, গলায় নানা স্থানে পেরেক বিদ্ধ করা হয়। এটা বোধ হয় তাঁর সেই আঘাতেরই কথা।

ভক্তের সংখ্যা দিন দিন যেমন বেড়েছে, তেমনি তাঁরা অনবরত

এসেছে, নানা কথাবার্ত্তা ও প্রশ্ন করেছে এবং ঠাকুর তাদের অনর্গল উপদেশ দিয়েছেন। তাই এইভাবে ঠাকুরের অতিরিক্ত পরিশ্রম হতে থাকায় তাঁর শরীরও খারাপ হয়ে পড়ল।

ভাল করে চিকিৎসার জন্যে ঠাকুরকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের অবস্থা তখন একেবারে খুব খারাপ হয়ে দাঁড়াল।

কলকাতায় নিয়মিত ডাক্তার ও ওষুধের ব্যবস্থা হল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসা করতে লাগলেন কিন্তু অসুখ বিশেষ কোন ভালর দিকে এল না বরং দিনের পর দিন বাড়তেই লাগল। রোগের উপশম না হওয়ায়, শরীরের অবস্থা ক্রমে ক্রমে খুব খারাপ হয়ে উঠল। তাঁর মুখের ঘা বহু ওষুধেও আর সারল না। যে জন্যে কলকাতায় আসা, সে আশা না পূর্ণ হয়ে, বেড়েই যেতে লাগল। ডাক্তার ওষুধে কোন ফল হল না কেন? নাম করা ডাক্তার, তাই তাঁর দেওয়া ওষুধে কেন কিছুই সারল না? এটা যেন সকলের মনের একটা প্রশ্ন হয়ে উঠল।

কলকাতার সেই বাড়ী—

কলকাতার শ্যামপুকুর স্ট্রীটে যে বাড়ীতে তিনি থাকতেন, সেই বাড়ীটি এখনও আছে। কলকাতায় শ্যামবাজারে শ্যামপুকুর স্ট্রীটের সেই বাড়ীটিতে একটি প্রস্তরফলকে ইংরাজীতে লেখা আছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিছু সময় এখানে ছিলেন।'

কতদিন চলে গেছে কিন্তু সেই বাড়ীটি পথিকের আজও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, জানায় সে ধন্য হয়েছে! যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বাড়ীতে কিছু সময় ছিলেন।

হেডমাষ্টারের হেডমাষ্টার শ্রীরামকৃষ্ণ—

ঠাকুর নরেনকে ও অন্যদের বলতেন, "অন্যেরা ঘট, কলসী, নরেন জালা। অন্যেরা ডোবা, পুকুর, নরেন দীঘি। নরেন যেন খাপ্‌খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘুরছে। বিদ্যাসাগর হচ্ছেন ক্ষীরসমুদ্র। গিরিশ বসু রসুন গোলাবাটি। বাবুরাম নতুন হাঁড়ি। শশধর পণ্ডিত আকাশে

দ্বিতীয়ার চাঁদ। শ্রীমা ছাই চাপা বেরাল।" আর নিজেকে বলতেন, "ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।"

ভক্তকে কত ছোট কথায়, কি চমৎকার তুলনামূলক উপমা তিনি দেন, সেই রকম উপদেশের কথা—

মেট্রোপলিটন স্কুলের হেডমাষ্টার মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর বন্ধু সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে বরানগরে বেড়াতে এসে তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে আসেন।

মহেন্দ্রকে ঠাকুর কেশব সেনের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "তাঁর খুব অসুখ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আমিও শুনেছি বটে।" এই কথার পরই যেন কি ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে ?"—"আজ্ঞে হ্যাঁ হয়ে গেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাঃ। এই কথা বলেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলে হয়েছে ?"

মহেন্দ্র বললে, "হ্যাঁ একটি ছেলে হয়েছে।" ঠাকুর বেশ একটু থমকে বললেন, "যাঃ ছেলেও হয়ে গেছে। কি আর হবে। তোমার মধ্যে ভাল লক্ষণ ছিল। কিন্তু পরিবার কেমন—বিদ্যাশক্তি না আদ্যাশক্তি ?"

হেডমাষ্টার মহেন্দ্র গুপ্ত এইবার বললেন, "ভাল তবে অজ্ঞান।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার এই কথা শুনে বললেন, "তুমি বুঝি মস্ত জ্ঞানী ? শোন অনেক জানার নাম অজ্ঞান আর এক জানার নাম জ্ঞান।"

হেডমাষ্টার সব মাষ্টারের সেরা মাষ্টার। যা কিছু সমস্তই হেড-মাষ্টার ব্যবস্থা করেন ও ভাল করে নিজে ছাত্রদের পরপর শক্ত শক্ত বিষয় (subject) পড়ান ও ভাল করে জ্ঞান দিয়ে বুঝিয়ে দেন। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ এই হেডমাষ্টারের ওপর হেডমাষ্টারী করে তাঁকে অজ্ঞান আর জ্ঞান সম্বন্ধে খুব সামান্য কথায় বুঝিয়ে দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা—

ঠিক এই রকম খুব ছোট করে শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত কথা সকলকেই বলেন, তাই ঠাকুরের অসুখ বেড়েছে দেখে শ্রীমার মন চঞ্চল। তাঁর মনে পড়ে গেল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "যখন দেখবে আমি যার তার হাতে খাচ্ছি, কলকাতায় রাত কাটাচ্ছি, খাবার আসে, নিজের খাবার অন্যকে দিয়ে দিচ্ছি, বুঝবে আমি দেহ রাখব।"

ঠাকুর কলকাতায়—খাবার আসে—একদিন সবটুকু খাবার তিনি নরেনকে দিয়ে দিলেন। তাঁর রোগ বেড়ে চলেছে, ভক্তেরা মুচড়ে পড়ল। তাই কলকাতায় চিকিৎসায় তাঁর কোন ফল হল না দেখে, তাঁকে কামারপুকুরে নিয়ে যাওয়া হল।

এখানেও ডাক্তাররা সাধ্যমত চিকিৎসা করলেন। ভক্তেরা সাধ্যমত সেবা করলেন কিন্তু কোন ফল হল না। শ্রীরামকৃষ্ণ এখন সমস্ত বুঝতে পারলেন। তারপর তাই সকলকে জানালেন, "মার কাজ আর বাকী নেই, শেষ হয়ে গেছে।"

কাশীপুর বাগানবাড়ী—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কাশীপুর বাগানবাড়ীতে আনা হল। চিকিৎসার যত রকম চেষ্টা সমস্তই চলতে লাগল। ঠাকুরের এই অসুস্থ অবস্থায়ও ভক্তের আসার কিছু কম নেই। তারা আসে, ঠাকুরের তাদের সঙ্গে কথা কয়ে শরীর খারাপ হয়। তাই তাঁর শিষ্যেরা সকলকে তাঁর কাছে যেতে দেন না।

দানাকালীর সঙ্গে এক অপরিচিত সাহেব—

একদিন নিরঞ্জন পাহারা দিচ্ছে—এমন সময় দানাকালী এক সাহেব বন্ধুকে নিয়ে হাজির। দানাকালীর সঙ্গে সাহেবকে দেখে, নিরঞ্জন পথ ছেড়ে দিলেন। পথ ছাড়া পেতে তারা উঠে এল ওপরে ঠাকুরের ঘরে, একেবারে বিছানার কাছটিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিনোদিনা—

অপরিচিত সাহেব তার মাথার হ্যাট খুলে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললে, "আমি বিনোদিনী—আমি চৈতন্যলীলার সেই বিনোদিনী।"

ঠাকুরকে এই কটি কথা বলতে বলতে বিনোদিনী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

তার কান্না, ঠাকুরের রোগাক্লিষ্ট মুখ দেখে উথ্‌লে উঠল। মেঝেতে সে বসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ের ওপর মাথা রাখলে। ঠাকুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি পরে বললেন, "খুব ফাঁকি দিয়েছ। মেয়েছেলেকে সাজিয়েছ সাহেব। বাহাদুর তুমি কালীপদ।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তের সংখ্যা কত ?—

দলে দলে ভক্তের সংখ্যা ঠাকুরের বেড়েই চলেছে। তবে অনেকে সংসারে থেকে সংসারী ভক্ত হলেও, কিন্তু তারাও অতি প্রিয়—যেমন গিরিশ, দেবেন, কালীপদ, রাম দত্ত, চণ্ডীর মা, গোপালের মা, বিনোদিনী আরো কত।

সংসারী ভক্ত ছাড়া যাঁরা সংসার ত্যাগ করার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে হয়েছিলেন সন্ন্যাসী, এই রকম ভক্তের নাম দেওয়া হচ্ছে।

আগে তাঁদের যে নাম ছিল কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে যা হল।

নরেন্দ্র—বিবেকানন্দ। ২। রাখাল—ব্রহ্মানন্দ। ৩। বাবুরাম—প্রেমানন্দ। ৪। যোগেন—যোগানন্দ। ৫। নিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ ৬। শশী—রামকৃষ্ণানন্দ। ৭। তারক—শিবানন্দ। ৮। হরি—তুরিয়ানন্দ। ৯। কালী—সারদানন্দ। ১০। শরৎ—অভেদানন্দ। ১১। গোপাল—অদ্বৈতানন্দ। ১২। লাটু—অদ্ভুতানন্দ। ১৩। সারদা—ত্রিগুণাতীতানন্দ। ১৪। সুবোধ—সুবোধানন্দ। ১৫। গঙ্গাধর—অখণ্ডানন্দ। ১৬। হরিপ্রসন্ন—বিরজানন্দ।

এই সমস্ত সন্ন্যাসী ভক্তরা ঠাকুরের কাছে থাকতেন, তাঁরাই যা কিছু সেবা-শুশ্রূষা করতেন আর ভাবতেন ঠাকুরের আরোগ্যের কথা।

কাশীপুরে মা সর্ব্বমঙ্গলা ও রামপ্রসাদ—

একবার ঠাকুর কাশীপুর দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করেছিলেন, এক মদের দোকানে, খদ্দের দাম দিয়ে মদ খেয়ে, রাস্তায় মাতাল হয়ে

মাতলামি করছে। কিন্তু যে বিক্রয় করছে, সে কপালে মা কালী সর্ব্বমঙ্গলার টিপ পরে, মায়ের দয়ায় বেশ আনন্দেই মদ বেচছে।

মায়ের দয়ায় সমস্তই হয়, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোড়ার গাড়ীতে ভাবাবেশে বললেন, "জাগ্রত ওই মা সর্ব্বমঙ্গলা।" মানে কতদিনের ওই মা সর্ব্বমঙ্গলা রঘু ডাকাতের যিনি পূজা নিতেন—ভক্ত রঘু ডাকাত মায়ের দয়ায় ধনীর ঘর থেকে নির্বিঘ্নে অর্থ এনে দরিদ্রকে দান করতেন। রঘু ব্রাহ্মণ ও সিমলাইদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাই এখনও মা সর্বমঙ্গলার পূজার পালার প্রায় বেশী অংশই তাঁদের। দয়াময়ী, সকলের কল্যাণময়ী, মা সর্বমঙ্গলা গঙ্গাবক্ষে নৌকায় রামপ্রসাদের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আবার তাকে ফিরে গাইতে বলেন, "গা রে মাঝি ফিরে গা।" মাঝি রামপ্রসাদ বলেন, "সাধ থাকে তো ফিরে চা।" তাই মা সর্বমঙ্গলা দক্ষিণমুখী ছিলেন দেখা গেল ফিরে রামপ্রসাদের গান শুনতে হয়েছেন পশ্চিমমুখী। এখন মন্দিরের পশ্চিমেই মার বড় দরজা আর দক্ষিণ দিকেও একটি ছোট দরজা আছে।

সমস্তই তাঁর দয়া ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই। তাই ঠাকুর এই কাশীপুরে জাগ্রত মা সর্বমঙ্গলার কথা উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আসা আর যাওয়ার আদিতে, মধ্যে ও শেষেতে একই অক্ষর—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম কামারপুকুর—মাঝে থেকেই মানে পৈতা হবার পর থেকে কালীর পূজা ও আরাধনায় কাটে ও শেষে আসেন কাশীপুরে। তাই একই অক্ষর 'কা' এই কটি কথায় প্রথমে। পুকুরেই পদ্ম ফোটে তাই প্রথম ফুটলেন তিনি কামারপুকুরে। পরে কর্ম্মের জন্য প্রথম এলেন কলকাতায়। ফুটলেন ঝামাপুকুরে ও শ্যামপুকুরে কিছু সময়ের জন্যে। তাই তাঁর জীবনে এই তিনটি পুকুরেই তিনি পদ্মের মত পাপ্‌ড়ী মেলে ফুটে উঠেছেন। দক্ষিণেশ্বর আর কাশীপুর—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির একটির উজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে আছে আর থাকবেও।

এই কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতে এলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। কারণ শ্যামপুকুরের বাড়ীতে শ্রীমায়ের আর তাঁর একটু অসুবিধা হত।

বাড়ী ছোট। কিন্তু এখানে বড় বাড়ী, বাগান, সমস্তই ভাল। কিন্তু তবুও যত দিন যেতে থাকে, ঠাকুর দুর্বল হয়ে যেতে লাগলেন।

নরেন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ ও শক্তিদান—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নরেনকে ডেকে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দীক্ষা দিলেন ও আশীর্ব্বাদ করলেন। নরেনের মনে হল যেন একটা আগুনের ঝলক্ ঠাকুরের দেহ থেকে তার দেহে প্রবেশ করে ছড়িয়ে গেল। ঠাকুর বললেন, "তোকে সব দিয়ে আজ আমি ফকির হলাম। তোকে অনেক কাজ করতে হবে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম আর মায়ের মহিমা প্রচার করে দেশজোড়া নাম হবে—এরা রইল, সব ভার তোর ওপরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য আত্মবলি—

নাগমশাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন, তাই তাঁকে ঠাকুর বললেন, "দুর্গাচরণ ডাক্তার তো পারল না। তুই পারিস আমাকে সারাতে?" নাগমশাই তাঁর কথায় বললেন, "পারি!"

ভক্তেরা বলে উঠল, "পারেন?"

"নিশ্চয়ই পারি" বলে, নাগমশাই ঠাকুরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠাকুর তাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "ওরে না তুই যা ভাবছিস তা আমি করতে দেব না। আমি জানি তুই আত্মবলি দিয়ে এ রোগ সারাতে পারিস। আমি তা তোকে করতে দেব না, তোদের জ্বালা নিতেই আমার আসা। নাগমশাই চুপ করে বসে রইলেন। ভক্তদের মনে পড়ল মোগল বাদশাহ বাবরের আর যযাতির বহু—বহুদিন আগের কথা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরেনকে আশীর্ব্বাদ ও শক্তিদানের পর—

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ ও শক্তিদানে অসীম শক্তিলাভ করলেন। ঠাকুর নরেনকে এর আগে অনেক উপদেশ দিয়েছেন তবে এই তাঁর শেষ উপদেশ শেষ আশীর্ব্বাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ব্রহ্মচারী। তিনি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু

ব্রহ্মচর্য ভ্রষ্ট হননি। নারীমাত্রকেই তিনি মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন। তিনি সকল স্ত্রীলোকের মাঝেই মাকে দেখতে পেতেন। কোন বড় কাজ ব্রহ্মচর্য ছাড়া হয় না, তিনি এই উপদেশই সকলকে দিতেন।

তোতাপুরী তাঁকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন আর তাঁর বেদান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে, খুব সন্তুষ্ট হয়ে দিয়েছিলেন—পরমহংসদেব উপাধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সহজ সরল মীমাংসা—

গুরুর কাছে শিক্ষা দীক্ষা ও বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলেই মানুষের জ্ঞান হয়। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম থেকেই বড় বড় শাস্ত্র তো দূরের কথা ছোট বড় কোন পুঁথিগত বিদ্যাই তাঁর ছিল না তবুও অনেক বড় বড় নামকরা জ্ঞানী পণ্ডিত তাঁর মুখের কথা আর সহজ সরল উপদেশ শুনতে বহু দূর দেশ থেকে আসতেন। ঠাকুর অতি সাধারণ উপমায় নানা শাস্ত্রের জটিলতা সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন, মীমাংসা করে দিতেন, যা সত্যি ভাববার কথা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কোন একটি ঘটনায়, এই ধরণের সহজ সরল কথায় অন্যান্য শাস্ত্রের যুক্তি খণ্ডন করে ও শাস্ত্রকারদের তিনি যে যুক্তি তখন দিলেন, যে মীমাংসা করে দিলেন, তা একবাক্যে সকলকেই ঠিক বলে স্বীকার করে নিতে হল।

রাধাগোবিন্দের পূজায় বিঘ্ন—

রাধাগোবিন্দের পুজা করেন ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জে। তিনি রোজ রাধারাণী আর কৃষ্ণকে মন্দিরের সিংহাসনে এনে বসান আর বিকালে শয়ন ঘরে নিয়ে যান। দুপুরবেলা ভোগ-রাগ অনেক হয়েছে, এখন বিরাম পর্ব।

ক্ষেত্রনাথ রাধারাণীকে অন্য ঘরে শুইয়ে এইবার গোবিন্দকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই দিনটা জন্মাষ্টমীর পরের দিন।

কি আশ্চর্য! হঠাৎ আজ তিনি পড়ে গেলেন। নিজে যদিও সামলে নিয়েছেন কিন্তু বিগ্রহের একটি পা ভেঙ্গে গিয়েছে।

ক্ষেত্রনাথের বরখাস্ত—

বিগ্রহের পা ভেঙ্গে যাওয়ায়, সকলেই গোলমাল করতে লাগল, আর ক্ষেত্রনাথের হঠাৎ এই অনিচ্ছাকৃত ঘটনায়, কাজ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হল। কিন্তু সকলের তুমুল গোলমালে আর নির্দোষ ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রনাথকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে কৃষ্ণের ভাঙ্গা পা কি জোড়া লাগল? না লাগল না—ভাঙ্গা পা জোড়া লাগল না।

এই ব্যাপারে রাণী রাসমণি অস্থির হয়ে উঠলেন ও মথুর মোহনকে সভা বসিয়ে কি করা যায় তাই বড় বড় পণ্ডিতদের বিধান নিতে অনুরোধ করলেন।

পণ্ডিতসভায়, পণ্ডিতদের শাস্ত্রসম্মত বিধানে, রাণী রাসমণির অবস্থা—

বিগ্রহের জন্যে মথুর সভা বসালেন। সভা বসল। ন্যায়চঞ্চু তর্কচূড়ামণি পণ্ডিতরা মাথায় লম্বা টিকি দুলিয়ে অনেক শাস্ত্র ঘেঁটে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, ভাঙ্গামূর্ত্তি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন মূর্ত্তি বসাতে হবে। তাই নতুন দেবমূর্ত্তি ফরমায়েস হয়ে গেল। কিন্তু রাণী এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি কাঁদতে লাগলেন, কারণ তাঁর অন্তরে সুখ নেই, শান্তি নেই। তাঁর কেবল মনে হচ্ছে গোবিন্দ তুমি কি পাথর, না তামা পেতল, যে তোমায় ফেলে দেব? না তা হয় না তোমায় জলে ফেলে দেওয়া যায় না। তার চেয়ে তুমি আমায় চোখের জলে ফেলে রাখ।

মথুর রাণীর অস্থিরতা বুঝতে পেরে, মনে মনে ভাবলেন, সরল গদাধরকে জিজ্ঞাসা করি। তিনিই সকল জটিলতা দূর করে, তরল করে দেবেন এই সমস্যা।

মথুর গদাধরকে বললেন, "তুমি কি বলো—তোমার মন কি বলে?"

গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণের বিধান—

গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রশ্নে একটু ঝেঁজে বললেন, "রাণীর জামাইয়ের যদি আজ ঠ্যাং ভাঙ্গত তবে রাণী কি করতেন? যেমন পণ্ডিত তেমন পাতি!"

মথুরকে তিনি আবার বললেন, "রাণী কি জামাইকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে নতুন জামাই তার জায়গায় বসাতেন ?"

সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। সকলকেই এক বাক্যে বলতে হল, "না কখনই নয়। জামাইকে চিকিৎসা করে সারাতে হত।" গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তাহলে এখানে এই ব্যবস্থা করলেই ভাল হয় !"

সকলেই চুপ করে রইল। কে কি আর এই কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলবে। সহজ সরল উপমায় বিধান দিলেন।

গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "হ্যাঁ গো ভাঙ্গা পা জোড়া বিগ্রহ আবার আস্ত ঠাকুর হয়ে যাবেন। তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার আগের মত তাঁর সেবা পূজা সমস্ত চলবে।"

এমন সহজ মীমাংসা শুনে, পণ্ডিতেরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। অনেকে শাস্ত্র পড়ে আপত্তি জানালেন, কিন্তু শাস্ত্র কি করবে, রাণীর মন যা চায় তিনি তাই পেয়েছেন। বুক তাঁর আনন্দে ভরে গেছে। তাই তিনি গোবিন্দকে বললেন, "কত সহজের মধ্যে তুমি ধরা দিলে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, পুরনোই ভাল—

নতুন বিগ্রহের ফরমায়েস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু রাণী রাসমণি গদাধরকে পুরনো বিগ্রহের ভাঙ্গা পা জোড়া দিতে বলায়, তিনি নিখুঁতভাবে বিগ্রহের পা জুড়ে দিলেন।

নূতন মূর্ত্তি এলে, মথুর ঠাকুরকে আগের মূর্ত্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে বলায়, শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজে অন্তরের মাঝে মিলিয়ে বললেন, "পুরনো বিগ্রহটিই ভাল !"

আবার একটি জটিল প্রশ্ন ও তার সমাধান—

বিগ্রহ নিয়ে আবার এক জটিল প্রশ্ন উঠল। বিগ্রহের পা জোড়া দিয়েছেন ঠাকুর একথা ঠিক, কিন্তু খুঁত হয়ে রইল যে। অঙ্গহীন বিগ্রহের কি পূজা হবে ?

এই প্রশ্নের উত্তর নিজেই ঠাকুর আগে বলেছিলেন, "বিগ্রহের পা জোড়ার পর সেবা পূজা সমস্তই চলবে !"

এখন খুঁত সেই নিয়ে নানা কথা, প্রশ্ন ওঠায়, এই জটিলতা আরো সরল করে দিলেন। তিনি বললেন, খুঁতের জন্যেই প্রিয় হয় আরো প্রিয়! রাণী রাসমণি ধ্যানে দেখলেন, পুরনো বিগ্রহের মাঝেই এখন সেই ভক্তের ভগবান তাঁর গোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীরামাকৃষ্ণের বিচার ও তাঁর অন্তর দৃষ্টির কথা রাণী নিজের অন্তরে ধ্যানের সময় মিলিয়ে পেলেন। গোবিন্দ নিজে দেখা দিয়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা অতি সত্য বলে প্রমাণ করে দিলেন।

অতি সহজ সরল কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু কিছু উপদেশ নিয়ে পূর্ব্বে অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু তবু সমস্ত সময় মনে রাখার জন্যে বহু অমূল্য উপদেশের মধ্যে কয়েকটি দিলাম।

(১) ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, বাঘের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। কিন্তু তার কাছে যাওয়া উচিত নয়—স্ত্রীলোকের সঙ্গ করাও উচিত নয়। (২) যেমন পুঁজি তেমনি দর। (৩) বৃথা তর্কে কোন ফল হয় না— তাঁর কৃপা হলেই সকলে বুঝতে পারে। (৪) গেরুয়া পরিধান করলেই মন সহজে সাধনার উপযোগী হয়। (৫) যে বিদ্যালাভ করলে, তাঁকে জানা যায়—তাই বিদ্যা, আর সব অবিদ্যা। (৬) কূপের ব্যাঙ নিজের কুয়াটাকেই জানে। (৭) পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। (৮) সংসারে থেকে সব কাজ কর কিন্তু দৃষ্টি রাখ তার পরে। (৯) ভগবানের নাম যে রকম করেই কর না কেন, তাতেই কল্যাণ হবে। (১০) ঈশ্বর এক বৈ দুই নয়। ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন নামে ডাকে। (১১) সংসারী জীব মনেতে সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ মনন করতে পারলে আর তাদের অন্য কোন সাধনার দরকার হয় না। (১২) সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাকলে ভগবানকে লাভ হয়। (১৩) সহ্যগুণের চেয়ে আর বড় গুণ নেই। সকলের সহ্যগুণ থাকা চাই। (১৪) এক ডুবে রত্ন না পেলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করো না, ধৈর্য্য ধারণ কর সময়ে ঈশ্বরের কৃপা হবে।

(১৫) কে কার গুরু? ঈশ্বর সকলের গুরু। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। (১৬) ধ্যান করবে মনে, বনে, আর কোণে। (১৭) চুষিকাঠি ফেলে মা বলে কাঁদলে, মা ছেলের কাছে দৌড়ে আসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আলোর সন্ধান—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন। আর সেই উপদেশ এত সহজ, এত সরল যে তাতে ভক্তের প্রাণে অতি সহজেই ভাব জেগেছে। সে দেখতে পেয়েছে আলোর সন্ধান। পাপ করেও যারা তাঁর শরণাগত হয়েছে তিনি তাদের পাপ মুছে দিয়েছেন, তাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই অজানাকে জানার পথ—দিয়েছেন আলোর সন্ধান।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও চিকিৎসা—

এই ধরণের পরিশ্রমের ফলে কিন্তু ঠাকুরের একটুও বিশ্রাম করার সময় ছিল না। বহুজনের আসা-যাওয়ায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে চালাতেন আলাপ আলোচনা। আর তিনি কথায় কথায় দিতেন তাঁদের নানা উপদেশ। বিরাম বিহীন এই ধরণের পরিশ্রমে খুবই তাঁর অসুখ হল আর এই অসুখ ভাল করার জন্যেই দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁকে কলকাতায় আনা হল আবার কলকাতা থেকে সেই ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর তারপর শেষে কাশীপুরে উদ্যান-বাড়ীতে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হল। ভক্তদের প্রাণঢালা সেবা আর ডাক্তারের চিকিৎসায় কোনই ফল হল না।

লীলাখেলা তাঁর শেষ হয়েছে। তাই ডাক্তারের ওষুধ আর ভক্তদের প্রাণঢালা সেবায়, ভক্তের ভগবান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাল হলেন না। সকলেই বোধ হয় আশ্চর্য হলেন যে যিনি কত শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা মানুষের ভেতরের আর বাইরের নিমিষে সারিয়ে শান্তি দিয়েছেন, তিনি আজ এই কষ্ট ভোগ করছেন? কেন ইচ্ছা করলেই তো তিনি নিজেকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে পারেন, নিজের রোগ ভাল করতে পারেন। যিনি ভগবান, যিনি মায়ের

দেখা পেয়েছেন, তিনি সেই যুগে যুগে অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কেন এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, এত রোগের আঘাত সহ্য করছেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার হলেও এখন তিনি মানুষ—

যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান হলেও এখন তিনি পঞ্চভৌতিক দেহধারী মানুষ। তিনি যে মানুষের দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন। তাই মানুষের যা হয় তাঁরও তাই হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন তিনি মানুষেব রূপে, মানুষ হয়েই এসেছিলেন। আর তিনি মানুষ হয়ে, সমস্ত মানুষের আচার-ব্যবহারই করেছেন। বাল্যকালে ননী চুরি করে খেয়েছেন আবার তাড়কাও বধ করেছেন। অস্ত্র ধরবেন না প্রতিজ্ঞা করেও, ক্রোধে তিনি অস্ত্র ধরে দর্পহারী মধুসূদন নাম নিয়ে নিজের দর্পচূর্ণ করেছেন। আশ্চর্য! যিনি ভগবান তাঁরও ক্রোধ, তাঁরও শোক দুঃখ?

অভিমন্যুর পতনে শ্রীকৃষ্ণ শোকে মুহ্যমান হলেও খেদ করে অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করেছেন। শেষে যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল আর ব্যাধ তাঁর রাঙ্গা পা দুখানি পাখী ভেবে তীর মারলে, তাও দেখলেন, কিন্তু কেন তিনি তা নিবারণ করলেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যার ইচ্ছায় সমস্ত হয় কেন তিনি সকলের ও শেষে ব্যাধের ভুল ভাঙ্গলেন না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কেন হল না, তাই প্রশ্ন হয় বারবার। যা ঘটবার তা ঘটুক। কালকে তিনি ভগবান হলেও, ফিরিয়ে দিতে চান না—কারণ তিনি মানুষ। পঞ্চভূতে গড়া তাঁর দেহে এই সমস্ত নিবারণ তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্ত্তন বা রোধ করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "তিনি মানুষ!"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন যে, "তোরা আমায় ভগবান বলিস, কিন্তু ভগবানের কি এই রকম হয়?"

ভক্তের চোখে তিনি ভগবানের রূপে ধরা পড়লেও তিনি বলতে

চান তিনি মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে তাঁর এই রোগ ভাল করতে পারতেন—কারণ যিনি অপরের রোগ ভাল করেছেন, তিনি নিজের রোগও ইচ্ছা করলে অনায়াসে নিশ্চয়ই ভাল করতে পারতেন। মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বার খুব অসুখ কিছুতেই ভাল হচ্ছে না তখন সেই রোগ, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের শরীরে টেনে নিয়ে তাকে ভাল করে দিলেন। অবশ্য এই রোগ তাঁকে কিছুদিন ভোগ করতে হল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ায় জগদম্বা সেই রোগ থেকে মুক্তি পেলেন—তবে নিজের এই রোগ তিনি সারাচ্ছেন না কেন?

তিনি বোধ হয় নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন তার এই রোগ ভাল করার কোন প্রয়োজন নেই। যতটুকু প্রয়োজন ছিল তা এখন হয়ে গেছে। তাই তিনি জানালেন মায়ের কাজ শেষ হয়েছে।

ভক্ত নরেন্দ্রের মনে দ্বন্দ্ব—

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদ ও শক্তিতে যেন কি এক অসীম শক্তিলাভ করলেন। এখন তাঁকে একটির পর একটি কাজ করে যেতে হবে। ভয় কিছু নেই, ভাবনাও নেই—আছে শুধু কর্ম্ম আর তার সিদ্ধি।

নরেন্দ্রনাথ অক্ষরে অক্ষরে বুঝেছেন যে কি তিনি পেয়েছেন—কি আর তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছেন। কিন্তু তবু তিনি নিজেকে মানুষ ছাড়া আর কিছুই বলেন না। এক সময় তাই তাঁর শয্যায় বসে নরেন্দ্রনাথ ভাবছেন যদি একবার তিনি মানে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, যে তিনি কে তাহলে মনের দ্বন্দ্ব মিটে যায়।

ভক্ত নরেন্দ্রের বাসনা পূর্ণ—

ভগবান যুগে যুগে মানুষেরই রূপে পৃথিবীতে আসেন—তিনি আসেন তাঁর আসার বিশেষ প্রয়োজনেই।

অবতার হলেও তিনি তখন কিন্তু মানুষ—অথচ মানুষের চেয়ে কর্মে, ধর্মে, জ্ঞানে, গুণে সমস্ত বিষয়েই অনেক বড় হওয়ায় অবতার রূপে গণ্য হন। সকলেই তাঁকে অবতার বলে স্বীকার করেন।

যুগবতার অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের এই কথা বুঝতে পেরে বললেন—"যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।"

ভক্তের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই মহাভক্তের বাসনা পূর্ণ করলেন। তাঁকে শান্তি দিলেন। তাঁর অশান্ত হৃদয় শান্ত, আর কোন দ্বন্দ্ব নেই—কোন অশান্তি নেই—নরেন্দ্রের মন যা জানতে চেয়েছিল, তাই জানতে পারলে—তাই পরিপূর্ণ শান্তি তাঁর হৃদয়ের মাঝে।

প্রথম জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাকে সাজিয়ে দিলেন নিজে—

সারদাকে বিয়ের সময় চন্দ্রমণি অপরের গহনা চেয়ে সাজিয়ে এনেছিলেন। বিয়ের পর সেই গহনা কিন্তু কেমন করে তিনি নেবেন, এটা একটা মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তাই গদাই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ঘুমালে, নিজে সেই গহনা খুলে তাদের দিয়ে দিলেন।

যাদের গহনা, তারা গহনা পেয়ে গেল কিন্তু ঘুম থেকে উঠে ক্ষুদ্র বালিকা সারদা গহনা নেই দেখে কাঁদতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রমণি অপ্রস্তুত হয়ে, তাঁকে তখন বললেন, "তুমি কেঁদ না, গদাই তোমায় ভাল গহনা দেবে—ঢের ভাল গহনা দেবে।"

সারদা এই কথায় শান্ত হল বটে কিন্তু তার খুড়ো এই রকম বৈরাগিণীর সাজ মেনে নিতে পারলেন না। তাই বিরক্ত হয়ে তিনি তাদের বললেন, "সাজিয়ে আবার লুকিয়ে খুলে নেওয়া এ প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি?" তিনি রাগ করে সারদাকে নিয়ে জয়রামবাটীতে চলে গেলেন।

গদাই শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে মাকে বললেন, "ও ফিরে না এলেও বিয়ে তো আর ফিরবে না—ও আর কোথায় যাবে?"

গদাই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি পালন ও একটি সাধ—

বিয়ের পর গদাই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদার গহনা খুলে তাঁকে নিজ হাতে বৈরাগিণী সাজিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চন্দ্রমণি

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই শ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে মা চন্দ্রমণির প্রতিশ্রুতি মত সোনার গহনা গড়িয়ে দিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন, নিজের সাধ্যমত উপরে তাবিজ আর নীচের হাতে বালা।

শ্রীরামকৃষ্ণের কেন এই সাধ?—

সোনার তাবিজ আর বালা গড়তে দেবার সময় বলে দিলেন, বালা ডায়মণ্ড কাটা হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এটা বেশ জোর দিয়েই বলে দিলেন, মানে হুকুম করলেন! নক্সার ওপর তাঁর নজর—পছন্দ আছে। তাঁর এই পছন্দ এই সাধ কেন? এই প্রশ্নেরই উত্তরে জানা যায়, পঞ্চবটীতলায় যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সীতাদেবীকে দেখেছিলেন, তাঁর হাতে ডায়মণ্ড কাটা বালা ছিল। তাই সেই রকম বালা দেব ওকে তিনি বলেছিলেন।

শ্রীমা সারদাকে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ উপদেশ—

অনেক উপদেশ শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক ভক্তকে দিয়েছেন, তাই তাঁর একটি উপদেশ তিনি মা সারদাকে শেষে দিলেন।

ঠাকুরের জন্যে মা তারকেশ্বরে হত্যা দিলেন কিন্তু কোন ওষুধ বা কোন দৈববাণী শুনতে পেলেন না। তিনি শুনলেন এক ইঙ্গিত, কে যেন পর পর হাঁড়ি সাজিয়ে ভেঙ্গে ফেলছে।

শ্রীমা তারকেশ্বর থেকে ফিরে এলেন।

অন্তর্যামী ঠাকুর সমস্ত জেনেও তবু বললেন, "কি হ'ল বলতো?"

শ্রীমা এই কথার কোন জবাব দিলেন না।

শ্রীমা যে ইঙ্গিত শুনলেন, তাতে তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ঠাকুরের কথার কোন উত্তর দিলেন না।

মায়ের ডাক পড়েছে, তাই মায়ের ডাকে আর ঠাকুরের সময় নেই।

তিনি পূর্ব্বেই জানিয়েছেন, মায়ের কাজ শেষ হয়েছে।

তাই শ্রাবণের সেই রাত্রিতে তিনি শ্রীসারদা মাকে ডেকে বললেন, "দেখ আমার মনে যেন ব্রহ্মভাবের উদয় হচ্ছে।"

শ্রীমা এই কথা শুনে বিচলিত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "মৃত্যু কিছু না। এঘর আর ওঘর। এঘর থেকে লোকে যেমন ওঘরে যায়। তুমি বিধবার বেশ পরো না।" মানে তাঁর দেওয়া, সোনার ডায়মণ্ড কাটা বালা খুলে, তিনি সারদাকে বেশভূষার পরিবর্ত্তন করে, বিধবার সাজ সাজতে বারণ করলেন।

মায়ের ডাকে মায়ের আদুরে ছেলে—

একদিন তিনি এসেছিলেন আর আজ সেই একদিন—তিনি মায়ের কাছে চলে যাচ্ছেন। মাঝের দিনগুলো শুধু রয়ে গেছে তাঁর লীলা-খেলা নিয়ে ভক্তের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানবাড়ীতে চিরস্মরণীয় ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ—ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মহাসমাধিস্থ হন। প্রতিদিনের মত সেদিনও সূর্য্য উঠে সারাদিন মানুষের অশেষ মঙ্গল করে, জগতের মাঝে আলো দিয়ে, তিনি আস্তে আস্তে এখন আবার পশ্চিমের কোলে হেলে পড়ছেন। ঐ শান্ত—এখন ঐ অতি শান্ত রক্তিম অস্তগামী সূর্য অস্ত যাচ্ছেন।

পাখীর আনন্দের আগমনী গানে যেমন তাঁর সুরু হয়েছিল—আবার পাখীর বিদায় গানেই তাঁর শেষ হচ্ছে। চারিধার আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে আসছে—চারিধারেই সন্ধ্যার অন্ধকার যেন আস্তে আস্তেই ঘনিয়ে আসছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যাবেলায় যেন নতুন রূপে এলেন। তাঁর নর-লীলার এই শেষ দিনটি যেন বিচ্ছেদ ও বিষাদের করুণ রাগিণীতে ভরে গেছে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চারিধারে সমীরণও যেন মর্ম্মর ধ্বনি করছে। ভক্তদের প্রাণ ভারাক্রান্ত। তাঁরা সকলেই ঠাকুরকে ঘিরে অশ্রু বিসর্জ্জন করছে। শয্যায় ঠাকুরের নিদারুণ যন্ত্রণা ও শ্বাসকষ্ট হলেও ভক্তদের সঙ্গে গভীর তত্ত্বকথা কইলেন, আবার কাউকে সস্নেহে মুখে হাত বুলিয়ে আদরও করলেন।

ঠাকুর সন্ধ্যার পর একটু ক্ষিদে অনুভব করায়, ভক্তরা তাঁকে সামান্য পথ্য খাওয়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তাও তাঁর গলা দিয়ে গেল না। একটু পরেই তিনি গভীর সমাধি-মগ্ন হলেন। মধ্য রাতে আবার তাঁর সহজ অবস্থা ফিরে এল এবং কিছু খাবার ইচ্ছা তিনি করায়, তাঁকে অনেকগুলি বালিশে ঠেস্ দিয়ে বসিয়ে সামান্য পাত্‌লা সুজি দেওয়ায়, তিনি অক্লেশে খেলেন ও বললেন, যে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন।

নরেন্দ্র এই সময় তাঁকে একটু ঘুমোবার অনুরোধ করায়, ঠাকুর বেশ স্বাভাবিক গলায় সজোরে তিনবার কালীনাম উচ্চারণ করে শুয়ে পড়লেন। তখন রাত্রি ১টা ২মিঃ মতান্তরে ১টা ৬মিঃ। ঝিল্লি-রবাকৃত নিশি, এই সময় ভগবান যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন ও এই সমাধিই পর্যবসিত হল মহাসমাধিতে। অংশ ও পূর্ণ এক হয়ে গেল। যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর লীলার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে, ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করায়, আধ্যাত্ম জগতের যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র নির্ব্বাপিত হয়ে গেল চিরদিনের মত। মায়ের ডাকে, মায়ের আহ্বরে ছেলে ফিরে গেলেন তাঁর শান্তি স্নেহময় কোলে।

ঠাকুরের ভক্তদের চোখের জল শ্রাবণের প্রবল ধারার মতই ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগল। তাঁর বাহান্ন বছর বয়স পর্যন্ত লীলা খেলার পর আর চোখের জলে কেউ তাঁকে আটকাতে পারলে না। মায়ের ছেলে, মায়ের ডাকে, মায়ের নাম করেই, মায়ের সাথেই এক হয়ে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের পরামর্শ বৈঠক—

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা বরাহনগরের এক ভাঙ্গা বাড়ীতে জমা হয়ে একটা পরামর্শ বৈঠকে ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচীর খসড়া করলেন।

এই খসড়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষ্যৎ কার্যসূচীর একটা সামান্য অস্পষ্ট খসড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু পঙ্গুর গিরিলজ্ঘনের প্রবাদবাক্যের মত শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ায়, এই পরিকল্পনা সম্ভব হল।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের অবস্থা—

বারটি ভক্ত ছেলে আর বাড়ীতে ফিরল না। তারা ঠিক করলেন ঠাকুরের উপদেশ মত তাঁরা কাজ করবেন। এদের অবস্থা তখন এতো খারাপ ছিল যে, কোনদিন কিছু খাওয়ার জিনিস জুটত কোনদিন জুটত না। আবার কোনদিন বা একবেলা কোন রকমে খাওয়ার যোগাড় হত আর তাই খেয়ে তাঁরা ঠাকুরের নামকীর্ত্তন করতেন। অবস্থা তাঁদের কিন্তু আরো শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। এক একদিন তাঁদের কেবল মাত্র জুটত তেলাকুঁচোর পাতা আর ভাত। তাও কোন খাবার পাত্র নেই, তাই মানকচুর পাতায় রেখে খেতেন। কিন্তু তাঁরা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে রোজ ছ'একখানা নৈবেদ্য নিবেদন করতেন। তাতে শুধু চাল থাকতো আর একটু ফলের টুক্‌রো। সামান্য মিষ্টিও জুটত না। তবু ঠাকুরের দয়ায় উৎসাহ তাঁদের বেড়েই চলেছে আর গাইছে তাঁরা ঠাকুরের যশোগান। বাইরে থেকে এই কীর্ত্তনগান শুনে লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনত আর তাঁদের মনে উথ্‌লে উঠত ভক্তিরসের বন্যা। এইভাবেই তাঁদের মিশনে ছ'একজন করে ভক্ত জমা হয়ে ধীরে ধীরে তাঁদেরই সাহায্যে অবস্থার উন্নতি হতে লাগল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠ স্থাপন—

বেলুড়ে, মাদ্রাজে আর মায়াবাড়ীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হল। কলকাতার উত্তরে পশ্চিম গঙ্গার তীরে বেলুড়ে স্থাপিত হল বেলুড় মঠ। এই মঠ ১৩০৪ সালে স্থাপিত হয়। এখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাতের লেখা, অস্থি, পাতুকা ইত্যাদি অনেক জিনিস খুব যত্নসহকারে রাখা আছে।

এখানে প্রতি বছরই শিবরাত্রির পর ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ করে মহোৎসব হয়।

নানা স্থান থেকে বহু গুণী আর ভক্ত এসে, এখানের এই উৎসবে যোগদান করেন। আলোচনা করেন তাঁরা ঠাকুরের নাম, গান, কথামৃত ইত্যাদি যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলো দেখায়।

বেলুড় মঠে কলেজ স্থাপন—

এই মঠে পূজা হয়। এইখানেই অনেক গরীব ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করেন। সকলেই তাঁরা ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য পালনই তাঁদের নিয়ম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উচ্চ শিক্ষার জন্য সেখানে একটি কলেজ স্থাপনও হয়েছে।

বেলুড় মঠ ও মায়ামতীর তীরে উৎসব—

বেলুড় মঠে যখন যে সময় যে উৎসব, পূজা-পার্বণ প্রতিপালিত হয়, ঠিক সেই সময় মাদ্রাজে সমুদ্র ধারে ও মায়ামতীর মঠে, সেই সময় সেই উৎসব প্রতিপালিত হয়।

পরমহংসদেবের মহান্ চরিত্রকে আদর্শ করে কত নরনারী মানুষ হয়েছে, তার গণনা আর তা কেউ জানেও না।

ভগবানকে সংসারে থেকেও পাওয়া যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই নিজের জীবনে দেখিয়েছেন ও প্রমাণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র—

অনেক ভক্ত অনেক মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন। প্রায় সকলে প্রথমেই ঠাকুরকে চিনেছিলন কিন্তু শেষে চিনেছিলেন ঠাকুর পরমপুরুষ। তাঁর করুণায় তিনি কৃপাধন্য। তাই তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আর এক স্বর্গীয় পুলকে প্রাণ ভরে গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে দেখেই, ভাবদর্শনের মধ্যে দেখেছিলেন, জ্ঞানে প্রজ্ঞায় দেবদেবীরও উর্দ্ধে সাতজন জ্যোতির্ময় যোগী ধ্যানমগ্ন। ঠাকুর এদের কথা ভাবতে ভাবতে বিস্মিত হলেন। হঠাৎ সামনে দেখলেন, জ্যোতির পরিমণ্ডল ভেদ করে একটা আলাদা·জ্যোতির অংশ বেরিয়ে এসে এক শিশুতে পরিণত হল। এ শিশু যেন বহুকালের চেনা। এই দেব-শিশু একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি যাচ্ছি তোমাকেও যেতে হবে।" ঋষি কথা বললেন না কিন্তু চোখে সম্মতি জানালেন। তারপর দেখলেন, ঋষির শরীর থেকে এক জ্যোতি বেরিয়ে, মানুষের রূপ ধরে নেমে এসেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখেই চিনলেন, এই সেই পুরুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র সত্যিই এসেছিলেন তাঁদের কর্মে, ধর্মে, জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যায়, শিক্ষায়, দীক্ষায় মানুষকে মোহের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে, আলোর সন্ধান দিতে—মানুষের মানব-জীবনে, সেই ঈশ্বরকে অনুভব করে, ধন্য হবার সুযোগ দিতে, গুরুরূপে মানুষের মাঝে মানুষ হয়ে।

বাস্তব জীবনের কয়েকটি ঘটনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে বলেছিলেন, "মৃত্যু কিছু নয় এঘর থেকে শুধু ওঘরে সরে যাওয়া।" অর্থাৎ আমি যেমন আছি তেমনিই থাকব। আমার পিতৃদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কথা সমর্থন করে দেখিয়েছেন যে, সত্যি যেন মৃত্যু কিছু নয়। আশি বছর বয়সে তিনি দেহ রাখেন। তবে এই দেহ রাখার পূর্বে চারবার তাঁর হঠাৎ হঠাৎ দেহে সমস্ত মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ হয়ে কিছুক্ষণ পরে আবার সুস্থ হয়েছেন। কবিরাজমশাই বলেন, "আপনার কি রকম ঐ সময় মনে হয়?" পিতৃদেব বলেন, "কিছুই না—যেন মনে হয় আমি ঘুমিয়ে পড়ি।" এই কথাই তিনি শান্তভাবে বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখালেন, তাঁর কথা চিরদিনই এক—

মা তিনি ভক্তের কথা শোনার মত হলে নিশ্চয়ই শোনেন, তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, একই ডালে লাল আর শাদা জবা ফুটিয়ে মথুরবাবুকে একেবারে আশ্চর্য করে যেমন দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আমাদের মাঝে একটি ঘটনা ঘট্‌লো—অবশ্য এই আশ্চর্য ঘটনার আগে থেকে কিছু লিখতেই হচ্ছে, তা না হলে এটা ঠিক বোঝা যাবে না—তাই প্রথমেই বলতে হয়, আমাদের ছোট ভাই বৈদ্যনাথ আত্মামা, শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীমায়ের বাঁধান ছবি প্রত্যহ পূজার পর মাঝে মাঝে কিছু মিষ্টি মাকে উৎসর্গ করে বাড়ীর মেয়েদের দিত।

আমি তাকে বললুম, "সকালে যেমন প্রতিদিন পূজা হয় তা হবে, তা ছাড়াও যেমন প্রতি সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যার পর ভাল করে পূজা করে মায়ের প্রসাদ সকলকে দিলে খুব ভাল হয়।" বৈদ্যনাথ খুব আনন্দে বললে, "খুব ভাল কথা কিন্তু সে দিনটা হবে কবে?"

যেন মা আমায় দিয়ে বলালেন, "মঙ্গল আর শনিবার মায়ের পূজার প্রশস্ত দিন। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে।" কারণ বারের দেবতা মায়ের শিষ্য। গুরু শিষ্য দুজনই সন্তুষ্ট হবেন তাই ঠিক হোল শনিবার মায়ের পূজা হবে। পূজার এই দিন সন্ধ্যার পর কত ভক্ত আসত। এক একদিন মায়ের পূজার ভোগ এক এক রকম প্রচুর করে মাকে নিবেদন করে, সকলকে দেওয়া হত। সকলেই শুনত মায়ের স্তব ও পূজার পর গণেশ বন্দনা গান, শিবের বন্দনা গান। মায়ের কয়েকটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনের পর চারিধার ধূপ-ধূনার গন্ধে আর মায়ের গলায় রজনীগন্ধা বা অন্যান্য সুগন্ধ গড়েমালার গন্ধে যেন চারিধার ভরে যেত। মা এক এক দিন তাঁর ইচ্ছামত অপরাজিতা আর জবার মালা পরতেন। একটি পাড়ার কালো ছেলে এই ফুলের মালা বিক্রি করে যেত, কোন ফরমাস তাকে করা হত না। যেদিন সে জবার মালা দিয়ে যেত, সেদিন পূজার পর সব কুঁড়িজবার মালা ঠিক রাত একটার পর আমি ও বৈদ্যনাথ দেখতুম, মায়ের পুরাণো ছবিতে জবার মালার ফুল ফুটে উঠত। আহা! কি সুন্দর মাকে দেখাত তা বলে বোঝান যায় না। তাই দুজনে প্রাণ ভরে দেখতুম। মা যেন মনে হয় কথা শোনে। তাই একদিন সকালে ফুলের মালা কালো ছেলেটি না দেওয়ায় মনে হল, মা তুমি যদি কথা শোন, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের মত একটা অদ্ভুত, যা সহজে লোকে বিশ্বাস করে না, তাই দেখাও দেখি। কথাটা মনে মনে বলে একটু সামান্য হেসে, বৈদ্যনাথকে বললুম, "মায়ের সঙ্গে বাজী রেখেছি যে, আজ ছেলেটি তোমায় কুঁড়ি জবার মালা দিয়ে যাবে আমরা তাই দেখব। দেখি মা কি করে!" বদ্যিনাথ একটু চুপ করে বললে, "কেন ভাই এই বাজীর কি দরকার?" তাই সে পরে এখানের যতগুলো বাজার আছে ঘুরেও ওই কুঁড়ি জবার মালা না আনতে পারায়, একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

বিকেল—তারপর সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমার কিন্তু তেমন এই বিষয় নিয়ে ভাবনাই নেই। মায়ের যা ইচ্ছে, তাই হবে। মা

যদি নিজে হার স্বীকার করেন তো করবেন, তাতে আমার কি এসে যায়। বাজারে যে ফুলের মালা পাওয়া যায় তাই মাকে দেওয়া হবে।

সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে হঠাৎ বদ্যিনাথ একগাল হেসে বললে, "সেই কালো ছেলে বিকালে এসে মালা দিয়ে গেছে—সেই কুঁড়ি জবার মালাই সে এনে দিয়েছে। অনিমা বললে, সন্ধ্যের আগেই সে দিয়ে গেছে।"

কি আশ্চর্য! মা তুমিই জিতলে! সে দিন রাত একটার পর দুই ভাইয়েতে দাঁড়িয়ে দেখলুম, ফুলগুলো এক এক করে, আমাদের সমুখে ফুটে উঠল। আহা! মাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে—মা যেন আনন্দেতে হাসছেন!

প্রতিদিন পূজার পর মায়ের ছবি, শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি বৈদ্যনাথ মাথায় ঠেকিয়ে তুলে প্রণাম করে রাখে, আমি তাই দেখি। এখন দুজনে মায়ের আলো-করা রূপ দেখে, আবার প্রণাম করলুম।

প্রায় এখন থেকে এগার বছর আগে "যুগবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" বইখানি লিখি। তাই এখন পুনরায় লেখার সময় আলোচনা প্রসঙ্গে এঁর কথা বারবার মনে হল, মায়ের ইচ্ছে হলে সমস্তই সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "যা অতি সত্য তা চিরকাল একই থাকবে।"

যুগবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যেখানে তাঁর আসার সময় পাখীদের আনন্দের আগমনী গান ও যাওয়ার দিন—দিনান্তের ক্লান্ত ডুবে যাওয়া সূর্যকে পাখীরা বিদায় গানে বিদায় জানাচ্ছে। কিন্তু এ তো রোজই হয়—কিন্তু সেইদিন ও এইদিন—রয়ে গেল এরই মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-খেলার কথা। এই বর্ণনার কথা শুনেই, বদ্যিনাথ আহা! বড় সুন্দর হয়েছে বলায়, আমি চেয়ে দেখি তার চোখ দুটি হঠাৎ ভাবে আধ-চোখে চেয়ে, যেন কি আনন্দ-সুধা পান করছে। বুঝলাম এ তার ক্ষণিক ভাবসমাধি। মায়ের ভাল ভাল গান হলেও এ রকম ওর হয়, খুব অল্পক্ষণের জন্যে। কিন্তু এখন

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে স্থির থাকার পর তার আবার পূর্বের অবস্থা ফিরে এল।

এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর বৈদ্যনাথের শরীর রোগা হয়ে আসতে লাগলো। রোগ কিছুই নয়—রাত্রে কেবল খুব জোরে নাক ডাকে। মনে হয় ওর বড় কষ্ট হচ্ছে কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গেলে কিছু নেই। সে নিজে কোন কষ্ট জানতে পারে না। ডাক্তারেরা ওষুধ দেয় ও হেসে বলে কিছু নয়। কিন্তু বদ্যিনাথ বলে, "এই কষ্ট জাগ্রত অবস্থায় যদি হয়?" তারপর বলে মায়ের যা ইচ্ছে তাই হবে। তার কথাই সত্যি হল—১৯২২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন সে সকালে বাজার ও সমস্ত কাজ সেরে খাওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। সারাদিন, সারারাত কখন যেন একটু সুস্থ কখন অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট হতে লাগলো। পর পর চারজন ডাক্তারের ওষুধে কিছুই হল না। সকাল থেকে খুব কষ্টের পর ডাক্তারের কাছে সে বললে, "এখন ভাল আছি!" কিছু চায়ের সঙ্গে সন্দেশগুলো তাকে খাওয়ান হল। সে বললে, "তোমরা সকলে একটু-একটু শক্তি দাও তাহলেই হবে।" শক্তি তাকে আমরা দিতে পারলুম না। তাকে ডাক্তারেরাও শক্তি দিতে পারলে না। মহাশক্তি মায়ের সেদিন পূজার দিন তাই আমাদের ভাইপো খোকা বললে, "তুমি সন্ধ্যায় পূজা করবে তো?"

একটু যেন সন্দেহ প্রকাশ করে বদ্যিনাথ বললে, "কি জানি পারব কি!" এর পর তাকে ওষুধ খাওয়ান হল। ওষুধ খাবার পর যেন সে বসে বসেই খুব শান্তিতে চোখ দুটি ঘুমের আমেজে বুজলে—তারপর বসেই আছে—অনেক আমরা ডাকলুম আর সাড়া নেই। বুঝলুম সমাধি হয়েছে।

মা কালী ও শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভক্ত বৈদ্যনাথ—

মনে পড়ে গেল পিতৃদেবের কথা তিনি বলতেন, বৈদ্যনাথ অল্পায়ু কিন্তু অনেক হিন্দু ও মুসলমান মহাপুরুষ ওকে শতায়ু হবে বলে আশীর্বাদ করেছেন। তিনি বদ্যিনাথের জন্ম সম্বন্ধে বলতেন স্বপ্নে

তিনি এক অজানা স্থানে গেছেন—সেখানে চারজন জ্যোতিঃপুঞ্জ দেহধারী মহাপুরুষ পাশা খেলছেন। তাঁরা পিতৃদেবকে দেখে, তাঁদের ভেতরই একজন বললেন, "শিবকৃষ্ণ তুমি কি চাও?"

এই প্রশ্নে পিতৃদেবের মনে হল আর তিনি বললেন, "আমার একটি সর্বগুণান্বিত পুত্র চাই!" কিন্তু কে যেন তাঁকে বললে, বল যে আপনিই আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন। তাই তাঁকে তিনি তখুনি বললেন, "বাবা আপনিই আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন!"

পিতৃদেবের কথায় ও অনুরোধে সেই মহাপুরুষ বললেন, "আবার—আবার আমায় যেতে বলছিস?"

পিতৃদেব বললেন, "হ্যাঁ বাবা আপনিই আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন।" চারিদিক থেকে যেন একটা অদ্ভুত চ্যাঁ চ্যাঁ করে আওয়াজ হতে লাগল, পিতৃদেবের ঘুম ভেঙ্গে যেতে তিনি অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগলেন। পরে এই স্বপ্ন যে সত্য, তা বৈদ্যনাথধামে বৈদ্যনাথ জন্মগ্রহণের পর তার কতকগুলি ভাব ও লক্ষণ দেখে, কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি ও পিতৃদেব সঠিকভাবে বুঝেছিলেন।

সেই দিনটি মায়ের পুজার বার। তাই দোপাটির গড়েমালাটা সকালেই কালো ছেলেটি দিয়ে যাওয়ায় আদ্যামায়ের গলায় তক্ষুণি পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ মালাটা ছিঁড়ে পড়ে গেল। সকলেই যেন একটু ভয় পেল। তাই আবার সেটা জুড়ে পরিয়ে দেওয়া হল। তখনও একটা আশা মায়ের পূজা হবে। বৈদ্যনাথ সুস্থ হবে। কিন্তু তা আর হল না। মালা ছিঁড়ে পড়ে যাবার কিছু পরেই বৈদ্যনাথের সমাধি হয়ে গেল। জ্ঞান ভেতরে—ওপরে কোন উত্তর নেই। বিছানার ওপর যেন সে যোগাসনে বসে। সেইদিন ছিল ২৯শে সেপ্টেম্বর, ডাক্তারের চেষ্টায় কিছুই হল না। জগৎ মাতার ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বৈদ্যনাথের বিকেল পাঁচটা নাগাদ মাত্র সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণের মতই সেও আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেল। সারা বাড়ীর লোকের চোখ জলে ভেসে যেতে লাগল। পথে বাজারে হাটে যেই শোনে, সেই

বলে, এই তো তিনি কালও হেসে কথা কয়েছেন, বলে কাঁদে। তাদের চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দরদর করে জল।

সেই রামকৃষ্ণের একই কথা একই উপদেশ—

আমি বুঝলেও আমার চোখের জলের বিরাম ছিল না। আমাদের দুজনের মন প্রাণ যেন এক ছিল। আমার মতেই তার মত। আমার কথাতেই সে সমস্ত কাজ করে। আমি তার চেয়ে চার বছরের বড় হলেও শুধু আমি কেন বাড়ীর যেন প্রত্যেকে প্রায় তার ওপর নির্ভরশীল। সে যেন সকলের বড়—সে যেন তাই কি করবে এই ভাবনায় ব্যস্ত, যার আছে আর যার নেই, সকলকেই ভালবাসে। সকলের জন্যে চেষ্টা করে—যতটা পারে দেয়—নিজের কথা ভাবে না একটুও। কিন্তু সেদিন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে চলে যেতে হল। তাকে আর কারো কথা ভাববার আর সুযোগ মা দিলেন না। কিন্তু সকলেই সমস্ত জানে, লোকে তবু কাঁদে কেন? এর উত্তর দেওয়া শক্ত নয়—কিন্তু বোঝা খুব শক্ত। তাই কে বোঝাবে এ কথা, এই যে ছিল সে কোথায় গেল? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, "এঘর থেকে ওঘরে।" বৈদ্যনাথ প্রথম চলে যাবার পরদিনই রাতে স্বপ্নে আমায় দেখা দিলে—দেখলুম—বিছানার ধারে আমি বসে কাঁদছি আর আমার সুমুখেই বদ্যিনাথ দাঁড়িয়ে। ঠিক একেবারে খুব কাছে। একটু সামান্য আমার দিকে সে নীচু হয়ে—মুখখানা সামান্য যেন তার উপায়হীন, তাই নানা ভাবে, নানা সময় চোখটা যেমন সে জোর করে কিছু বুঝিয়ে বলতে গিয়ে একটু সামান্য—খুব সামান্য চোখ কুঁচকে কথা বলত, তেমনি—ঠিক তেমনি স্পষ্ট—একেবারে যেন অতি স্পষ্ট সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "কাঁদছিস কেন? এই তো আমি রয়েছি!"

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বদ্যিনাথের স্বপ্নে বলা এই কথা একটু অন্য রকম হলেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন ঠিক তাই। ঠাকুরের জীবনী আর তাঁর নানা কথা নিয়েই আমি ও বৈদ্যনাথ দুজনে প্রায় আলোচনা করতুম। তাই বোধ হয় সে প্রথম আমায়

স্বপ্নে এসে বললে, "ঠাকুর যা বলেছেন ভুলে যেও না, পঞ্চভৌতিক দেহ আজ না থাকলেও এই তো আমি রয়েছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা "এক ঘর থেকে অন্য ঘরে।" তাই এ যে কত সত্য তা বুঝতে যে একটু চেষ্টা করবে, সে অনায়াসে বুঝতে পারবে।

তবু একটু সন্দেহ যা ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিটিয়ে দিলেন—

যুগবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বইখানি আরো কিছু বড় করে প্রায় এক বছরের ওপর হল লিখেছি। প্রকৃত গরীবের বন্ধু—আমাদের বড় দাদা নয়নকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুর ও মায়ের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি মহর্ষি জনকের মত সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম ও মায়ের আরাধনা তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্তও করে গেছেন। তিনিও বার বারই এই পুস্তক প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। পরে মেজদা সঙ্গীতাচার্য্য জগদীশ চট্টোপাধ্যায় যিনি স্বরচিত 'জয় রাম কৃষ্ণ, জয় জয় জয় যুগবতার' গান শুনিয়ে কত সাধু ও সংসারী ভক্তের প্রশংসা পেয়েছেন তিনি, ভগ্নীরা, আত্মীয়-স্বজনেরা, একযোগে উৎসাহ দিয়েছেন। আর তার ফলেই আমিও এগিয়ে চলেছি ও বুঝেছি ঠাকুর যেন যাদুকর। তা না হলে বড় ছোট সকলেই কেমন করে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে? কিন্তু মনে তবুও একটু দুঃখ যে, আমি তো তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পাইনি, যা কিছু তাঁর জীবন-কথা, সমস্তই সংগ্রহের ওপর, অন্যের ওপর, যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে ধন্য হয়েছেন ও তাঁর কথা পরে লিখেছেন। তবে ভাব ভাষা নিজের নিজের দিয়ে এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে এখনকার অনেক লেখকেই যেমন লিখেছেন তেমনি আমিও আমার ভাব, ভাষা, বিচার ও তাঁর সঙ্গে আর তাঁর কথার সঙ্গে যেখানে যতটুকু মিলিয়ে একালে পেয়েছি তা তুলে ধরেছি। লিখতে লিখতে একটু যা সন্দেহ ছিল তাও মিটেছে। তাই বার বার মনে হয় যে তাঁর জীবন ও উপদেশের কথা লিখতে লিখতে মন উঠতে চাইতো না মনে হতো, এ যেন মিষ্টির চেয়ে অনেক মিষ্টি—মধুর চেয়ে আরো মধুর।

বুদ্ধের নতুন রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ—

যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণের শেষের দিকে নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে আসার পর তিনি ভক্তদের বলেন, "নরেন বুদ্ধগয়া গিছ্‌লো সেখানে সে ধ্যানেও বসেছিল আর দেখেছে একটা নতুন গাছ। সেই পুরাণো বোধিগাছের পাশেই জন্মেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বলতে চেয়েছেন, আমি সেই—আমি সেই বুদ্ধ, নতুন রূপে আবার এসেছি।

সন্দেহ অবসানে শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন উপদেশ—

যুগবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে 'বুদ্ধের নতুন রূপ' এই পর্যন্ত লিখে রাত তিনটের পর শুয়ে সকালে উঠে আমার মনে হঠাৎ খুব আনন্দের সঞ্চার হল। তার কারণ শুয়েই ঘুমের মাঝে ভোর রাতে যা স্বপ্নে দেখেছি তা স্পষ্ট ফুটে উঠল আমার মনের মাঝে—আর সেই আনন্দ যা পেয়েছি, তা যেন মুখে বলা যায় না। যেন সেই আনন্দের ঢেউ হঠাৎ এসে রাতের সমস্ত স্বপ্নটাই সত্যের মত আবার এখন আমার মনে হল। আমি দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আমার সঙ্গে উঠছেন, আমার কাছে গায়ে গা দিয়ে বসছেন। তাঁর গা যেন তুলোর মত নরম। মনে হলো কি জানি যাঁর গা এত নরম তাঁর মন আরো কত নরম? তিনি যেন মৃদু মৃদু হাসছেন, মাথার চুল দাড়ি একেবারে কালো, দু' চার গাছা হয়ত পাকা চুল আছে। তিনি কথা কইছেন কিন্তু তাঁর গলার কোন আওয়াজ আমার কানে আসছে না অথচ তাঁর কথা যেন আমাদের কথার মত প্রাণ শুনছে। সমস্ত বুঝতে পেরে যেন আহা! সত্যি কী আনন্দ হচ্ছে তা মুখে বলা যাচ্ছে না!

এখন হঠাৎ মনে হলো ইনি তো দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু এঁর মাথার চুল দাড়ি সমস্তই কালো, তখন ১২৮৬ সাল আর এখন ১৩৭৭ সাল। তবে! একি কোন অভিনেতা শ্রীরামকৃষ্ণ সেজে এসেছেন, তা না হলে যদি সেই শ্রীরামকৃষ্ণই হবেন তো তাঁর চুল দাড়ি পেকে তো একেবারে সাদা হয়ে যাবে। মহা সন্দেহ, ইনি কে? যেমন লিখতে লিখতে সন্দেহ হয়েছে যে, যাঁরা তাঁকে দেখে তখন

স্ত বিষয় ও তাঁর জীবন ও অমৃত বাণী লিখে প্রথম ধন্য .য়ছেন। মনে হয় তাঁরা কত ভাগ্যবান।

আমার প্রধান সন্দেহের তিনি এমন চমৎকার নতুন উত্তর দিলেন া বোধ হয় একটু ভেবে দেখার মত।

তিনি বললেন, "আমি সেই—আমি সেই!" মন তখুনি তাঁর কথার নীরব প্রতিবাদ জানাল, তা কি করে সম্ভব! চেহারার তো পরিবর্ত্তন হবেই—তবে?

মুখে তাঁর সেই মিষ্টি হাসি। তিনি বললেন, "আমার কোন—আমার কোন পরিবর্ত্তন নেই!"

মনের সমস্ত সন্দেহ মিটে গেল। তিনি এসে স্বপ্নে বলে গেলেন নিজে, "আমি সেই—আমার কোন পরিবর্ত্তন নেই!"

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে লিখেছেন,—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তাঁরা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥"

[উদ্বোধন : ফাল্গুন : ১৩৪২]

মহাত্মা গান্ধী গভীর শ্রদ্ধাভরে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও লীলা সম্বন্ধে লিখেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন প্রকৃত ব্যবহারিক ধর্ম্ম দৃষ্টান্ত। তাই তাঁর লীলা আমাদের চোখে মুখোমুখি ভগবান দর্শনে সক্ষম হয়েছিল—ভগবান এক এবং অনন্ত। তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু তা মায়াময়। এই প্রগাঢ় বিশ্বাস ব্যতিরেকে কেউই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কোন ধারণা করতে সক্ষম হতে পারবেন না। কারণ ঈশ্বরের অকপট প্রকাশ নিয়েই তাঁর সমগ্রতা। তাঁর অমৃতময় কথা ও

বাণী শুকনো পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য মাত্র নয়—তা হল জীবন-গ্রন্থের পাতা থেকে সন্নিবেশিত। আপন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে পূর্ণ এই অবলোকন। তাই ব্যক্তিমাত্রকেই তা গভীরভাবে অভিভূত করে ফেলে, যার বাইরে হৃদয়াবেগকে রুদ্ধ করা যায় না। এই কলুষতার যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ অগাধ বিশ্বাসের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন তা হাজার হাজার নরনারীর জীবনে আধ্যাত্মের আলো ফেলেছে, যাদের সাধারণ পরিমণ্ডলে থেকে তাঁর কৃপা ছাড়া অন্য কোন গতি ছিল না। অহিংসা-কর্মের একটি বিস্তৃত জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের—তাঁর প্রেম (ভালবাসা) জাগতিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁর এই অনন্ত ঈশ্বর ভালবাসা, অন্যের কাছে প্রেরণা হয়ে চিরকাল থাকুক।...

[ফরওয়ার্ড ; লাইফ অব শ্রীরামকৃষ্ণ...

শ্রীজহরলাল নিজে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা হচ্ছে এই—

বিশ্বপ্রবাহে সাধারণ মানুষের মিছিল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি বহমান ধারা অনুযায়ী প্রাচীন ভারতের মহান্ ঋষিদের মত এসেছিলেন। যাঁরা কালক্রমে বারংবার এসে আমাদের মনোযোগকে সত্যই উচ্চাবস্থায় জীবন ও আধ্যাত্মিক অপূর্বলোকের দিকে নির্দিষ্ট করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা তিনি শরণাগত ব্যক্তিদের কি বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন। দূর থেকে অনেকে হয়তো তাঁর আপাত অশিক্ষার বহিরঙ্গ দেখে নানা বিরূপ কথা বলেছেন। তাঁরাই যখন সমাগত হয়েছেন এই শ্রদ্ধার পরমপুরুষের পদপ্রান্তে মস্তক অবনত করেছেন, বিরূপ মন্তব্যকে রুদ্ধ করে প্রার্থনায় মুখর সেই নিবেদিত কণ্ঠ সকল। তাই তখন তাঁদের অনেকেই সাধারণ জীবনের বৃত্তিপথ পরিত্যাগ করে ভক্তিপতাকাতলে সমবেত হয়ে ভক্তের খাতায় নাম লিখিয়েছেন।

তারাও এক একজন মহান্ ব্যক্তি, অন্যান্য সকলের চেয়ে যিনি পরিচিত শুধু ভারতের গণ্ডীতে যাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ নয় পৃথিবীর সর্বত্র একটি নাম হয়ে বিস্তৃত, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ…

[রামকৃষ্ণ এ্যাণ্ড স্বামী বিবেকানন্দ : ১৯৪২ থেকে]

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের মতামতে তিনি লিখেছেন—

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তথাকথিত শিক্ষিত মহলে তেমন করে বিদ্ধ হয়নি, তথাপি নির্ভুল প্রিয় এই পৃথিবীর প্রতিটি নরনারীর জীবনে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত সুখে এবং প্রার্থনায় মুখর হয়েছে। এই বিরাট গুরুর শিক্ষা ও উদ্দীপনার একটি ক্ষয়িষ্ণু রুদ্ধ প্রবাহের সমাজে পুনঃ জাগরণ সম্ভব হয়েছে…পতিত মৃতপ্রায় হিন্দুধর্মকে ধূলিশয্যা থেকে তুলে তিনি সুউচ্চে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু মুখের কথায় এ কাজ তিনি করেন নি—আপন আচরণ দ্বারা নিজ মত প্রতিষ্ঠা করছেন।

[দি কালচারাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া : মার্চ ১৯৩৭ থেকে]

পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণ—

ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গুণীর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মতামত উদ্ধৃত করা হল। তাঁর সম্বন্ধে এমনি সারা বিশ্বের জ্ঞানী গুরুর মতামত যা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তবে এই কথা বারবারই বলতে পারা যায় যে, সকলেই তাঁকে অকপটে যুগবতার বলে মেনে নিয়েছেন। তাই তাঁকে মহামানব, মহাপুরুষ, পরমপুরুষ, সাধক, ঋষি, মুনি এমনি অনেক অনেক কিছু বলে অভিহিত করলেও তাঁদের সমগ্র আলোচনার ভেতর ফুটে উঠেছে ওই একটি কথা তিনি যুগবতার। আমার মতেও তিনি ভগবান—যুগে যুগে—যুগবতার।

ঈশ্বরকে মানুষের জন্যেই এই পৃথিবীতে যুগে যুগে যুগবতার হয়ে আসতে হয়েছে আর সকলকে রক্ষা করতে হয়েছে—প্রথমে তাঁকে মানুষ চিনতে না পারলেও, শেষে তাঁর উপদেশ ও কাজে প্রকাশ পেয়েছে, তিনি মানুষের রূপে সেই ঈশ্বর ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষেরই কল্যাণের জন্যে।

একটি প্রার্থনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ—

যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি কত মহামূল্য উপদেশ, কত হিতোপদেশ দিয়েছেন—জীবের উদ্ধারের জন্যে আর মানুষের কল্যাণের জন্যে তাঁর হিসাব নেই।

তিনি এখনও মনে হয় আমাদের কল্যাণের জন্যে মায়ের কাছে নিয়ত প্রার্থনা করছেন। তাঁর পঞ্চভৌতিক দেহের পতন ঘটায় বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না—কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে ভাল করে ভক্তি করে দেখলে, দেখতে পাব জ্যোতির্ম্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ অন্ধকারকে আলো করে বসে আছেন। তিনি তাঁর ভক্ত এবং প্রতিটি মানুষের মনের মন্দিরে পরমানন্দে তন্ময় হয়ে বিরাজ করছেন। তিনি সারদামাকে বেশভূষার পরিবর্ত্তন করতে বারণ করেছেন। তিনি তাঁর দেওয়া পছন্দ করা ডায়মণ্ডকাটা বালা খুলতে বারণ করে বলেছেন—"আমি চিরকাল থাকব। আমি আছি—আমি আছি—শুধু এক ঘর থেকে অন্য ঘরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি আছ! সত্যিই তুমি আছ! তোমার দয়া সকলকেই আজও অন্ধকার থেকে আলোর মাঝে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার দয়ায়, মানুষ নিশ্চিত সত্যের সন্ধান পায়—সে ধন্য হয়!

যে তোমায় একান্ত ভক্তি করে দেখতে চায়, সে তোমায় দেখতে পায়। ভক্তের হৃদয়-সিংহাসনে তুমি বিরাজ করছ। তুমি চিরকাল এইভাবেই বিরাজ করবে। জগতের মাঝে জ্ঞানী, গুণী, ভক্তদের তুমি যেমন বুকে টেনে নিয়ে ভালবাসা দিয়েছ, তেমনি যে পতিত, তাকেও ঠিক তেমনি করেই বুকে টেনে নিয়ে আরো বেশী ভালবাসা দিয়ে, মহাপাপ থেকে রক্ষা করে উদ্ধার করেছ। জগতের গুরু হয়ে তুমি দিয়েছ দীক্ষা—দিয়েছ শিক্ষা—দিয়েছ সকলকে আলোর সন্ধান।

তাই বারবারই জানাই, হে জগদ্গুরু যুগবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমার জয় হোক! তুমি শরণাগতকে দয়া কর!